Contents

মাসিক

আত-তাহরীক

ধর্ম, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক গবেষণা পত্রিকা

Web: www.at-tahreek.com

১৮তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

অক্টোবর ২০১৪

মাসিক

আত-তাহরীক

১৮তম বর্ষ : ১ম সংখ্যা অক্টোবর ২০১৪

সূচীপত্র

সম্পাদকীয়

আত্মহত্যা করবেন না

মানুষ আল্লাহ্র সর্বাধিক প্রিয় এবং সেরা সৃষ্টি *(ইসরা ১৭/৭০)*। মানুষকে আল্লাহ 'নিজের দু'হাত দ্বারা সৃষ্টি করেছেন' *(ছোয়াদ ৩৮/৭৫)*। অতএব জীবন দানের মালিক যিনি, তিনিই কেবল জীবন নিতে পারেন। কেউ তাতে অন্যায়ভাবে হস্তক্ষেপ করলে সে মহাপাপী হবে এবং জাহান্নামী হবে। তাই তিনি মানুষকে নির্দেশ দিয়ে বলেছেন, তোমরা নিজেদেরকে হত্যা করো না। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি অত্যন্ত দয়াশীল' *(নিসা ৪/২৯)*। তিনি সাবধান করে বলেন, যদি কেউ সীমা লংঘন ও অত্যাচার বশে এ কাজ করে, তাহ'লে সত্বর আমরা তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব' *(নিসা ৪/৩০)*। অতঃপর যদি কেউ আল্লাহ্র নিষেধাজ্ঞাকে সম্মান করে আত্মহত্যার মত কঠিন পাপ থেকে বিরত হয়, তার জন্য মহা পুরস্কার ঘোষণা করে আল্লাহ বলেন, 'যদি তোমরা কবীরা গোনাহ সমূহ থেকে বিরত হও, যা থেকে তোমাদের নিষেধ করা হয়েছে, তাহ'লে আমরা তোমাদের পাপ সমূহ মার্জনা করব এবং তোমাদেরকে সম্মানজনক স্থানে প্রবেশ করাব' (অর্থাৎ জান্নাত দান করব) *(নিসা ৪/৩১)*।

আত্মহত্যা মহাপাপ। এরপরেও মানুষ আত্মহত্যা করে। নিঃসন্দেহে সেটি করে যখন তার সামনে কোন উপায়ান্তর না থাকে। এরপরেও কোন মুমিন আত্মহত্যা করতে পারে না। কেননা এটা করলে সে ইহকাল ও পরকাল দু'টিই হারাবে। তাকে এ বিশ্বাস রাখতে হবে যে, উপায়-উপাদানের মালিক আল্লাহ। নিরুপায় মানুষ আল্লাহ্র উপর একান্ত ভরসা করে বৈধ পন্থায় চেষ্টা করে গেলে আল্লাহ অবশ্যই তার জন্য উত্তম পথ বের করে দিবেন। এ ব্যাপারে তিনি তার অনুগত বান্দাদের আশ্বস্ত করে বলেছেন, 'যে ব্যক্তি আল্লাহকে ভয় করে, তার জন্য তিনি উপায় বের করে দেন এবং তাকে এমন উৎস থেকে রূযী দেন, যা সে কল্পনাও করেনি' *(তালাক ৬৫/২-৩)*। তিনি বলেন 'যারা আমাদের পথে সর্বাত্মক প্রচেষ্টা চালায়, অবশ্যই আমরা তাদেরকে আমাদের পথসমূহে পরিচালিত করব। আর নিশ্চয়ই আল্লাহ সৎকর্মশীলদের সাথে থাকেন' *(আনকাবূত ২৯/৬৯)*। আল্লাহ্র এরূপ দৃঢ় আশ্বাস সত্ত্বেও অস্থিরচিত্ত মানুষ আত্মহত্যা করে। সে নিজে মরে, পরিবারের মুখে চুনকালি মাখায়। তাতে বংশের বদনাম হয়। দেশের সম্মান নীচু হয়।

‘জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনষ্টিটিউট’ প্রদত্ত তথ্য অনুযায়ী দেশে গত চার বছরে প্রতিদিন গড়ে ২৮ জন মানুষ আত্মহত্যা করেছে। যাদের বড় অংশের বয়স ২১ থেকে ৩০-এর মধ্যে। পাকিস্তান আমলে ১৯৪৯ হ’তে ১৯৭০ সাল পর্যন্ত বছরে গড়ে ২৫৫৫ জন আত্মহত্যা করত। এখন করছে বছরে গড়ে ১০ হাযারের বেশী। এছাড়াও যারা দেশের বড় বড় হাসপাতালের যরূরী বিভাগে ভর্তি হয়, তাদের শতকরা ২০ ভাগ আত্মহত্যার চেষ্টাকারী। ১০ই সেপ্টেম্বর ‘বিশ্ব আত্মহত্যা প্রতিরোধ দিবস’ উপলক্ষে বিশ্বস্বাস্থ্য সংস্থা ‘হু’ (ডঐঙ)-এর রিপোর্ট অনুযায়ী বিশ্বে প্রতি ২ সেকেণ্ডে একজন আত্মহত্যার চেষ্টা করে এবং প্রতি ৪০ সেকেণ্ডে একজন আত্মহত্যায় সফল হয়। উক্ত সংস্থার হিসাব অনুযায়ী ২০১১ সালে আত্মহত্যায় বিশ্বে ভারতের স্থান ছিল ১৬ এবং বাংলাদেশের ৩৮। ২০১৩ সালে তা বেড়ে হয়েছে যথাক্রমে ১ ও ১০। অর্থাৎ প্রতি বছর এ সংখ্যা দ্রুতগতিতে বেড়ে চলেছে। প্রতিবেদনে বলা হয়েছে যে, মুসলিম দেশগুলিতে ধর্মীয় কারণে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে কম।

আমাদের সরকারী হিসাবে দেখা যাচ্ছে যে, দেশের উঠতি যুবশক্তির মধ্যে আত্মহত্যার প্রবণতা সবচেয়ে বেশী। যা অত্যন্ত ভয়ংকর। যারা দেশের মেরুদণ্ড এবং আগামী দিনের ভবিষ্যৎ, তারাই যদি আত্মহত্যা করে, তাহ’লে দেশের চালিকাশক্তি কারা হবে? এরপরেও এদের মধ্যে নারীদের সংখ্যা বেশী। যেটা আরও ভীতিকর। কেননা মায়ের জাতি যদি এভাবে শেষ হয়ে যায়, তাহ’লে আগামী দিনের তরুণ শক্তি আসবে কোত্থেকে? আর্থিক অনটন ও বেকারত্ব এর জন্য নিঃসন্দেহে একটি বড় কারণ। কিন্তু সেটাই একমাত্র কারণ নয়। কেননা উন্নত দেশগুলিতে আত্মহত্যাকারীদের সংখ্যা তুলনামূলকভাবে বেশী।

আত্মহত্যার কারণ প্রধানতঃ ৩টি। (১) হতাশা : যেকোন কারণেই এটা হ’তে পারে। আল্লাহ বলেন, তোমরা আল্লাহ্র রহমত থেকে নিরাশ হয়ো না’ *(যুমার ৩৯/৫৩)*। অতএব মুমিন কখনো হতাশায় ভোগে না। (২) অধিক পাওয়ার আকাংখা : যারা অল্পে তুষ্ট হতে পারে না। বরং সর্বদা অধিক পাওয়ার আকাংখায় পাগলপারা হয়। তারা তা না পেয়ে আত্মহত্যা করে। আল্লাহ বলেন, তোমাদেরকে আমার স্মরণ থেকে উদাসীন করে তোমাদের অধিক পাওয়ার আকাংখা’। ‘অবশেষে তোমরা কবরস্থানে উপনীত হও’ *(তাকাছুর ১০২/২)*। অতএব মুমিন সর্বদা অল্পে তুষ্ট থাকে। (৩) অতি ক্রোধ : ক্রোধান্ধ মানুষ যা খুশী করতে পারে। অন্যায় যদি তাকে ধ্বংসে নিক্ষেপ করে। একদা জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকট উপদেশ চাইলে তিনি বলেন, তুমি ক্রুদ্ধ হয়ো না। পরবর্তী প্রশ্নগুলিতে তিনি একই কথা বলেন *(বুখারী)*। তিনি বলেন, বীর সে নয়, যে অন্যকে কুস্তিতে হারিয়ে দেয়। বরং বীর সেই যে নিজের ক্রোধকে সামলে নেয়’ *(মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ)*। তিনি বলেন, ক্রুদ্ধ অবস্থায় দাঁড়িয়ে থাকলে বসে পড়ো, বসে থাকলে পার্শ্বে ঠেস দাও। অথবা *‘আঊযুবিল্লাহি মিনাশ শাইত্বনির রজীম পড়ো’ (আবুদাঊদ)*। অনেক সময় দেখা যায়, বাবা-মা মোবাইল কিনে না দেওয়ায় সন্তান আত্মহত্যা করে। এগুলি অতি ক্রোধের ফল।

বাঁচার উপায় : (১) সামাজিক ও অর্থনৈতিক ন্যায়বিচার কায়েম করা। যেটা বিশ্বের অধিকাংশ দেশেই নেই। বাংলাদেশে যার অবস্থা অতীব করুণ। সরকার ও সমাজ নেতাদের উচিত এদিকে সর্বাধিক দৃষ্টি দেওয়া। নইলে তারা আল্লাহ্র কাছে জওয়াবদিহি করতে পারবেন না। (২) তাক্বদীরে বিশ্বাস মযবুত করা। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ‘মুমিনের বিষয়টি বিস্ময়কর। যখন সে কল্যাণপ্রাপ্ত হয়, তখন আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করে। আবার যখন বিপদগ্রস্ত হয়, তখন ছবর করে। উভয় অবস্থায় সে আল্লাহ্র নিকট পুরস্কারপ্রাপ্ত হয়’ *(মুসলিম)*। (৩) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্র উপর ভরসা করা। আল্লাহ বলেন, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র উপর ভরসা করে, তিনিই তার জন্য যথেষ্ট হন’ *(তালাক ৬৫/৩)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আমার উম্মতের ৭০ হাযার ব্যক্তি বিনা হিসাবে জান্নাতে যাবে। যারা কখনো ঝাড়ফুঁক নেয়নি, শুভাশুভ গণনা করেনি। বরং সর্বাবস্থায় তারা তাদের প্রতিপালকের উপর ভরসা করেছে’ *(মুত্তাফাক্ব ‘আলাইহ)*।

আত্মহত্যার পরিণতি : এর পরকালীন পরিণতি হ’ল জাহান্নাম। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি যে বস্তু দ্বারা নিজেকে হত্যা করবে, সেই বস্তু দ্বারা তাকে ক্বিয়ামতের দিন শাস্তি দেওয়া হবে *(বুখারী)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি লোহা দ্বারা কিংবা বর্শা দ্বারা কিংবা গলায় ফাঁস দিয়ে আত্মহত্যা করবে, ওভাবেই তাকে জাহান্নামে শাস্তি দেওয়া হবে *(বুখারী)*। যখমের যন্ত্রণা সহ্য করতে না পেরে জনৈক ব্যক্তি আত্মহত্যা করলে আল্লাহ বলেন, বান্দা আমার আগেই নিজের ব্যাপারে তাড়াহুড়া করেছে। অতএব তার উপরে আমি জান্নাতকে হারাম করে দিলাম’ *(বুখারী)*। এমনকি জিহাদের ময়দানে আত্মঘাতি বীর মুজাহিদকেও রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জাহান্নামী বলেছেন *(বুখারী হা/৪২০৩)*। অতএব হে মুমিন! আত্মহত্যা করা থেকে বিরত হও! *(স.স.)*।

সূদ থেকে বিরত হৌন

মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব

يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافاً مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُوْنَ-

অনুবাদ : 'হে মুমিনগণ! তোমরা চক্রবৃদ্ধিহারে সূদ খেয়ো না। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তাতে তোমরা অবশ্যই সফলকাম হবে' *(আলে ইমরান ৩/১৩০)*।

জাহেলী আরবে ঋণদানের প্রথা ছিল এই যে, মেয়াদান্তে ঋণ পরিশোধ করলে সাধারণ সূদ। আর তা পরিশোধে ব্যর্থ হ'লে প্রতি মেয়াদে সূদ হার বৃদ্ধি পাবে এবং মেয়াদ শেষে ওটা আসলে রূপান্তরিত হবে *(ইবনু কাছীর)*। যেমন ১০০০ টাকা একবারে ১০% হারে ১০০ টাকা সূদ। কিন্তু তা পরিশোধে ব্যর্থ হ'লে ঐ ১১০০ টাকাই আসল টাকায় পরিণত হবে এবং তাতে মেয়াদ ও সূদের হারের তারতম্য হবে। যেমন প্রতি তিন মাস পর ২০% সূদ যোগ হবে। দিতে না পারলে ওটা আসলের সাথে যোগ হয়ে তার উপর ২৫% সূদ আরোপিত হবে। একেই বলে চক্রবৃদ্ধি হারে সূদ।

বাংলাদেশের দাদন ব্যবসায়ী, এনজিও এবং ব্যাংকগুলিতে বর্তমানে এই সূদই চলছে। জাহেলী আরবের লোকেরা দয়াপরবশে অনেক সময় ঋণগ্রহীতাকে সূদ মওকূফ করে দিত। কিন্তু এদেশের এই সব নব্য কাবুলীওয়ালারা সরকারী পৃষ্ঠপোষকতা পায় এবং মামলা করে পুলিশ দিয়ে ধরে এনে পিটিয়ে আদালতের মাধ্যমে কারাগারে পাঠায়। অনেকে অতিষ্ঠ হয়ে আত্মহত্যা করে। যেমন বাংলাদেশের একটি প্রতিষ্ঠিত ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান আফসার গ্রুপের ব্যবস্থাপনা পরিচালক আব্দুর রব তার প্রতিষ্ঠানের নামে ১৯৯০ সালে ২০ কোটি টাকা ব্যাংক ঋণ নিয়েছিলেন। কিন্তু ব্যবসায়ে মার খেয়ে তিনি সূদাসলে শতকোটি টাকার বেশী ঋণখেলাপী হয়ে পড়েন। ব্যাংক ঋণ পরিশোধে নিজের ১০৫ বিঘা সম্পত্তি ১২ কোটি টাকায় বিক্রি করে দেন। প্রতারিত হয়ে তিনি তার গুলশানের বাড়ীটিও হারান। অবশেষে সব হারিয়ে নিজের স্ত্রীকে হত্যা করেন ও নিজে আত্মহত্যা করেন।[১] এনজিও এবং ব্যাংক ঋণের কারণে পথে বসা এরূপ আব্দুর রবের সংখ্যা শহরে-গ্রামে হাযার হাযার পাওয়া যাবে। যারা চক্রবৃদ্ধি হারে সূদের অসহায় শিকার। অথচ জনগণের সরকার জনস্বার্থের বিরোধী ও সূদখোরদের বন্ধু।

বাংলাদেশের সমাজ জীবন বিগত যুগে কাবুলীওয়ালা ও জমিদার-মহাজনী সূদ এবং বর্তমান যুগে ব্যাংক ও এনজিও সূদে জর্জরিত। পাকিস্তান সৃষ্টি হয়েছিল মুসলমানরা স্বাধীনভাবে তাদের ইসলামী তাহযীব ও তামাদ্দুন নিয়ে বসবাস করবে সেই স্বপ্ন নিয়ে। কিন্তু সে স্বপ্ন পাকিস্তানের নেতারাই ধ্বংস করে দিয়ে গেছেন। মুসলমানের রাজনৈতিক জীবনে এখন ঢুকে পড়েছে ফেরাঊনী হিংস্রতা ও অর্থনৈতিক জীবনে ঢুকে পড়েছে কারূনী শোষণ। সাধারণ মুসলমান কখনোই তাদের প্রকৃত রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক স্বাধীনতা ফিরে পায়নি। পায়নি তাদের জান-মাল ও ইযযতের স্বাধীনতা। যদিও ইতিমধ্যে ১৯৪৭ ও ১৯৭১-য়ে দেশ দু'বার স্বাধীন হয়েছে।

মানুষের জীবনকে দুর্বিষহ করা এবং তাকে জাহান্নামী করার জন্য শয়তান যত রকমের ফাঁদ পেতেছে, তার মধ্যে সবচেয়ে বড় ফাঁদ হ'ল 'সূদ'। ধনীকে ধনী করার ও গরীবকে নিঃস্ব করার সবচেয়ে বিধ্বংসী হাতিয়ার হ'ল সূদ। এই শয়তানী প্রক্রিয়ার ফাঁদে যে একবার পড়বে সে ধ্বংস না হয়ে যাবে না। রক্ত চুষে ফুলে ঢোল হয়ে জোঁক এক সময় মারা পড়ে। শোষণ করা রক্ত তার দেহে কোন কাজে লাগে না। মশা রক্ত খেয়ে মোটা না হয়ে মরে না। অথচ ঐ রক্ত তার দেহে শক্তি যোগায় না। সূদী কারবারীরা একইভাবে নিজেরা রক্তচোষা গিরগিটির মত খাবি খায়। কিন্তু ঐ সম্পদ তার দুনিয়া ও আখেরাতে কোন কাজে লাগে না। মানুষের চোখে সে হয় নিন্দিত ও ঘৃণিত। এমনকি চাষের গরুর পায়ে লাঙ্গলের ফাল লাগা ঘায়ে পোকা ধরলে নাকি কোন সূদখোর মহাজনের নামে ফুঁক দিলে পোকাগুলো বেরিয়ে যায় ও গরু সুস্থ হয়। কারণ এরা আল্লাহ্র শত্রু ও শয়তানের বন্ধু। এরা দুনিয়াতে আল্লাহ ও মানুষের অভিশাপগ্রস্ত। আখেরাতেও জাহান্নামের ইন্ধন। কিন্তু এরপরেও মানুষ সূদ খায় ও সূদ নেয় শয়তানী সমাজের দুঃসহ বাধ্য-বাধকতায় পড়ে। যে সমাজের নিয়ন্ত্রক হ'ল সূদী কারবারী ধনিকশ্রেণী ও তাদের বশংবদ দলবাজ রাজনীতিকরা। গ্রাম্য মহাজনী প্রথার বদলে তারা এখন গড়ে তুলেছে বড় বড় ব্যাংক ও বীমা প্রতিষ্ঠান। লাখ লাখ টাকা বেতন-বোনাস দিয়ে কর্মকর্তা নিয়োগ দিয়েছে যাতে তারা আইন বাঁচিয়ে সুন্দরভাবে মালিকদের চাহিদামত শোষণের কাজগুলো করতে পারে। জনগণকে ঋণ দিয়ে তাতে সূদ খেয়ে এবং জনগণের সঞ্চিত আমানত থেকে সুচতুরভাবে যাতে তারা অর্থ লুণ্ঠন করতে পারে ও বিনা পুঁজিতে দেশের সেরা পুঁজিপতি ব্যবসায়ী হিসাবে দেশে-বিদেশে সিআরপি-ভিআইপি হবার সুযোগ নিতে পারে। এজন্যই গ্রীক পণ্ডিত প্লুটার্ক (৪৬-১২০ খৃঃ) এদেরকে 'বিদেশী আক্রমণকারীদের চাইতে অধিক নির্যাতনকারী' বলেছেন। কেননা এরা সশস্ত্র হামলা না করেই জনগণকে সূদের জালে আটকে পঙ্গু করে ফেলে এবং মানুষ তার মেরুদণ্ড সোজা করে দাঁড়াতে পারে না। আল্লাহ বলেন, 'যারা সূদ খায়, তারা ক্বিয়ামতের দিন দাঁড়াবে ঐ রোগীর মত, যার উপরে শয়তান আছর করে। তাদের এমন অবস্থা হবার কারণ এই যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সূদের মতই' *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*। আসলে কি তাই?

---

১. *দৈনিক ইনকিলাব ৪ঠা সেপ্টেম্বর'১৪ প্রথম পৃষ্ঠা।*

Contents

ব্যবসা ও সূদের পার্থক্য :

আবু জাহল ব্যবসা ও সূদের পার্থক্য বুঝেনি। তাই সে বলেছিল, 'ব্যবসা তো সূদের মতই'। এ যুগের সূদখোররাও সে পার্থক্য বুঝতে চায় না। আসলে এরা বুঝেও না বুঝার ভান করে। কেননা দু'টির মধ্যে সম্পর্ক দিন ও রাতের মত। একটা থাকলে অন্যটা থাকবে না। যেমন, (১) ব্যবসায়ে পণ্য বিক্রয়ের মুনাফা পাওয়া যায়। কিন্তু সূদ হ'ল ঋণ দানের বিনিময়ে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা। (২) সূদ হ'ল পূর্ব নির্ধারিত। কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ আসে পরে। (৩) সূদে লাভের নিশ্চয়তা থাকে, কিন্তু ব্যবসায়ে লাভ-লোকসানের ঝুঁকি থাকে। (৪) সূদের ক্ষেত্রে ঋণদাতা সময় ও শ্রম বিনিয়োগ করে না। পক্ষান্তরে মুনাফা হ'ল উদ্যোক্তার সময় ও শ্রম বিনিয়োগের ফল। (৫) সূদ হ'ল মুনাফা গ্রহণের পর পুনরায় অর্থের মূল্য নেওয়া। যা একই দ্রব্য দু'বার বিক্রির শামিল। যা মহাপাপ ও মহা প্রতারণা।

পৃথিবীর আদিকাল থেকে সকল ধর্ম ও বর্ণের মানুষ একে নিকৃষ্ট পাপ বলেছেন। প্লেটো, এরিস্টটল সবাই একে নিন্দা করেছেন। যারা সূদকে সময়ের মূল্য বলে দাবী করেন, তাদের যুক্তি খণ্ডন করে ইতালীয় পণ্ডিত থমাস একুইনাস (১২২৫-১২৭৪ খৃঃ) বলেন, সময় এমন এক সাধারণ সম্পদ যার উপর ঋণগ্রহীতা, ঋণদাতা ও অন্যান্য সকলেরই সমান মালিকানা বা অধিকার রয়েছে। এমতাবস্থায় শুধু ঋণদাতার সময়ের মূল্য দাবী করাকে তিনি অসাধু ব্যবসা বলে অভিহিত করেন।[২]

আসলে এটি আদৌ কোন ব্যবসা নয় বরং ঋণদানের বিনিময়ে অধিক টাকা নেওয়ার ফন্দি মাত্র। আর এটাই হ'ল সূদ। ইসলাম যা হারাম করেছে। প্রশ্ন হ'ল, যদি কেউ কাউকে এক হাযার টাকা ঋণ দেয়, আর ঋণগ্রহীতা সেটি এক বছর পরে শোধ করে, তাহ'লে কি তাকে এক হাযার টাকার সাথে আরও কিছু বেশী দিতে হবে? যদি দিতে হয়, তাহ'লে সেটা হবে সূদ। আর যদি না দিতে হয় তবে সেটাই হ'ল মানবতা এবং সেটাই হ'ল ইসলাম। যদি আসল টাকা হারানোর ভয় থাকে, তাহ'লে ঋণগ্রহীতার নিকট থেকে কিছু বন্ধক রাখুন তা ভোগ না করার শর্তে। এতে অপারগ হ'লে রাষ্ট্রীয় বা সামাজিক তহবিল থেকে উক্ত ঋণ পরিশোধ করতে হবে। অথবা পরকালে দ্বিগুণ পাওয়ার আশায় ঋণ মওকূফ করবে ও ক্ষমা করে দিবে। এভাবেই সমাজে ঋণ প্রবাহ স্বাভাবিক থাকবে এবং 'মানুষের প্রয়োজনে মানুষ' একথার যথার্থ বাস্তবায়ন হবে। এর বাইরে সবই শঠতা ও প্রবঞ্চনা, যা এক কথায় শয়তানী কর্ম। রহমানী সমাজে যার কোন স্থান নেই।

সূদ কি বস্তু?

হযরত আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন,

اَلذَّهَبُ بِالذَّهَبِ وَالْفِضَّةُ بِالْفِضَّةِ وَالْبُرُّ بِالْبُرِّ وَالشَّعِيْرُ بِالشَّعِيْرِ وَالتَّمْرُ بِالتَّمْرِ وَالْمِلْحُ بِالْمِلْحِ مِثْلاً بِمِثْلٍ يَدًا بِيَدٍ فَمَنْ زَادَ أَوِ اسْتَزَادَ فَقَدْ أَرْبَى الآخِذُ وَالْمُعْطِى فِيهِ سَوَاءٌ

'স্বর্ণের বদলে স্বর্ণ, রৌপ্যের বদলে রৌপ্য, গমের বদলে গম, যবের বদলে যব, খেজুরের বদলে খেজুর, লবণের বদলে লবণ সমান সমান হাতে হাতে নিবে। অতঃপর যে ব্যক্তি তাতে বেশী দিল বা বেশী চাইল, সে সূদে পতিত হ'ল। গ্রহীতা ও দাতা উভয়ে সমান'।[৩] নগদে বেশী নিলে সেটা হবে রিবা আল-ফাযল এবং বাকীতে বেশী নিলে সেটা হবে রিবা আন-নাসীআহ। দু'টিই সূদ এবং দু'টিই নিষিদ্ধ। মাছ বিক্রির সময় কেজিতে ২০০ গ্রাম বা মণে ৫ কেজি বেশী, ধান, আলু, আম ইত্যাদি বিক্রির সময় মূল ওযনের চাইতে বেশী লেনদেনের যে প্রচলন এদেশে রয়েছে, যাকে 'ধল' বা 'ফাও' বলা হয়, এগুলি অত্যাচারমূলক সূদী প্রথা, যা রিবা আল-ফযলের অন্তর্ভুক্ত। অনুরূপভাবে মেয়াদ ভিত্তিক ঋণ দিয়ে তার উপর অতিরিক্ত অর্থ আদায় করার যে সূদী প্রথা রয়েছে, তা রিবা আন-নাসীআহ্র অন্তর্ভুক্ত। সবগুলিই পরিত্যাজ্য। একইভাবে ব্যবহৃত পুরাতন স্বর্ণের বদলে নতুন স্বর্ণ নেওয়ার সময় ওযন ও মূল্যে যে কমবেশী করা হয়, সেটাও নিষিদ্ধ। বরং এটাই সঠিক যে, পুরাতন সোনা বিক্রি করে তার মূল্য দিয়ে নতুন সোনা ক্রয় করতে হবে।

উসামা বিন যায়েদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, الرِّبَا فِى النَّسِيئَةِ 'সূদ হ'ল বাকীতে'। অন্য বর্ণনায় তিনি বলেন, لاَ رِبًا فِيمَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ 'হাতে হাতে নগদ লেনদেনে কোন সূদ নেই'।[৪] উবাদাহ বিন ছামেত (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, ...فَإِذَا اخْتَلَفَتْ هَذِهِ الأَصْنَافُ فَبِيعُوا كَيْفَ شِئْتُمْ إِذَا كَانَ يَدًا بِيَدٍ. 'যখন দ্রব্য ভিন্ন হবে, তখন তোমরা যেভাবে খুশী ক্রয়-বিক্রয় কর, যখন তা হাতে হাতে নগদে হবে'।[৫] অর্থাৎ স্বর্ণের বদলে রৌপ্য, চাউলের বদলে গম, মাছের বদলে গোশত ইত্যাদি।

সূদের পরিণতি

(১) সূদ সমাজকে নিঃস্ব করে : আল্লাহ বলেন, يَمْحَقُ اللهُ الرِّبَا وَيُرْبِي الصَّدَقَاتِ وَاللهُ لاَ يُحِبُّ كُلَّ كَفَّارٍ أَثِيْمٍ 'আল্লাহ সূদকে সংকুচিত করেন ও ছাদাক্বাকে প্রবৃদ্ধি দান করেন। বস্তুতঃ আল্লাহ কোন অকৃতজ্ঞ পাপিষ্ঠকে ভালবাসেন না' *(বাক্বারাহ ২/২৭৬)*। আব্দুল্লাহ ইবনু মাসঊদ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, إِنَّ الرِّبَا وَإِنْ كَثُرَ فَإِنَّ عَاقِبَتَهُ

---

২. *প্রফেসর শাহ হাবীবুর রহমান, সূদ, পৃঃ ১২।*

৩. *মুসলিম হা/১৫৮৪, মিশকাত হা/২৮০৯।*

৪. *মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৮২৪।*

৫. *মুসলিম হা/১৫৮৭।*

تَصِيْرُ إِلَى قُلٍّ ‘সূদ যতই বৃদ্ধি পাক, এর পরিণতি হ’ল নিঃস্বতা’।[৬] কেননা এতে সূদগ্রহীতাই কেবল ফেঁপে ওঠে। যাদের সংখ্যা কম। কিন্তু সূদদাতা ক্লিষ্ট হয়। যাদের সংখ্যা অধিক। সূদে তাদের ক্রয়ক্ষমতা লোপ পায়। তখন সূদখোরের প্রাপ্য সূদ পরিশোধ হয় না। সে শিল্পপতি বা ব্যবসায়ী হ’লে তার উৎপাদিত পণ্য অবিক্রীত থাকে। যার পরিণতিতে সূদখোরের সূদ ও আসল সবই ধ্বংস হয়। বর্তমানে পুঁজিবাদী আমেরিকার শতাধিক ব্যাংক দেউলিয়া ঘোষিত হওয়া যার বাস্তব প্রমাণ। তাছাড়া নিউইয়র্কের ওয়াল স্ট্রীট আন্দোলন পুঁজিবাদী বিশ্বের ভিত কাঁপিয়ে তুলেছে। যাদের বক্তব্য ছিল, শতকরা ৯৯ ভাগ মানুষের খাদ্য মাত্র ১ ভাগ মানুষ শোষণ করে চলেছে সূদের মাধ্যমে, আমরা এর অবসান চাই।

(২) সূদী লোকেরা কিয়ামতের দিন শয়তানের আছর করা রোগীর মত দাঁড়াবে : আল্লাহ বলেন, الَّذِيْنَ يَأْكُلُوْنَ الرِّبَا لاَ يَقُوْمُوْنَ إِلاَّ كَمَا يَقُوْمُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوْا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا وَأَحَلَّ اللهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا فَمَنْ جَاءهُ مَوْعِظَةٌ مِّن رَّبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللهِ وَمَنْ عَادَ فَأُوْلَـئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ هُمْ فِيْهَا خَالِدُوْنَ- ‘যারা সূদ খায় তারা (ক্বিয়ামতের দিন) শয়তানের স্পর্শে আবিষ্ট রোগীর মত দণ্ডায়মান হবে। এটা এজন্য যে, তারা বলে, ব্যবসা তো সূদের মতই। অথচ আল্লাহ ব্যবসাকে হালাল করেছেন এবং সূদকে হারাম করেছেন। অতএব যার নিকট তার পালনকর্তার পক্ষ হ’তে উপদেশ পৌঁছে যায়, অতঃপর সে বিরত হয়, তার জন্য রয়েছে ক্ষমা, যা সে পূর্বে করেছে। আর তার (তওবা কবুলের) বিষয়টি আল্লাহ্র উপর ন্যস্ত। কিন্তু যে ব্যক্তি পুনরায় (সূদী কাজে) ফিরে আসবে, সে হবে জাহান্নামের অধিবাসী। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৫)*।

(৩) সূদখোর আল্লাহ্র বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণাকারী : আল্লাহ বলেন, يَا أَيُّهَا الَّذِيْنَ آمَنُوْا اتَّقُوْا اللهَ وَذَرُوْا مَا بَقِيَ مِنَ الرِّبَا إِنْ كُنْتُم مُّؤْمِنِيْنَ، فَإِن لَّمْ تَفْعَلُوْا فَأْذَنُوْا بِحَرْبٍ مِّنَ اللهِ وَرَسُوْلِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُؤُوْسُ أَمْوَالِكُمْ لاَ تَظْلِمُوْنَ وَلاَ تُظْلَمُوْنَ- ‘হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সূদের বাকী পাওনা ছেড়ে দাও যদি তোমরা মুমিন হও’। ‘কিন্তু যদি তোমরা তা না কর, তাহ’লে তোমরা আল্লাহ ও তার রাসূলের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা কর। অতঃপর যদি তোমরা তওবা কর, তাহলে তোমরা (সূদ ব্যতীত) কেবল আসলটুকু পাবে। তোমরা অত্যাচার করো না এবং অত্যাচারিত হয়ো না’ *(বাক্বারাহ ২/২৭৮-৭৯)*।

অতএব হে সূদী মহাজন, হে দাদন ব্যবসায়ী, হে ব্যাংক ও এনজিও-র মালিকগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর। তোমরা কেবল ঋণের আসলটুকু নাও ও সূদের অংশটি পরিত্যাগ কর। তাহ’লে তোমরা আল্লাহ্র কাছে এর বহুগুণ বেশী পাবে। যেমন তিনি বলেন, إِنْ تُقْرِضُوا اللهَ قَرْضًا حَسَنًا يُضَاعِفْهُ لَكُمْ وَيَغْفِرْ لَكُمْ وَاللهُ شَكُوْرٌ حَلِيْمٌ ‘যদি তোমরা আল্লাহকে উত্তম ঋণ দাও, তাহ’লে তিনি তোমাদের জন্য এটা বহুগুণ বর্ধিত করবেন এবং তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ সর্বাধিক প্রতিদান দাতা ও সর্বাধিক সহনশীল’ *(তাগাবুন ৬৪/১৭)*। এখানে যে ব্যক্তি ঋণের টাকার সাথে বাড়তি দাবী করে, সে হ’ল অত্যাচারী এবং যে ব্যক্তি বাড়তি টাকা দেয়, সে হ’ল অত্যাচারিত।

উপরোক্ত আয়াতগুলিতে একথা পরিষ্কার যে, সূদ একটি অত্যাচারমূলক প্রথা। নগদে হৌক বা বাকীতে হৌক, ঋণদাতা কেবল অতটুকু ফেরত পাবেন, যতটুকু তিনি ঋণ দিয়েছেন। অতিরিক্ত নিলে সেটা সূদ হবে। ঋণ দিয়ে অতিরিক্ত নেওয়ার চুক্তি করলেও তা বাতিল হবে। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, যেকোন শর্ত যা আল্লাহ্র কিতাবে নেই, তা বাতিল। যদিও তা একশত শর্ত হয়’।[৭] যেকোন মানুষ যেকোন সময়ে কপর্দকহীন হয়ে বিপাকে পড়তে পারে। তাই পরস্পরকে ঋণ দিতে হবে মানবিক তাকীদে। বাগে পেয়ে বা সুবিধা দেখিয়ে তার কাছ থেকে অতিরিক্ত অর্থ আদায় করা যাবে না। করলে সেটা সূদ হবে।

জাহেলী আরবে আজকের মত ব্যক্তিগত ঋণের উপর যেমন সূদ আদায় করা হ’ত, তেমনি ব্যবসায়ে লগ্নিকৃত মূলধনের উপর সূদ নেওয়া হ’ত। উভয় প্রকার সূদকে ‘রিবা’ বলা হ’ত। আর কুরআনে সেই রিবাকেই হারাম ঘোষণা করা হয়েছে। তাই প্রথমটিকে ইউজুরী (Usury) এবং দ্বিতীয়টিকে ইন্টারেস্ট (Interest) বলে সূদ হালাল করার কোন সুযোগ নেই। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর চাচা আব্বাস ইসলাম কবুলের আগে ব্যবসায়ে পুঁজি খাটিয়ে সূদ নিতেন। এ ব্যাপারে তাঁর ব্যাপক প্রসিদ্ধি ছিল। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বিদায় হজ্জের ভাষণে চাচার প্রাপ্য সকল সূদ রহিত করার ঘোষণা দেন।[৮]

সূদের ইহকালীন ও পরকালীন শাস্তি :

(১) হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, যখন কোন সম্প্রদায়ে বা কোন জনপদে সূদ ও ব্যভিচার বৃদ্ধি পাবে, তারা নিজেরা

৬. *আহমাদ হা/৩৭৫৪, ইবনু মাজাহ হা/২২৭৯; ছহীহুল জামে‘ হা/৫৫১৮; মিশকাত হা/২৮২৭।*

৭. *বুখারী হা/২১৬৮, ২৫৬৩; মুসলিম হা/১৫০৪; মিশকাত হা/২৮৭৭।*

৮. *আবুদাঊদ হা/১৯০৫।*

আল্লাহ্র শাস্তিকে অবধারিত করে নিবে'।[৯] আল্লাহ্র এই শাস্তি নানাবিধ হ'তে পারে। আসমানী গযব, যেমন অনাবৃষ্টি, ঝড়-ঝঞ্ঝা, উষ্ণ বায়ু, নানাবিধ রোগ-জীবাণু ও ভাইরাসের প্রাদুর্ভাব ইত্যাদি। যমীনী গযব, যেমন বন্যা, খরা, ফসলহানি, ভূর্গস্থ পানি শুকিয়ে যাওয়া, ভূমিকম্প, দাবানল ইত্যাদি।

এছাড়া আখেরাতের শাস্তি হবে অত্যন্ত মারাত্মক। যেমন-

(২) হযরত সামুরাহ বিন জুনদুব (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ফজরের ছালাত অন্তে আমাদের দিকে ফিরে বসতেন এবং বলতেন তোমরা কেউ রাতে স্বপ্ন দেখেছ কি? কেউ দেখে থাকলে তিনি তার ব্যাখ্যা দিতেন। এভাবে একদিন বললেন, আমি আজ রাতে একটি স্বপ্ন দেখেছি, তোমরা শোন। অতঃপর তিনি বললেন, দু'জন লোক এসে আমাকে নিয়ে গেল। কিছুদূর গিয়ে মাঠের মধ্যে দেখলাম যে একজন লোক বসে আছে। পাশেই একজন লোক মাথা বাঁকানো ধারালো অস্ত্র নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। সে তার এক কান থেকে আরেক কান পর্যন্ত সেটা দিয়ে চিরে দিচ্ছে। তাতে তার মুখমণ্ডল দ্বিখণ্ডিত হয়ে যাচ্ছে ও পুনরায় জোড়া লাগছে। এভাবে ডান কান থেকে বাম কান পর্যন্ত এবং বাম কান থেকে ডান কান পর্যন্ত ঐ অস্ত্র দিয়ে মুখমণ্ডল চিরে দু'ভাগ করে দিচ্ছে। আর লোকটি যন্ত্রণায় চিৎকার করছে। এই ভয়ংকর দৃশ্য দেখে আমি বললাম, এ ব্যক্তির এই কঠিন শাস্তি কেন? জবাবে তারা বললেন, সামনে চল।

এরপর আমরা গিয়ে পেলাম একজন লোককে যে চিৎ হয়ে শুয়ে আছে। আরেকজন দাঁড়ানো ব্যক্তি তার মাথায় পাথর মেরে তা চূর্ণ করে দিচ্ছে। অতঃপর লোকটি পাথর কুড়িয়ে আনার অবসরে মাথাটি আবার পূর্বের ভাল অবস্থায় ফিরে আসছে। অতঃপর পুনরায় তা পাথর মেরে চূর্ণ করা হচ্ছে। আমি জিজ্ঞেস করলাম, লোকটির এ শাস্তি কেন? জবাবে তারা বললেন, সামনে চল।

এরপরে আমরা এলাম মেঠে সদৃশ একটা বড় পাত্রের নিকট। যার মুখ সরু এবং নীচের দিকে প্রশস্ত। পাত্রটির নীচে আগুন জ্বলছে। যার ভিতরে একদল উলংগ পুরুষ ও নারী। যারা আগুনের প্রচণ্ড তাপে দগ্ধ হয়ে বেরিয়ে আসতে চাচ্ছে। কিন্তু পারছে না। আমি বললাম, এদের এরূপ শাস্তি কেন? জবাবে তারা বললেন, সামনে চল।

এরপরে আমরা এলাম একটা রক্তনদীর কাছে। যার মাঝখানে একজন লোক মাথা উঁচু করে আছে। আর নদীর তীরে একজন লোক পাথরের খণ্ড হাতে নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে। যখনই ঐ লোকটি সাঁতরে কিনারে উঠতে চাচ্ছে, তখনই তার মাথায় পাথর মেরে তাকে তাড়িয়ে দিচ্ছে। লোকটি এভাবে রক্তের নদীতে সাতরাচ্ছে। কিন্তু তীরে উঠতে পারছে না। যখনই সে কাছে আসছে তখনই পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছে। যা পুনরায় ঠিক হয়ে যাচ্ছে। আমি বললাম, লোকটির এ শাস্তি কেন হচ্ছে? জবাবে তারা বললেন, সামনে চল।

এবার কিছু দূর গিয়ে তারা বললেন, ১ম ব্যক্তি যার মুখ চেরা হচ্ছিল, সে হ'ল মিথ্যাবাদী। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এরূপ আচরণ করা হবে। ২য় ব্যক্তি যার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছিল, ঐ ব্যক্তিকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দিয়েছিলেন। কিন্তু সে তা ছেড়ে রাতে ঘুমাত এবং দিনের বেলায় সে অনুযায়ী আমল করত না। ক্বিয়ামত পর্যন্ত তার সাথে এরূপ আচরণ করা হবে। ৩য় ব্যক্তিরা যাদেরকে মাথা সরু বড় পাত্রের মধ্যে দেখা গেছে, ওরা হ'ল ব্যভিচারী। ৪র্থ যে ব্যক্তি রক্তনদীর মধ্যে সাতরাচ্ছে ও পাথর মেরে তার মাথা চূর্ণ করা হচ্ছে, ওটা হ'ল সূদখোর। ... এবারে তারা নিজেদের পরিচয় দিয়ে বললেন, আমরা হ'লাম জিব্রীল ও মীকাঈল। এবার তুমি মাথা উঁচু কর। আমি মাথা উঁচু করলাম। দেখলাম এক খণ্ড মেঘের মত বস্তু। তারা বললেন, ওটাই তোমার বাসগৃহ। আমি বললাম, আমি আমার বাসগৃহে প্রবেশ করব। তারা বললেন, তোমার বয়স পূর্ণ হওয়ার পর তুমি ওখানে প্রবেশ করবে'।[১০]
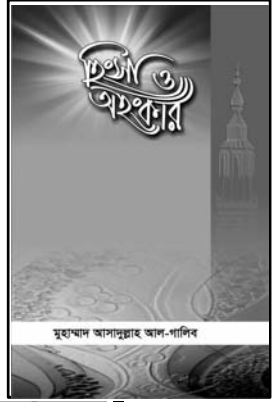
মনে রাখা আবশ্যক যে, 'নবীগণের স্বপ্ন অহী'।[১১] আল্লাহ আমাদেরকে সূদের মহাপাপ থেকে রক্ষা করুন-আমীন!

৯. *আহমাদ হা/৩৮০৯; ছহীহুল জামে' হা/৫৬৩৪।*

১০. *বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১ 'স্বপ্ন' অধ্যায়।*

১১. *বুখারী হা/১৩৮, ৮৫৯, তিরমিযী হা/৩৬৮৯।*

বাহাছ-মুনাযারায় ভারতীয় উপমহাদেশের আহলেহাদীছ আলেমগণের অগ্রণী ভূমিকা

মূল (উর্দূ) : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি

*অনুবাদ : নূরুল ইসলাম**

‘মুনাযারা’ অর্থ কোন বিষয়ে পরস্পর বিতর্ক করা। চাই সেটি ধর্মীয়, রাজনৈতিক বা অন্য কোন বিষয়ের সাথে সংশ্লিষ্ট হোক। মানুষ যখন অস্তিত্ব লাভ করে এবং জ্ঞান-বুদ্ধির সাথে পরিচিত হয়, তখন থেকেই মুনাযারা ও পারস্পরিক বাদানুবাদের সূচনা হয়ে গিয়েছিল। ধর্মীয় বিষয়ে হযরত ইবরাহীম (আঃ) এবং তাঁর যুগের বাদশাহ নমরূদের কথোপকথনকে আমরা মুনাযারা হিসাবে অভিহিত করতে পারি। হযরত ঈসা মাসীহ (আঃ)-এর প্রায় দুই হাযার বছর পূর্বে বাবেল রাজত্ব উন্নতির উচ্চশিখরে আরোহণ করেছিল এবং তার সামরিক ও অর্থনৈতিক ভিত অত্যন্ত মযবুত ছিল। বাবেল বাদশাহ নমরূদ প্রভুত্বের দাবী করে নিজের স্বর্ণনির্মিত মূর্তি মন্দির সমূহে প্রতিস্থাপন করতঃ মানুষকে তার পূজা করার হুকুম দেয়। সেই সময় আল্লাহ তা'আলা হযরত ইবরাহীম (আঃ)-কে নবী হিসাবে মনোনীত করে নমরূদ ও তার দেশের জনগণের নিকট প্রেরণ করেন। তিনি ঘোষণা করেন, সমগ্র সৃষ্টির প্রভু একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই ইবাদত করতে হবে। নমরূদ ও তার প্রজাদের জন্য এই ঘোষণাটি তাওহীদের দাওয়াত ছিল। কিন্তু নমরূদ তা মানতে অস্বীকৃতি জানায়। এর বর্ণনা দেয়া হয়েছে সূরা বাক্বারাহ-এর ২৫৮ নং আয়াতে। মহান আল্লাহ বলেন,

أَلَمْ تَرَ إِلَى الَّذِيْ حَاجَّ إِبْرَاهِيْمَ فِيْ رَبِّهِ أَنْ آتَاهُ اللهُ الْمُلْكَ إِذْ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ رَبِّيَ الَّذِيْ يُحْيِـيْ وَيُمِيْتُ قَالَ أَنَا أُحْيِـيْ وَأُمِيْتُ قَالَ إِبْرَاهِيْمُ فَإِنَّ اللهَ يَأْتِيْ بِالشَّمْسِ مِنَ الْمَشْرِقِ فَأْتِ بِهَا مِنَ الْمَغْرِبِ فَبُهِتَ الَّذِيْ كَفَرَ وَاللهُ لاَ يَهْدِي الْقَوْمَ الظَّالِمِيْنَ-

‘তুমি কি ঐ ব্যক্তিকে দেখনি, যে ইবরাহীমের সাথে তার প্রতিপালক সম্পর্কে বিতর্ক করেছিল, যেহেতু আল্লাহ তাকে রাজত্ব দিয়েছিলেন। যখন ইবরাহীম বলল, তিনি আমার প্রতিপালক যিনি জীবন দান করেন ও মৃত্যু ঘটান। সে বলল, আমিও তো জীবন দান করি ও মৃত্যু ঘটাই। ইবরাহীম বলল, আল্লাহ সূর্যকে পূর্ব দিক থেকে উদিত করান, তুমি তাকে পশ্চিম দিক হতে উদিত করাও তো। অতঃপর যে কুফরী করেছিল সে (অর্থাৎ নমরূদ) হতবুদ্ধি হয়ে গেল। আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সৎপথে পরিচালিত করেন না’ *(বাক্বারাহ ২৫৮)*।

কুরআন মাজীদে এ ধরনের আরো অনেক ঘটনা বিদ্যমান রয়েছে, যেগুলোকে কোন না কোনভাবে মুনাযারা হিসাবে আখ্যায়িত করা যায়। ইতিহাসের গ্রন্থগুলোতে ছাহাবায়ে কেরামের কিছু মুনাযারার কথাও বর্ণিত হয়েছে। যে বিতর্কগুলো তাঁরা খারেজী ও অন্যদের সাথে করেছিলেন। মহামতি ইমামদের মুনাযারাগুলোরও হদিস পাওয়া যায়। সূরা আলে ইমরানের ৬১নং আয়াতে মুবাহালার কথাও উল্লিখিত হয়েছে। নবী করীম (ছাঃ) নাজরান থেকে আগত ৬০ সদস্য বিশিষ্ট এক খ্রিস্টান প্রতিনিধি দলকে যে মুবাহালার আহ্বান জানিয়েছিলেন। এদের মধ্যে ১৪ জন ছিল তাদের নেতা।

উপমহাদেশে মুনাযারার ইতিবৃত্ত :

মুনাযারার ইতিহাস অনেক লম্বা। অনেক আলেমের সাথে অনেকের মুনাযারা হয়েছে। লোকজন আগ্রহভরে সেসব মুনাযারায় অংশগ্রহণ করেছে এবং তার্কিকদের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। কিন্তু এখানে উপমহাদেশের কতিপয় তার্কিকের নাম উল্লেখ করা হবে। কেননা এ গ্রন্থের সম্পর্ক উপমহাদেশের সাথে। খ্রিস্টান, হিন্দু (আর্য সমাজ ও সনাতন ধর্মাবলম্বী), কাদিয়ানী, শী'আ ও হানাফীদের সাথে (ব্রেলভী ও দেওবন্দী) আহলেহাদীছ আলেমদের বিতর্ক হয়েছে। বিতর্কের মাধ্যমে প্রকৃত সত্য উদ্ভাসিত হয় এবং মানুষেরা ভুল ও সঠিক বিষয় অবগত হতে পারে। সম্রাট আকবরের সময়ে উপমহাদেশে খ্রিস্টান পাদ্রীদের সাথে বাহাছ-মুনাযারার পরম্পরা শুরু হয়েছিল। আকবরের সময়ের প্রসিদ্ধ তার্কিকদের মধ্যে মাওলানা সা'দুল্লাহ খান, মাওলানা আব্দুল্লাহ ও কুতুবুদ্দীনের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এরপর মুনাযারার ধারাবাহিকতা অব্যাহত রয়েছে।

শাহ আব্দুল আযীযের যুগ :

শাহ আব্দুল আযীয মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ)-এর যুগে মুনাযারা বেশ গতি লাভ করেছিল। কারণ ঐ সময় প্রায় সমগ্র ভারতবর্ষে ইংরেজদের আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। ইংরেজরা ইংল্যাণ্ড থেকে আসার সময় পাদ্রীদেরকেও সঙ্গে করে নিয়ে এসেছিল। যাতে করে এখানে খ্রিস্টান ধর্মের প্রচারের মাধ্যমে মানুষদেরকে খ্রিস্টান ধর্মে দীক্ষিত করার মিশন চালানো যায়। উদ্দেশ্য এটাই ছিল যে, এভাবে খ্রিস্টান ধর্ম প্রসার লাভ করবে এবং ইংরেজ শাসনও সুদৃঢ় হবে। শাহ আব্দুল আযীয এই বাস্তব অবস্থা সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন। তিনি খ্রিস্টানদের মুকাবিলা করতেন।

নিম্নে খ্রিস্টানদের সাথে শাহ ছাহেবের কতিপয় বাহাছ-মুনাযারা ও প্রত্যুৎপন্নমতিত্বের উল্লেখ করা হল-

(১) একদা শাহ আব্দুল আযীয দিল্লীর জামে মসজিদে কুরআন মাজীদের দরস দিচ্ছিলেন। ইত্যবসরে একজন পাদ্রী এসে বললেন, আমার একটি প্রশ্নের উত্তর দিন। প্রশ্নটা হল, মুসলমানদের নবীকে পৃথিবীতে দাফন করা হয়েছে এবং আমাদের নবী ঈসা (আঃ)-কে আল্লাহ আকাশে স্থান দিয়েছেন। সুতরাং আমাদের নবীর মর্যাদা মুসলমানদের

** পিএইচ.ডি গবেষক, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

নবীর চেয়ে বেশী বলে প্রতীয়মান হল। শাহ ছাহেব অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত শব্দে উত্তর দিলেন, এই দলীল দ্বারা আমাদের নবী করীম (ছাঃ)-এর চেয়ে ঈসা (আঃ)-এর উচ্চমর্যাদা প্রমাণিত হয় না। কারণ ফেনা সর্বদা সমুদ্রের পানির উপরে থাকে। আর মুক্তা থাকে মাটির নীচে। এই উত্তরে ঈসা (আঃ)-কে ফেনা এবং হযরত মুহাম্মাদ (ছাঃ)-কে মুক্তার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

(২) এক পাদ্রী শাহ ছাহেবকে জিজ্ঞেস করলেন, আপনার নবী কি আল্লাহ্‌র বন্ধু? তিনি উত্তর দিলেন, হ্যাঁ। পাদ্রী বললেন, আপনার নবী কি হযরত হুসাইনকে হত্যার সময় আল্লাহ্‌র কাছে প্রার্থনা করেননি যে, আমার দৌহিত্রকে হত্যা থেকে বাঁচানো হোক? না প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ কবুল করেননি? শাহ ছাহেব উত্তর দিলেন, আমাদের নবী আল্লাহ্‌র নিকট প্রার্থনা করেছিলেন, কিন্তু আল্লাহ বলেছিলেন, তোমার নাতিকে লোকেরা শহীদ করেছে। আর শহীদের মর্যাদা অনেক বেশী। কিন্তু এ সময় আমার পুত্র ঈসার কথা মনে পড়ছে। যাকে তার অনুসারীরা শূলে বিদ্ধ করেছিল।

(৩) একবার এক হিন্দু শাহ ছাহেবকে জিজ্ঞেস করল, আল্লাহ হিন্দু না মুসলমান? উত্তরে তিনি বলেন, যদি আল্লাহ হিন্দু হতেন, তাহলে তিনি কখনো গাভী যবেহ হতে দিতেন না।

অন্যান্য আলেমদের মুনাযারা :

শাহ আব্দুল আযীয দেহলভীর পরে অগণিত আহলেহাদীছ আলেমের সাথে অনেক আলেমের বিতর্ক হয়েছে। তন্মধ্যে একজন তার্কিক ছিলেন মাওলানা সালামাতুল্লাহ জয়রাজপুরী। যার সাথে মাওলানা শিবলী নোমানীর লিখিত বিতর্ক হয়েছিল। বিতর্কের বিষয় ছিল তাক্বলীদ পরিত্যাগ, সশব্দে আমীন বলা, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পাঠ প্রভৃতি। মাওলানা শিবলী নোমানী কট্টর প্রকৃতির হানাফী ছিলেন। 'রিওয়া' (যেলা আযমগড়) নামক স্থানে একটি মৌখিক বিতর্ক হয়েছিল। এ সকল বিতর্কের ফলশ্রুতিতে খোদ মাওলানা শিবলীর বংশে কুরআন-সুন্নাহ অনুসরণের উৎসাহ সৃষ্টি হয়েছিল। একটা সময়ে এসে মাওলানা শিবলীর মগজ থেকে মাযহাবী গোঁড়ামি অনেকটাই দূর হয়ে গিয়েছিল।

মাওলানা সাইয়িদ আমীর হাসান মুহাদ্দিছ সাহসোয়ানীও স্বীয় যুগের প্রসিদ্ধ তার্কিক ছিলেন। ইস্কাট নামক অনেক বড় এক ব্রিটিশ পাদ্রীর সাথে তিনি বিতর্ক করেছিলেন। মাওলানার দলীল সমূহের দ্বারা পাদ্রী অত্যন্ত প্রভাবিত হন এবং তাঁর জ্ঞানের গভীরতার স্বীকৃতি প্রদান করেন। মাওলানার সাথে সাক্ষাতের জন্য সাহসোয়ানে তার যাতায়াত ছিল। তিনি নিজ দেশ লন্ডনে চলে গিয়েছিলেন। ১২৯১ হিজরীতে (১৮৭৪ খ্রিঃ) মাওলানার মৃত্যু হয়। পাদ্রী ইস্কাট তাঁর মৃত্যু সংবাদ পেয়ে লন্ডনের পত্র-পত্রিকায় শোক প্রকাশ করে প্রবন্ধ লিখে তাঁর বিদ্যাবত্তার কথা বিশদভাবে প্রকাশ করেছিলেন।[১২]

১২. *মাওলানা মুহাম্মাদ মুকতাদা আছারী উমরী, তাযকিরাতুল মুনাযিরীন ১/১১৮-১২০।*

মাওলানা আব্দুল বারী সাহসোয়ানীও অত্যন্ত প্রসিদ্ধ মুনাযির ছিলেন। আগ্রাতে পাদ্রী ইমাদুদ্দীনের সাথে তাঁর বিতর্ক হয়েছিল। কিন্তু গণ্ডগোলের আশংকার অজুহাত দেখিয়ে বিতর্ক চলাকালে পাদ্রী ময়দান থেকে প্রস্থান করেন। আগ্রা ছাড়াও বিভিন্ন স্থানে পাদ্রীদের সাথে তাঁর তর্কযুদ্ধ হয়। আল্লাহ্‌র অনুগ্রহে প্রত্যেক বিতর্কে তিনি জয়লাভ করেন। একবার আগ্রাতে 'তুহফাতুল ইসলাম' গ্রন্থের লেখক আন্দ্রামান মুরাদাবাদী নামক এক হিন্দু তার্কিকের সাথে বিতর্ক করেন। মাওলানা জনসম্মুখে তাকে পরাজিত করেন। তিনি এটাও প্রমাণ করেন যে, এই গ্রন্থটি ঐ হিন্দুর রচিত নয়।[১৩]

উপমহাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে আহলেহাদীছদের অবদান অধ্যায়ে 'জামা'আতে মুজাহিদীনের কতিপয় সাহায্যকারী' উপশিরোনামে মাওলানা আব্দুল আযীয রহীমাবাদীর কথা উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি মিয়াঁ সাইয়িদ নাযীর হুসাইন দেহলভীর ছাত্র ছিলেন। উচ্চমর্যাদাসম্পন্ন আলেম, খ্যাতিমান মুহাক্কিক, স্বনামধন্য শিক্ষক ও অভিজ্ঞ তার্কিক ছিলেন। তিনি মাওলানা শিবলী নোমানীর 'সীরাতুন নু'মান' গ্রন্থের জবাবে 'হুসনুল বায়ান ফীমা ফী সীরাতিন নু'মান' (حسن البيان فيما في سيرة النعمان) নামে একটি গ্রন্থ লিখেন। এতে তিনি মাওলানা শিবলীর ঐতিহাসিক ভুলগুলো চিহ্নিত করেছেন। 'সীরাতুন নু'মান'-এর ২য় সংস্করণে মাওলানা শিবলী ঐ ভুলগুলো সংশোধন করেন। অতঃপর এ জাতীয় বিষয়ে তিনি আর কোন গ্রন্থ রচনা করেননি।

মাওলানা রহীমাবাদীর মুনাযারাগুলোতে উৎসবের আমেজ ছিল। ১৯০৩ সালের ১৬ই আগস্ট তিনি 'দিওরিয়া' নামক স্থানে আর্য সমাজের (হিন্দু) সাথে একটি বিতর্ক করেছিলেন। এটা ছিল সপ্তাহব্যাপী চলমান লিখিত বিতর্ক। প্রত্যেকদিন অগণিত হিন্দু ও মুসলমান অত্যন্ত আগ্রহের সাথে বিতর্ক শুনতেন। সকল মাযহাবের ওলামায়ে কেরাম ঐ বিতর্কে শামিল ছিলেন এবং সকলে সর্বসম্মতিক্রমে মাওলানা রহীমাবাদীকেই তার্কিক নির্বাচন করেছিলেন। মাওলানা রহীমাবাদী ঐ বিতর্কে বিজয়ী হয়েছিলেন। ১৩০৫ হিজরীর জুমাদাল উলা মাসে (ফেব্রুয়ারী ১৮৮৮) বাংলার মুর্শিদাবাদ শহরে হানাফী আলেমদের সাথে 'তাক্বলীদ' বিষয়ে মাওলানা রহীমাবাদীর বিতর্ক হয়েছিল। পাঁচ দিন বিতর্ক অব্যাহত ছিল। সে যুগের অনেক আহলেহাদীছ ও হানাফী আলেম ঐ বিতর্কে শরীক ছিলেন। হানাফীদের পক্ষ থেকে প্রত্যেক দিন তার্কিক বদলাতে থাকে। কিন্তু আহলেহাদীছদের পক্ষে শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত মাওলানা রহীমাবাদীই তার্কিক ছিলেন এবং তিনিই বিতর্কে বিজয়ী হয়েছিলেন।

বক্তব্য, লেখনী, অনুবাদ, গ্রন্থ রচনা ও বাহাছ-মুনাযারায় মাওলানা মুহাম্মাদ জুনাগড়ী (মৃঃ মার্চ ১৯৪১) অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছিলেন। তাঁর অনেক অগ্রগণ্য কৃতিত্ব রয়েছে।

১৩. *ঐ ১/১২১-১২৫।*

Contents

তিনিই প্রথম আলেম যিনি তাফসীর ইবনে কাছীরের উর্দূ অনুবাদ করেন। সহজ-সরল ও বোধগম্য ঐ অনুবাদটি অত্যন্ত খ্যাতি অর্জন করেছিল। অনেক প্রকাশক সেটি প্রকাশ করেছে। তিনিই প্রথম আলেম যিনি ইমাম ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ)-এর 'ই'লামুল মুওয়াক্কি'ঈন' গ্রন্থের উর্দূ অনুবাদ করেন। কুরআন, হাদীছ ও ফিক্বহ বিষয়ে এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি গ্রন্থ। এর অনুবাদ পড়ে মাওলানা আবুল কালাম আযাদ মাওলানা জুনাগড়ীকে পত্র লিখেন এবং অনুবাদের ভূয়সী প্রশংসা করেন। তাঁর মুহাম্মাদী সিরিজও দারুণ গ্রহণযোগ্যতা লাভ করেছিল। অর্থাৎ নামাযে মুহাম্মাদী, ছাওমে মুহাম্মাদী, হজ্জে মুহাম্মাদী, যাকাতে মুহাম্মাদী প্রভৃতি নামে তাঁর অনেক গ্রন্থ রয়েছে। যেগুলো লোকজন অত্যন্ত আগ্রহভরে অধ্যয়ন করত। তিনি স্বীয় যুগের সফল তার্কিকও ছিলেন। আল্লাহ তাঁর মধ্যে অনেক গুণের সমাহার ঘটিয়েছিলেন।

অবিভক্ত পাঞ্জাবের শিখ রাজ্য পাটিয়ালায় একটি গ্রামের নাম ছিল 'পায়েল'। সেখানে একটি হিন্দু পরিবার বসবাস করত। এই পরিবারের ছেলে অনন্ত রাম অল্প বয়সে ইসলামের প্রতি ঝুঁকে পড়েছিল। বয়স বাড়ার সাথে সাথে তার অন্তর ইসলামের নিকটবর্তী হতে থাকে। এখন তিনি হিন্দু ব্রাহ্মণ, শিখ নানক, খ্রিস্টান পাদ্রী এবং মুসলমান আলেমদেরকে তাদের ধর্ম সম্পর্কে প্রশ্ন করা শুরু করেন এবং বিভিন্ন ধর্মের গ্রন্থাবলী অধ্যয়নকে নিজের অভ্যাসে পরিণত করেন। তিনি মূলত হিন্দু ছিলেন। এজন্য গভীর অভিনিবেশ সহকারে হিন্দু ধর্ম অধ্যয়ন করেন। এই ধর্ম সম্পর্কে দারুণ সব বিস্ময়কর তথ্য অবগত হন। হিন্দু দেব-দেবী সম্পর্কে তিনি যে তথ্য লাভ করেন, তা ছিল রীতিমত আশ্চর্যজনক। বুদ্ধি-বিবেকের সাথে সেগুলোর কোন সম্পর্ক ছিল না। তিনি ১৮৪৮ সালের সেপ্টেম্বর মাসে (১২৬৪ হিঃ) ঈদুল ফিতরের দিন মালেরকোটলায় (যেটি অবিভক্ত পাঞ্জাবের মুসলিম রাজত্বের রাজধানী ছিল) মুসলমান হন। তিনি ঈদগাহে জনসম্মুখে নিজের ইসলাম গ্রহণের কথা ঘোষণা করেন এবং নিজেই নিজের নাম ওবায়দুল্লাহ রাখেন।

যোগ্য শিক্ষকদের নিকট অতি দ্রুত তিনি সকল দ্বীনী বিষয় অধ্যয়ন করেন এবং মাওলানা ওবায়দুল্লাহ মালেরকোটলী নামে প্রসিদ্ধি লাভ করেন। তিনি ইসলামের অনেক বড় মুবাল্লিগ ও তার্কিক হিসাবে খ্যাতি লাভ করেন। অসংখ্য হিন্দু ও শিখ তাঁর দাওয়াতে প্রভাবিত হয়ে ইসলামের গণ্ডিতে প্রবেশ করে। তিনি 'তুহফাতুল হিন্দ' (تحفة الهند) নামে একটি গ্রন্থ লিখেন। এতে হিন্দু ধর্ম সম্পর্কে তাদের ধর্মীয় গ্রন্থাবলীর উদ্ধৃতিতে বিস্ময়কর সব কিচ্ছা-কাহিনী বর্ণনা করেন। হিন্দু ধর্মের বিস্ময়কর ঘটনাবলী সংবলিত উর্দূতে এটিই প্রথম গ্রন্থ। বিভিন্ন জায়গা থেকে এই গ্রন্থটি কয়েকবার প্রকাশিত হয়েছে এবং যে অমুসলিম সেটি পড়েছে সে-ই মুসলমান হয়ে গেছে। মাওলানা ওবায়দুল্লাহ মালেরকোটলী ১৩১০ হিজরীতে (১৮৯৩ খ্রিঃ) মৃত্যুবরণ করেন।

বাহাছ-মুনাযারার আলোচনায় কার কার নাম উল্লেখ করা যায়। অগ্রজ তার্কিকদের পরিধি অত্যন্ত ব্যাপক। পরবর্তীদের নাম তো গণনা করাই অসম্ভব। আহলেহাদীছ জামা'আতের অসংখ্য তার্কিককে এক লম্বা লাইনে দণ্ডায়মান দেখা যাচ্ছে। এটাও চিরন্তন সত্য যে, আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক বিতর্কে তাদেরকে বিজয় দান করেছেন। এদের মধ্যে অধিকাংশ তার্কিক মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর শিক্ষায় উদ্বুদ্ধ হয়ে বিতর্কের ময়দানে আবির্ভূত হন।

সকল তার্কিকের নাম লেখাও কঠিন। মাওলানা মুহাম্মাদ ইবরাহীম মীর শিয়ালকোটী অনেক বড় একজন ব্যক্তি। পূর্বে তাঁর নাম উল্লেখ করা হয়েছে। তিনি কুরআন, হাদীছ, ফিক্বহ, উসূলে ফিক্বহ, দর্শন, মানতিক ও আরবী সাহিত্যে অগাধ পাণ্ডিত্যের অধিকারী ছিলেন। তিনি অনেক বড় তার্কিকও ছিলেন।

মাওলানা আহমাদুদ্দীন গোখড়াবী, মাওলানা নূর হুসাইন ঘারজাখী, মাওলানা আব্দুল্লাহ মি'মার অমৃতসরী, সাইয়িদ আব্দুর রহীম শাহ মাক্ষাবী, মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক লায়েলপুরী, মাওলানা আব্দুল আযীয মালেক মুলতানী ও অন্যান্য অসংখ্য আলেম রয়েছেন, যারা এক্ষেত্রে বিশাল অবদান রেখেছেন। লোকেরা তাদের মুনাযারা দ্বারা সবিশেষ উপকৃত হয়েছেন। এঁরা ইসলামের অনেক বড় খাদেম ছিলেন।

হাফেয আব্দুল্লাহ রোপড়ী এই বিষয়ে যাদেরকে প্রশিক্ষণ প্রদান করেন তাদের মধ্যে তাঁর দুই ভাতিজা হাফেয মুহাম্মাদ ইসমাঈল রোপড়ী ও হাফেয আব্দুল কাদের রোপড়ীর নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য।[১৪] বিশেষত হাফেয আব্দুল কাদের রোপড়ীকে আল্লাহ এই বিষয়ে অপরিসীম যোগ্যতা দান করেছিলেন। তিনি কাদিয়ানী, ব্রেলভী ও দেওবন্দীদের সাথে অসংখ্য বিতর্ক করেছেন। 'ফুতূহাতে আহলেহাদীছ (মীযানে মুনাযারা)' নামে দু'টি বৃহৎ খণ্ডে তাঁর প্রায় সকল মুনাযারা সংকলন করা হয়েছে। এই গ্রন্থটি মুহাদ্দিছ রোপড়ী একাডেমী, জামে'আ আহলেহাদীছ, চক দালগারা, লাহোর প্রকাশ করেছে। এই গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য মুহাদ্দিছ রোপড়ী একাডেমীর ব্যবস্থাপকরা ধন্যবাদ পাবার যোগ্য। গ্রন্থাকারে সংকলিত এই মুনাযারাগুলো থেকে লোকেরা উপকৃত হবেন এবং একাডেমীর সদস্যদের জন্য দো'আ করবেন।

হাফেয আব্দুল কাদের রোপড়ী যে পদ্ধতিতে বিতর্ক করতেন এবং প্রতিপক্ষকে যেভাবে ধমকি প্রদান করতেন, তা ছিল দারুণ প্রভাব বিস্তারকারী পদ্ধতি। এরই ভিত্তিতে লোকজন তাঁকে 'সুলতানুল মুনাযিরীন' (বিতর্ক সম্রাট) উপাধি প্রদান করেন। আর এটা সম্পূর্ণ সঠিক উপাধি।

---

১৪. ঐতিহ্যবাহী রোপড়ী আহলেহাদীছ পরিবারের আলেমদের সম্পর্কে বিস্তারিত জানার জন্য পড়ুন : মাওলানা মুহাম্মাদ ইসহাক ভাট্টি, রোপড়ী ওলামায়ে হাদীছ (লাহোর : মুহাদ্দিছ রোপড়ী একাডেমী, ৩য় সংস্করণ, ২০১১)। মোট পৃষ্ঠা সংখ্যা ৩৫৩।-অনুবাদক।

মাওলানা আরিফ জাবেদ মুহাম্মাদীর (কুয়েত প্রবাসী) অনুরোধে এই গ্রন্থের লেখক মাওলানা আহমাদুদ্দীন গোখড়াবীর জীবনী লেখার তৌফিক লাভ করেছেন। ১৪৩১ হিজরীর রামাযান মাসে আমি এই খিদমত আঞ্জাম দিয়েছি। গ্রন্থটি দেড়শ পৃষ্ঠাব্যাপী। এতে কাদিয়ানী, খ্রিস্টান, শী'আ ও হানাফীদের সাথে মাওলানা আহমাদুদ্দীন গোখড়াবীকৃত সকল মুনাযারার কথা উল্লেখ করা হয়েছে। হাফেয আব্দুল কাদের রোপড়ী তাঁকে 'উসতাযুল মুনাযিরীন' (তার্কিকদের শিক্ষক) বলে অভিহিত করতেন। তিনি বাস্তবেই একজন জাঁদরেল তার্কিক ছিলেন। সম্ভব হলে কোন ব্যক্তি কষ্ট করে মাওলানা নূর হুসাইন ঘারজাখী, মাওলানা ওবায়দুল্লাহ মি'মার অমৃতসরী, সাইয়িদ আব্দুর রহীম শাহ মাক্কাবী, মাওলানা আব্দুল আযীয মালেক মুলতানী, মাওলানা মুহাম্মাদ ছিদ্দীক লায়েলপুরী ও অন্যান্য আলেমদের মুনাযারাগুলো সংকলন করুক। এটা আবশ্যক নয় যে, এই বিষয়ের সব কথাই লিপিবদ্ধ করতে হবে। তবে যতটুকু সম্ভব লেখা উচিত। আল্লাহ কারো উপর তার সাধ্যের অতিরিক্ত বোঝা চাপান না।

মাওলানা আব্দুল মজীদ সোহদারাভীকে আল্লাহ উত্তম প্রতিদান দান করুন! তিনি মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরীর মুনাযারাগুলোর বিস্তারিত বিবরণ মাওলানার জীবনীগ্রন্থ 'সীরাতে ছানাঈ'তে বর্ণনা করে দিয়েছেন। তাঁর পরে মাওলানা ফযলুর রহমান আযহারী স্বীয় গ্রন্থ 'রাঈসুল মুনাযিরীন মাওলানা ছানাউল্লাহ অমৃতসরী'তে এই খিদমতই করেছেন।

ভারতীয় আলেম ও গ্রন্থকার, জামে'আ আছারিয়া, মউ (ইউপি)-এর শিক্ষক মাওলানা মুহাম্মাদ মুকতাদা আছারী উমরী অনেক ধন্যবাদ পাওয়ার যোগ্য। তিনি 'তাযকিরাতুল মুনাযিরীন' (تذكرة المناظرين) শীর্ষক আকর্ষণীয় নামে দুই খণ্ডে গ্রন্থ লিখেছেন। যেটি ইদারায়ে তাহকীকাতে ইসলামী, জামে'আ আছারিয়া, মউ (ইউপি)-এর পক্ষ থেকে প্রকাশিত হয়েছে। ২০০২ সালের জানুয়ারীতে (শাওয়াল ১৪২২ হিঃ) ১ম খণ্ড প্রকাশিত হয়েছে। এতে ভারত ভাগের পূর্বের অর্থাৎ ১৮৩৫-১৯৪৬ পর্যন্ত ভারত ও পাকিস্তানের আহলেহাদীছ আলেমদের সংক্ষিপ্ত জীবনী এবং তাদের মুবাহালা ও বাহাছ-মুনাযারার বিবরণী পেশ করা হয়েছে। ২য় খণ্ডে ভারত ভাগের পরের অর্থাৎ ১৯৪৭-২০০১ পর্যন্ত আহলেহাদীছ আলেমদের সংক্ষিপ্ত জীবনী সহ তাদের মুনাযারাগুলোর ইতিবৃত্ত লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। ১৪২৪ হিজরীর যিলহজ্জ (জানুয়ারী ২০০৪) মাসে এই খণ্ডটি প্রকাশিত হয়েছে। এটিও মাওলানা মুহাম্মাদ মুকতাদী আছারী উমরীর অগ্রগণ্য কৃতিত্ব।

আমাদের বন্ধু ড. বাহাউদ্দীন 'তাহরীকে খতমে নবুঅত'-এর বিভিন্ন খণ্ডে কাদিয়ানীদের সাথে বাহাছ-মুনাযারা সম্পর্কিত অনেক ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন।

মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর ২০১৪ ১৮তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

খেয়াল-খুশির অনুসরণ

মূল : শায়খ মুহাম্মাদ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদ

*অনুবাদ : মুহাম্মাদ আব্দুল মালেক**

ভূমিকা :

সকল প্রশংসা বিশ্বজগতের মালিক আল্লাহ তা'আলার জন্য, আর রহমত ও শান্তি বর্ষিত হোক সর্বশ্রেষ্ঠ রাসূল আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর বংশধর ও তাঁর ছাহাবীদের সকলের উপর। অতঃপর খেয়াল-খুশির অনুসরণ ভাল কাজ থেকে বাধা প্রদানকারী এবং বুদ্ধি-বিবেক নাশকারী। কেননা খেয়াল-খুশির অনুসরণ অসৎ চরিত্রের জন্ম দেয় এবং নানারকম মন্দ ও গর্হিত কাজ প্রকাশ করে। মানবতার পর্দা তাতে ছিদ্র হয়ে যায় এবং অসৎ কাজ ও পাপাচারের রাস্তা খুলে যায়।

এই খেয়াল-খুশি ফিৎনা-ফাসাদের বাহন। আর দুনিয়া হ'ল পরীক্ষা গৃহ। সুতরাং হে পাঠক! আপনি খেয়াল-খুশির পথ ছেড়ে দিন, শান্তিতে থাকবেন। দুনিয়ার প্রতি আগ্রহ-ভালবাসা বাদ দিন, সাফল্য লাভ করবেন। দুনিয়া তার সৌন্দর্য ও মনোমুগ্ধকর জিনিসপত্র দ্বারা যেন আপনাকে কখনোই ফিৎনায় ফেলতে না পারে এবং খেল-তামাশা ও নিরর্থক কাজ-কর্মের প্রতি আসক্তি তৈরী করে আপনার প্রবৃত্তি যেন আপনাকে প্রতারিত করতে না পারে। খেল-তামাশার এই সময় তো এক সময় শেষ হয়ে যাবে; যুগের পরিক্রমায় আমরা যা কিছু উপভোগ করেছি মরণের ফলে একদিন তার সবই ফিরিয়ে দিতে হবে। কেবল খেয়াল-খুশির বশবর্তী হয়ে আপনি যে সব হারাম কাজে লিপ্ত হয়েছেন এবং যে গোনাহ সঞ্চয় করেছেন তাই আপনার জন্য থেকে যাবে।

খেয়াল-খুশি মানুষের সবচেয়ে বড় শত্রু। তাই যে কোন শত্রুর তুলনায় খেয়াল-খুশির বিরুদ্ধে কঠিনভাবে যুদ্ধ চালিয়ে যাওয়া প্রতিটি মানুষের উপর ফরয। আবু হাযেম (রহঃ) বলেছেন, قَاتِلْ هَوَاكَ أَشَدَّ مِمَّا تُقَاتِلُ عَدُوَّكَ 'তোমার শত্রুর বিরুদ্ধে তুমি যতটা না লড়াই কর, তার থেকেও ঢের বেশী লড়াই তুমি তোমার প্রবৃত্তির বিরুদ্ধে কর'।[১৫]

এই খেয়াল-খুশিই সকল ফিৎনা-ফাসাদের মূল এবং সকল বিপদ-আপদের কারণ। সুফিয়ান ছাওরী (রহঃ) বলেছেন,

يَا نَفْسُ تُوْبِيْ فَإِنَّ الْمَوْتَ قَدْ حَانَا * وَاعْصِ الْهَوَى فَالْهَوَى مَا زَالَ فَتَّانَا

'হে মন! তুমি তওবা করো, কেননা মরণ তো অতি নিকটে। আর খেয়াল-খুশির বাধ্য হবে না, কেননা খেয়াল-খুশি তো সব সময় ফিৎনা সৃষ্টিকারী'।

খেয়াল-খুশির অবস্থা যখন এই, তখন তার সম্পর্কে আলোচনা করা আবশ্যক, যাতে আমরা এই ভয়াবহ রোগ থেকে দূরে থাকতে পারি এবং তার ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি থেকে আত্মরক্ষা করতে পারি।

আলোচ্য গ্রন্থে আমরা খেয়াল-খুশির সংজ্ঞা, ক্ষতি, তার বিরোধিতার উপকারিতা, তার অনুসরণের কারণ বা উপকরণ, চিকিৎসা পদ্ধতি (প্রতিকারের উপায়) এবং প্রশংসনীয় প্রবৃত্তি ও নিন্দনীয় প্রবৃত্তির পার্থক্য নিয়ে আলোচনা করব।

এ গ্রন্থ রচনায় ও কাঙ্ক্ষিত আকারে তা প্রকাশে যে যে ক্ষেত্রে যারা যারা অংশ নিয়েছেন তাদের প্রতি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। পরিশেষে আল্লাহ্র রহমত ও শান্তি কামনা করছি আমাদের নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ), তাঁর পরিবার-পরিজন ও ছাহাবীদের সকলের উপর।

খেয়াল-খুশির সংজ্ঞা :

খেয়াল-খুশির আভিধানিক অর্থ : আরবী هَوًى শব্দটি هَوِيَ ক্রিয়ার ধাতু। আভিধানিক অর্থ হ'ল, কোন কিছুকে ভালবাসা, কাম্য বস্তু পাওয়ার প্রবল বাসনা।[১৬]

[বাংলা অভিধানে هَوًى (হাওয়া)-এর প্রতিশব্দ খেয়ালখুশি, নিয়ম ছাড়া ব্যাপার, স্বেচ্ছাচারিতা, খামখেয়ালি, অযৌক্তিক ইচ্ছা, কামনা, বাসনা, প্রবৃত্তি, কুপ্রবৃত্তি, ভোগের পথ ইত্যাদি।[১৭] এই পুস্তকে هَوًى শব্দের প্রতিশব্দ অধিকাংশ ক্ষেত্রে খেয়ালখুশি এবং ক্ষেত্রবিশেষে কামনা-বাসনা ও প্রবৃত্তি গ্রহণ করা হয়েছে।-অনুবাদক]

পরিভাষায় هَوًى বা খেয়ালখুশি : উপভোগ্য জিনিসের প্রতি শরী'আতের কোন অনুমোদন ছাড়াই মনের যে ঝোঁক তৈরী হয় তাকে هَوًى বা খেয়ালখুশি বলে।[১৮] ইবনুল ক্বাইয়িম (রহঃ) বলেন, কাঙ্ক্ষিত জিনিসের প্রতি মনের ঝোঁককে هوى বা খেয়ালখুশি বলে। এই ঝোঁক মানুষের মাঝে তার অস্তিত্ব রক্ষার স্বার্থেই সৃষ্ট হয়েছে। কেননা তার যদি খাদ্য, পানীয় ও বিবাহ-শাদীর প্রতি ঝোঁক ও আকর্ষণ না থাকত, তাহ'লে সে খানা-পিনা, বিয়ে-শাদী কোনটাই করত না। সুতরাং প্রবৃত্তি মনের চাহিদার প্রতি মানুষকে অনুপ্রাণিত করে। যেমন করে ক্রোধ অপ্রীতিকর জিনিষ থেকে তাকে বিরত রাখে।[১৯]

খেয়াল-খুশির অনুসরণে নিষেধাজ্ঞা :

শরী'আতের প্রমাণাদি দ্বিধাহীনভাবে খেয়াল-খুশির অনুসরণ করতে নিষেধ করে। কুরআন-হাদীছে এসব প্রমাণ নানাভাবে নানা আঙ্গিকে বিধৃত হয়েছে। যেমন-

১. কখনো খেয়াল-খুশির অনুসরণ নিঃশর্তভাবে নিষেধ করা হয়েছে :

* কামিল, এম.এ; সহকারী শিক্ষক, হরিণাকুণ্ডু সরকারী বালিকা মাধ্যমিক বিদ্যালয়, ঝিনাইদহ।

১৫. আবু নু'আইম ইস্পাহানী, হিলয়াতুল আওলিয়া ৩/২৩১।

১৬. আল-মুগরাব ফী তারতীবিল মু'রাব ২/৩৯২।

১৭. বাংলা একাডেমী ব্যবহারিক বাংলা অভিধান।

১৮. জুরজানী, আত-তা'রীফাত, পৃঃ ৩২০।

১৯. রাওযাতুল মুহিব্বীন, পৃঃ ৪৬৯।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, فَلاَ تَتَّبِعُوا الْهَوَى أَنْ تَعْدِلُواْ 'ন্যায়বিচার করতে তোমরা খেয়ালখুশির অনুসরণ করো না' *(নিসা ৪/১৩৫)*। আল্লাহ তা'আলা বলেন, يَا دَاوُوْدُ إِنَّا جَعَلْنَاكَ خَلِيْفَةً فِي الْأَرْضِ فَاحْكُم بَيْنَ النَّاسِ بِالْحَقِّ وَلَا تَتَّبِعِ الْهَوَى فَيُضِلَّكَ عَنْ سَبِيْلِ اللهِ 'হে দাঊদ! আমি তোমাকে এই যমীনে আমার খলীফা (শাসক) বানালাম। অতএব তুমি মানুষের মাঝে ন্যায়বিচার করো এবং কখনো খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, তেমন করলে তা তোমাকে আল্লাহ্র রাস্তা থেকে দূরে সরিয়ে দেবে' *(ছোয়াদ ৩৮/২৬)*।

২. কখনো কাফির ও পথভ্রষ্টদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করতে নিষেধ করা হয়েছে : আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِيْنَ كَذَّبُوْا بِآيَاتِنَا وَالَّذِيْنَ لاَ يُؤْمِنُوْنَ بِالآخِرَةِ وَهُمْ بِرَبِّهِمْ يَعْدِلُوْنَ 'হে রাসূল! তুমি ঐ সকল লোকের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না যারা আমার আয়াত সমূহকে অস্বীকার করে, যারা পরকালে অবিশ্বাস করে এবং তারা অন্য কিছুকে তাদের মালিকের সমকক্ষ মনে করে' *(আন'আম ৬/১৫০)*।

আল্লাহ তা'আলা তাঁর নবীকে কাফিরদের বলতে বলেছেন, قُل لاَّ أَتَّبِعُ أَهْوَاءَكُمْ قَدْ ضَلَلْتُ إِذاً وَمَا أَنَاْ مِنَ الْمُهْتَدِيْنَ 'হে রাসূল! তুমি বল, আমি তো তোমাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করি না। যদি আমি তা করি তাহ'লে আমি তখন অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাব এবং সত্যানুসারী দলের মাঝে থাকব না' *(আন'আম ৬/৫৬)*।

আল্লাহ তা'আলা আরও বলেন, وَلاَ تَتَّبِعُواْ أَهْوَاءَ قَوْمٍ قَدْ ضَلُّواْ مِنْ قَبْلُ وَأَضَلُّواْ كَثِيْراً وَضَلُّواْ عَن سَوَاءِ السَّبِيْلِ 'তোমরা সেসব জাতির খেয়াল-খুশির অনুসরণ করো না, যারা আগেভাগেই পথভ্রষ্ট হয়ে গেছে এবং তারা অনেক লোককে পথহারা করে দিয়েছে আর তারা নিজেরাও সোজা পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে গেছে' *(মায়েদাহ ৫/৭৭)*।

অন্যত্র তিনি বলেন, فَاحْكُم بَيْنَهُم بِمَا أَنزَلَ اللهُ وَلاَ تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ عَمَّا جَاءَكَ مِنَ الْحَقِّ 'সুতরাং আল্লাহ তা'আলা যেসব বিধি-বিধান নাযিল করেছেন তুমি তার ভিত্তিতে বিচার-ফায়ছালা কর এবং এ বিচারের সময় তোমার নিকট যে সত্য দ্বীন এসেছে তা থেকে সরে গিয়ে তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না' *(মায়েদাহ ৫/৪৮)*।

তিনি নবী করীম (ছাঃ)-কে উদ্দেশ্য করে বলেন, فَلِذَلِكَ فَادْعُ وَاسْتَقِمْ كَمَا أُمِرْتَ وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَهُمْ '(হে নবী!) তুমি মানুষকে এ দ্বীনের দিকে ডাকতে থাক এবং এর উপরেই অবিচল থাকো, যেভাবে তোমাকে আদেশ দেওয়া হয়েছে। আর ওদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করবে না' *(শূরা ৪২/১৫)*।

তিনি বলেন, وَلَا تُطِعْ مَنْ أَغْفَلْنَا قَلْبَهُ عَنْ ذِكْرِنَا وَاتَّبَعَ هَوَاهُ وَكَانَ أَمْرُهُ فُرُطاً 'তুমি এমন কোন ব্যক্তির আনুগত্য করবে না যার হৃদয়-মনকে আমরা আমাদের স্মরণ থেকে উদাসীন করে দিয়েছি, আর সে তার প্রবৃত্তির দাসত্ব করতে শুরু করেছে এবং তার কাজকর্ম সীমালংঘনমূলক' *(কাহফ ১৮/২৮)*।

এসব আয়াতে মহান আল্লাহ কাফির-মুশরিকদের সাথে খেয়ালখুশির সম্পর্ক যোগ করেছেন। কেননা তাদের খেয়ালখুশি সত্য হ'তে বিচ্যুত। পক্ষান্তরে মুমিনদের খেয়ালখুশি তেমন নয়। কাফিরদের কামনা-বাসনা পুরোটাই বাতিল তথা অন্যায়ের উপর কেন্দ্রীভূত। অপরদিকে মুমিনদের কামনা-বাসনা উন্নত হ'তে হ'তে এক সময় তা আল্লাহ তা'আলার হুকুম মাফিক হয়ে যায় এবং নবী করীম (ছাঃ) আনীত দ্বীন বা জীবন বিধানের অনুগামী হয়ে দাঁড়ায়। ফলে তার মন যখন কোন দিকে ঝোঁকে তখন তা সুন্নাত ও আনুগত্য বলে গণ্য হয়, ন্যূনপক্ষে তা মুবাহ হয়ে থাকে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, أَفَمَنْ كَانَ عَلَى بَيِّنَةٍ مِّن رَّبِّهِ كَمَنْ زُيِّنَ لَهُ سُوْءُ عَمَلِهِ وَاتَّبَعُوْا أَهْوَاءَهُمْ 'যে ব্যক্তি তার মালিকের কাছ থেকে আসা সুস্পষ্ট সমুজ্জ্বল নিদর্শনের উপর রয়েছে তার সাথে এমন লোকদের তুলনা কীভাবে হবে যাদের চোখের সামনে তাদের মন্দ কাজগুলো শোভনীয় করে রাখা হয়েছে এবং তারা নিজেদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে' *(মুহাম্মাদ ৪৭/১৪)*।

৩. কখনো মন্দের সাথে জড়িত মন বা ব্যক্তিসত্তার দিকে খেয়াল-খুশিকে সম্বন্ধ করে তার নিন্দা করা হয়েছে : আবু ইয়া'লা শাদ্দাদ ইবনু আওস (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, اَلْعَاجِزُ مَنْ أَتْبَعَ نَفْسَهُ هَوَاهَا 'অক্ষম-মূর্খ সেই ব্যক্তি যে নিজের মনকে তার প্রবৃত্তি বা খেয়ালখুশির কথামতো চলতে দেয়'।[20]

৪. কখনো অন্তরের সঙ্গে সম্পর্কিত প্রবৃত্তির নিন্দা জানানো হয়েছে : হুযায়ফা (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, تُعْرَضُ الْفِتَنُ عَلَى الْقُلُوْبِ كَالْحَصِيْرِ عُوْدًا عُوْدًا فَأَىُّ قَلْبٍ أُشْرِبَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ سَوْدَاءُ وَأَىُّ قَلْبٍ أَنْكَرَهَا نُكِتَ فِيْهِ نُكْتَةٌ بَيْضَاءُ حَتَّى تَصِيْرَ عَلَى قَلْبَيْنِ عَلَى أَبْيَضَ مِثْلِ الصَّفَا فَلاَ تَضُرُّهُ فِتْنَةٌ مَا دَامَتِ السَّمَاوَاتُ وَالأَرْضُ وَالآخَرُ أَسْوَدُ مُرْبَادًّا كَالْكُوْزِ مُجَخِّيًا لاَ يَعْرِفُ مَعْرُوْفًا وَلاَ يُنْكِرُ مُنْكَرًا إِلاَّ مَا أُشْرِبَ مِنْ هَوَاهُ 'মানুষের মনে ফিৎনা বা গোমরাহী এমনভাবে ঢেলে দেওয়া

২০. *হাকেম, আহমাদ, ইবনু মাজাহ হা/৪২৬০, সনদ যঈফ।*

হয় যেমন করে খেজুরের মাদুর বা পাটি বুনতে একটা একটা করে পাতা ব্যবহার করা হয়। যে মনে ঐ ফিৎনা অনুপ্রবেশ করে তাতে একটা কালো দাগ পড়ে যায়। আর যে মন তা প্রত্যাখ্যান করে তাতে একটা সাদা দাগ পড়ে। এভাবে মনগুলো দু'ভাগে ভাগ হয়ে যায়। এক. মসৃণ পাথরের মত সাদা মন, যাতে কোন ফিৎনা বা পাপাচার আসমান-যমীন বিদ্যমান থাকা অবধি কোনই বিরূপ ক্রিয়া করতে পারবে না। দুই. কয়লার ন্যায় কালো মন, যা উপুড় করা পাত্রের মত, না সে কোন ন্যায়কে বোঝে, না অন্যায়কে স্বীকার করে। তার খেয়াল-খুশি বা কামনা-বাসনা তাকে যেভাবে পরিচালনা করে সেইভাবেই কেবল সে পরিচালিত হয়'।[২১] এখানে খেয়াল-খুশিকে হৃদয়ের সাথে সম্বন্ধিত করা হয়েছে।

খেয়াল-খুশির অনুসরণ হেতু একজন মানুষ কখন শাস্তি পাওয়ার যোগ্য :

খেয়াল-খুশি ও লোভ-লালসা মানুষের জীবনের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত একটি বিষয়। না সে তার থেকে আলাদা হ'তে পারে, না তাকে পরিত্যাগ করতে পারে। মহান আল্লাহ মানুষকে প্রবৃত্তি ও লালসার তাড়না দিয়েই সৃষ্টি করেছেন। তবে কি খেয়াল-খুশি ও লালসার উদ্রেক যখনই হবে তখনই সেজন্য মানুষকে শাস্তি পোহাতে হবে? মানুষ কি তার হৃদয়-মন থেকে খেয়াল-খুশি বের করে দিতে শরী'আতের দাবী অনুযায়ী বাধ্য? নাকি তার কিছু নিয়মনীতি ও সীমানা রয়েছে?

ইমাম ইবনু তাইমিয়া (রহঃ) বলেছেন, 'খোদ প্রবৃত্তি ও লালসার জন্য কোন শাস্তি পোহাতে হবে না। বরং তার অনুসরণ ও তার কথামত কাজ করার দরুণ শাস্তি পোহাতে হবে। সুতরাং মন খেয়াল-খুশির পেছনে চলতে চাইবে আর ব্যক্তি মনকে তার থেকে বিরত রাখলে তখন তার এ বিরত রাখাই আল্লাহ্র ইবাদত ও নেক কাজ বলে গণ্য হবে'।[২২]

একজন সত্যবাদী মুসলিমের অবস্থাতো এটাই। তার মন সর্বদা তাকে এটা ওটা করতে হুকুম করবে আর সে বরাবর তা করতে অস্বীকার করবে এবং তার লালসার অপকারিতার শিকার হওয়া থেকে তাকে বিরত রাখবে। মন তাকে খেয়াল-খুশির যেসব বিষয় লাভে উদ্বুদ্ধ করবে সেসব ক্ষেত্রে সে তার প্রতিপালকের মুখোমুখি দাঁড়ানোকে ভয় করবে। এমন মানুষ অবশ্যই ভাল প্রতিফল পাবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَأَمَّا مَنْ خَافَ مَقَامَ رَبِّهِ وَنَهَى النَّفْسَ عَنِ الْهَوَى، فَإِنَّ الْجَنَّةَ هِيَ الْمَأْوَى– 'আর যে ব্যক্তি তার মালিকের সামনে (হাশরের ময়দানে) দাঁড়ানোকে ভয় করে এবং (সেই ভয়ে নিজের) মনকে কামনা-বাসনা থেকে বিরত রাখে, অবশ্যই জান্নাত হবে তার ঠিকানা' *(নাযি'আত ৮০/৪০-৪১)*।

সুতরাং খেয়াল-খুশি মনে উদয় হ'লেই সেজন্য শাস্তি দেওয়া হবে না; সেটা কাজে পরিণত করা ব্যতীত। মানুষ যখন কোন পাপ কাজের বাসনা করবে এবং মনে মনে তা কামনা করবে, তারপর বাস্তবে তা রূপায়িত করবে তখন তার খেয়াল-খুশি ও কাজের উপর হিসাব গ্রহণ করা হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, كُتِبَ عَلَى ابْنِ آدَمَ نَصِيْبُهُ مِنَ الزِّنَى مُدْرِكٌ ذَلِكَ لاَ مَحَالَةَ فَالْعَيْنَانِ زِنَاهُمَا النَّظَرُ وَالأُذُنَانِ زِنَاهُمَا الاِسْتِمَاعُ وَاللِّسَانُ زِنَاهُ الْكَلاَمُ وَالْيَدُ زِنَاهَا الْبَطْشُ وَالرِّجْلُ زِنَاهَا الْخُطَا وَالْقَلْبُ يَهْوَى وَيَتَمَنَّى وَيُصَدِّقُ ذَلِكَ الْفَرْجُ وَيُكَذِّبُهُ 'আদম সন্তানের জন্য ব্যভিচারের একাংশ নির্ধারিত আছে; যা সে অবশ্যই পাবে। চক্ষুদ্বয়ের যেনা হ'ল দৃষ্টি নিক্ষেপ করা। কর্ণদ্বয়ের যেনা হ'ল শ্রবণ করা, জিহ্বার যেনা হ'ল আলোচনা করা, হাতের যেনা হ'ল স্পর্শ করা এবং পায়ের যেনা হল এ কাজে পা চালানো, মন (যেনা করতে) গভীরভাবে কামনা করবে, তারপর যৌনাঙ্গ তা সম্পন্ন করার মাধ্যমে হয় তা সত্য প্রমাণ করবে, নয় তা প্রত্যাখ্যানের মাধ্যমে মনের কামনাকে মিথ্যা প্রমাণ করবে'।[২৩]

খেয়াল-খুশির অনুসরণের কারণ সমূহ :

খেয়াল-খুশির অনুসরণের পিছনে নানাবিধ কারণ রয়েছে। এসব কারণেই মানুষ খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে। প্রশ্ন জাগে, মানুষ কেন তাদের খেয়াল-খুশির পিছনে চলে? কেনই বা তারা সত্য ও সরল পথ থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? এর পিছনে আসলে অনেক কারণ রয়েছে। যথা-

১. শৈশবকালে খেয়াল-খুশি নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত না হওয়া :

কখনো কখনো শিশু শৈশবে তার মাতা-পিতার কাছ থেকে মাত্রাতিরিক্ত ভালবাসা ও আদর পেয়ে থাকে। তারা তার সকল প্রকার আগ্রহে সাড়া দিয়ে থাকে। সে যা চায় তারা তার নিকট তা হাযির করে। এক্ষেত্রে তারা হালাল-হারাম, বৈধ ও নিষিদ্ধের কোন বাছবিচার করে না। শিশু যদি ফজর ছালাত আদায় না করে ঘুমিয়ে থাকে তাহ'লে তারা বলে, 'এখনো বোধবুদ্ধি হাল্কা আর ঘুমকাতুরে, ঠিক আছে ঘুমাক'। ছেলেটা যখন কোন খেলনার বায়না ধরে অমনি তারা তার ব্যবস্থা করে দেয়। তাতে কোন গান-বাজনা আছে কি-না কিংবা কোন নির্লজ্জ দৃশ্য আছে কি-না সেদিকে মোটেও ভ্রূক্ষেপ করে না। হয়তো দেখা যাচ্ছে কিশোর ছেলের জন্য রয়েছে একজন স্পেশাল ড্রাইভার, আবার কিশোরী মেয়ের জন্য রয়েছে অভ্যর্থনা কক্ষসহ খাছ কামরা। এভাবে একজন শিশু তার খেয়াল-খুশি বা মর্যিমাফিক চলাফেরার মধ্য দিয়ে বেড়ে ওঠে। সে যখন যা ইচ্ছা করে তাই পায় এবং করতে পারে। তাকে কোন বাধাদানকারী বাধা দেয় না। আবার কোন নিষেধকারী প্রশাসনও নিষেধ করে না। এভাবে বল্গাহীন অবস্থায় চলতে চলতে যখন সে বয়ঃপ্রাপ্তির পর্যায়ে উপনীত হয় তখন তার লাগামহীন কামনা-বাসনা দিগ্বিদিক ছুটতে

২১. মুসলিম হা/১৪৪, মিশকাত হা/৫৩৮০।
২২. মাজমূ' ফাতাওয়া ১০/৬৩৫।
২৩. মুসলিম হা/২৬৫৭।

থাকে। ঐ সকল মনোবাসনা ও কল্পনা বাস্তবায়নে তার প্রবৃত্তির পিছনে তার শরীরের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গগুলো যেন লাফিয়ে লাফিয়ে ছুটতে থাকে। বিশেষ করে বয়ঃসন্ধিকালের সময়গুলোতে এমনটা খুব ঘটে। ফলে এ ধরনের ছেলে-মেয়েরা বড় বড় অপরাধ এবং মারাত্মক জঘন্য কাজ করে বসে, অথচ তা থেকে তাদের দূরে রাখার ও প্রতিহত করার কোন উপায় থাকে না।

অথচ ছাহাবায়ে কেরাম (রাঃ) তাদের ছেলে-মেয়েদেরকে সেই ছেলেবেলা থেকেই প্রবৃত্তি নিয়ন্ত্রণে অভ্যস্ত হ'তে প্রশিক্ষণ দিতেন। তাঁদের ছোটরা বড়দের সঙ্গে ছিয়াম, ছালাত, হজ্জ ইত্যাদি শারঈ ইবাদত-বন্দেগী পালনে চেষ্টা করতেন।

রুবাই বিনতে মু'আওবিয (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ) আশুরার দিন ভোরে আনছারদের বসতিতে লোক পাঠিয়ে ঘোষণা দেওয়ান যে, مَنْ أَصْبَحَ مُفْطِرًا فَلْيُتِمَّ بَقِيَّةَ يَوْمِهِ، وَمَنْ أَصْبَحَ صَائِمًا فَلْيَصُمْ 'সকালে যে খেয়ে নিয়েছে সে যেন বাকি দিন না খেয়ে কাটায়, আর যে ছিয়াম পালনের অবস্থায় সকাল করেছে সে যেন ছিয়াম সম্পন্ন করে'। বর্ণনাকারিণী বলেন, فَكُنَّا نَصُومُهُ بَعْدُ، وَنُصَوِّمُ صِبْيَانَنَا، وَنَجْعَلُ لَهُمُ اللُّعْبَةَ مِنَ الْعِهْنِ، فَإِذَا بَكَى أَحَدُهُمْ عَلَى الطَّعَامِ أَعْطَيْنَاهُ ذَاكَ، حَتَّى يَكُونَ عِنْدَ الإِفْطَارِ 'এই ঘোষণা শুনে আমরা পরবর্তী সময়টুকু ছিয়ামে কাটালাম এবং আমাদের বাচ্চাদেরও ছিয়াম রাখালাম। তাদের জন্য আমরা এক প্রকার পশমী খেলনা যোগাড় করে রাখলাম। যখন তাদের কেউ খাবারের জন্য কেঁদে উঠছিল তখনই আমরা তাদের সামনে ঐ খেলনা এগিয়ে দিচ্ছিলাম। ইফতার পর্যন্ত তারা এভাবেই পার করছিল'।[২৪]

ছেলেমেয়েরা যা চায় তাই দিয়ে তাদের প্রতিপালনে শুধুই যে দ্বীন-ধর্মীয় ক্ষতি হয় তাই নয় বরং তা তাদের জন্য জাগতিক ক্ষতিও ডেকে আনে। কখনো কখনো দেখা যায়, একটা পরিবারের উপর বালা-মুছীবত ও দুর্দশা নেমে আসে, যার ফলে তাদের ধন-সম্পদের ব্যাপক ক্ষতি হয় এবং তাদের জীবন-জীবিকা সঙ্কটাপন্ন হয়ে পড়ে। কখনো আবার পরিবারের কর্তা মারা যায় সে সময় এই শিশু কীভাবে তার খাহেশ চরিতার্থ করবে? কোত্থেকে সে তার কামনা-বাসনা পূরণের ব্যবস্থা করবে?

তারপর জীবনের এক পর্যায়ে যখন কিশোর ছেলে জীবনযুদ্ধের বিভিন্ন ক্ষেত্রে জড়িয়ে পড়ে এবং তার অনেক প্রয়োজন দেখা দেয় তখন সে হয়তো দেখতে পায়, তার পরিবার তার সকল চাওয়া-পাওয়া পূরণ করতে পারছে না। বিশেষ করে যখন সে নিজের পায়ে দাঁড়াতে চায়, বিয়েশাদী করে ঘর-সংসার গড়তে ইচ্ছে করে তখন সে হয়তো একটা নির্দিষ্ট কাজ করতে চায়, কিন্তু তার পক্ষে তা করা সম্ভব হয়ে ওঠে না।

অনুরূপভাবে যে কিশোরী মেয়ে বিলাসিতা ও আমোদ-প্রমোদের মধ্যে বেড়ে উঠেছে, হয়ত তার বিয়ে এমন লোকের সাথে হয়েছে অর্থবিত্তে যে তার সমপর্যায়ের নয়। এজন্য সে অসন্তুষ্ট হয় আর রাগে-দুঃখে সবসময় হাহুতাশ করে। এমনও হয় যে, সে তার স্বামীকে ফকীর-মিসকীন বলে তুচ্ছতাচ্ছিল্য করে। তার জীবনটা দ্বন্দ্ব-ফাসাদ আর ঝগড়াঝাটিতে অতিষ্ঠ হয়ে ওঠে। যাতে তার আত্মিক সুখ এবং স্বামীর সঙ্গে তার সুখ বিনষ্ট হয়।[২৫]

২. প্রবৃত্তি পূজারীদের সঙ্গে উঠাবসা ও তাদের সাহচর্য গ্রহণ : একে অপরের সাথে উঠাবসা করলে এবং দীর্ঘদিন কারো সাহচর্যে থাকলে পারস্পরিক ভালবাসা ও সাহায্য-সহযোগিতা বৃদ্ধি পায়। সুতরাং যে প্রবৃত্তির পূজারীদের সঙ্গে একান্তভাবে উঠাবসা করে এবং তাদের সাহচর্যে থাকে সে তাদের দ্বারা অবশ্যই প্রভাবিত হয়। বিশেষ করে যদি সে দুর্বল ব্যক্তিত্ব সম্পন্ন হয় এবং তার মধ্যে বিচার-বিবেচনা ছাড়াই যে কোন ব্যক্তির দ্বারা প্রভাবিত হওয়ার প্রবণতা থাকে। এ কারণেই সালাফে ছালেহীন বিদ'আতী ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের সাথে উঠাবসা করতে নিষেধ করতেন।

আবু কিলাবা (রহঃ) বলেছেন, لا تجالسوا أهل الأهواء ولا تجادلوهم فإني لا آمن أن يغمسوكم في الضلالة أو يلبسوا عليكم في الدين بعض ما لبس عليهم 'তোমরা খেয়াল-খুশি ও প্রবৃত্তির অনুসারীদের সঙ্গে উঠাবসা করো না এবং তাদের সাথে তর্কে লিপ্ত হয়ো না। কেননা আমার ভয় হয় যে, তারা তোমাদেরকে গোমরাহীর মধ্যে ডুবিয়ে দিতে পারে অথবা দ্বীনের কোন কোন বিষয়ে তোমাদেরকে দ্বিধাদ্বন্দ্বে ফেলে দিতে পারে; যেমনটা তারা নিজেরা দ্বিধাদ্বন্দ্বের শিকার।[২৬]

মুজাহিদ (রহঃ) বলেছেন, তোমরা খেয়াল-খুশির অনুসারীদের সাথে উঠাবসা করো না।[২৭] কায়স ইবনু ইবরাহীম থেকেও অনুরূপ বর্ণিত আছে।[২৮]

৩. আল্লাহ ও পরকাল সম্পর্কে যথাযথ জ্ঞানের অভাব : যে মানুষ তার মালিকের যথাযথ কদর করে না সে তো তাকে ক্রুদ্ধ করা, তাঁর নাফরমানী করা কিংবা তাঁর হুকুমের অন্যথা করার কোনই পরোয়া করবে না। তার অন্তরে তো আল্লাহ তা'আলার প্রতি সম্মান ও ভক্তি-শ্রদ্ধা বলে কিছুই নেই। এরূপ লোকদের প্রসঙ্গেই আল্লাহ তা'আলা বলেছেন, وَمَا قَدَرُوا اللهَ

২৪. *বুখারী হা/১৯৬০; মুসলিম হা/১১৩৬।*

২৫. *অথচ ছোটবেলা থেকে দ্বীনী পরিবেশে নিয়ন্ত্রিত কামনার মাঝে বাস করলে ছেলেমেয়ে উভয়েরই পরিণত বয়সে জীবন এত জটিল হয় না। আল্লাহই সবকিছুর মালিক, তিনি যেন সবাইকে সঠিক বুঝ দান করেন।*

২৬. *দারেমী হা/৩৯১, সনদ ছহীহ; আব্দুল্লাহ ইবনু আহমাদ, আস-সুন্নাহ, পৃঃ ৯১।*

২৭. *আল-মালাতী, আত-তানবীহ ওয়ার রাদ্দ, পৃঃ ৮৬।*

২৮. *হিলয়াতুল আওলিয়া ৪/২২২।*

حَقَّ قَدْرِهِ وَالْأَرْضُ جَمِيْعاً قَبْضَتُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وَالسَّماوَاتُ مَطْوِيَّاتٌ بِيَمِيْنِهِ سُبْحَانَهُ وَتَعَالَى عَمَّا يُشْرِكُوْنَ 'আসলে এই লোকগুলো আল্লাহ তা'আলার সেভাবে মূল্যায়নই করেনি যেভাবে তাঁর মূল্যায়ন করা উচিত ছিল। কিয়ামতের দিন গোটা পৃথিবীই থাকবে তাঁর হাতের মুঠোয় এবং আসমানগুলো (একে একে) ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে থাকবে। পবিত্র ও মহান তিনি, ওরা তাঁর সাথে যা কিছু শরীক করে তা থেকে তিনি অনেক উর্ধ্বে' *(যুমার ৩৯/৬৭)*।

৪. খেয়াল-খুশির অনুসারীদের প্রতি অন্যদের কর্তব্য পালন না করা : লোকেরা সৎকাজের আদেশ এবং অসৎ কাজের নিষেধে ভীষণ উদাসীনতা ও গাফলতি করে। ফলে খেয়াল-খুশির অনুসারীদের খেয়াল-খুশি লাগামছাড়া হয়ে যায়। সে তার খেয়াল-খুশি চরিতার্থ করতে মোটেও পরোয়া করে না। এভাবে খেয়াল-খুশি তার মনের উপর জেঁকে বসে এবং তার আচার-আচরণের উপর কর্তৃত্ব করে। এজন্যই ইসলাম সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজের নিষেধের কথা বলেছে- আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلْتَكُنْ مِّنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُوْنَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُوْنَ بِالْمَعْرُوْفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَأُوْلَـئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُوْنَ 'তোমাদের মধ্যে এমন একটি দল থাকা উচিত যারা (মানুষকে) কল্যাণের দিকে ডাকবে; সত্য ও ন্যায়ের আদেশ দিবে, আর অসত্য ও অন্যায় কাজ থেকে (তাদের) বিরত রাখবে। সত্যিকার অর্থে ওরাই হচ্ছে সফলকাম' *(আলে ইমরান ৩/১০৪)*।

আল্লাহ তা'আলা অন্যত্র বলেন, ادْعُ إِلِى سَبِيلِ رَبِّكَ بِالْحِكْمَةِ وَالْمَوْعِظَةِ الْحَسَنَةِ وَجَادِلْهُم بِالَّتِي هِيَ أَحْسَنُ '(হে নবী) তুমি তোমার প্রতিপালকের পথে (মানব জাতিকে) প্রজ্ঞা ও সদুপদেশ দ্বারা আহ্বান কর এবং এমন এক পদ্ধতিতে তাদের সঙ্গে যুক্তিতর্ক কর, যা সবচাইতে উৎকৃষ্ট' *(নাহল ১৬/১২৫)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেছেন, وَعِظْهُمْ وَقُل لَّهُمْ فِي أَنفُسِهِمْ قَوْلاً بَلِيْغاً 'আর আপনি তাদেরকে উপদেশ দিন এবং তাদেরকে আপনি মনকাড়া ওজস্বী ভাষায় কথা শুনান' *(নিসা ৪/৬৩)*।

যখন বেশির ভাগ লোক অন্যায়-অবৈধ কাজ নিষেধ করতে অভ্যস্ত হবে তখন খেয়াল-খুশির অনুসারীদের বেপরওয়া হওয়ার পথে তা প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে।

৫. দুনিয়ার প্রতি ভালবাসা এবং ঝোঁক : যে ব্যক্তি দুনিয়াকে ভালবাসে, দুনিয়ার প্রতি ঝুঁকে পড়ে এবং পরকালের কথা ভুলে যায়, দুনিয়া তার সামনে যত কিছুর স্বপ্ন দেখায় তা সব লাভের জন্য সে তীরবেগে ছুটে যায়। এমনকি তা আল্লাহর বিধানের সুস্পষ্ট লঙ্ঘন হ'লেও সে তার পরোয়া করে না। আর এটাই তো সরাসরি খেয়াল-খুশির অনুসরণ। আমাদের মালিক এই কারণের দিকে দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন, إِنَّ الَّذِيْنَ لاَ يَرْجُوْنَ لِقَاءَنَا وَرَضُوْا بِالْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَاطْمَأَنُّوْا بِهَا وَالَّذِيْنَ هُمْ عَنْ آيَاتِنَا غَافِلُوْنَ، أُوْلَـئِكَ مَأْوَاهُمُ النَّارُ بِمَا كَانُواْ يَكْسِبُوْنَ- 'যারা (মৃত্যুর পর) আমার সাথে সাক্ষাতের প্রত্যাশা করে না, যারা এ পার্থিব জীবন নিয়েই সন্তুষ্ট থাকে এবং এখানকার সবকিছু নিয়েই তৃপ্তিবোধ করে, (সর্বোপরি) যারা আমার নিদর্শনাবলী থেকে অমনোযোগী থাকে, তারাই হচ্ছে ঐসব লোক, যাদের নিশ্চিত ঠিকানা হবে জাহান্নামের আগুন; এ হচ্ছে তাদের সেই কর্মফল, যা তারা দুনিয়ার জীবনে অর্জন করেছিল' *(ইউনুস ১০/৭-৮)*।

৬. কাঙ্ক্ষিত বৈধ জিনিস লাভে বেশি তৎপরতা দেখানো :

মানুষের মন যখন কোন বৈধ জিনিস কামনা করে তখনই সে তা পেতে অনেক সময় দ্রুত ধাবিত হয়। কিন্তু জ্ঞানী-গুণীরা এরূপ কাঙ্ক্ষিত বৈধ জিনিস থেকেও তাদের শিষ্যদের নিষেধ করতেন।

একবার খালাফ ইবনু খলীফা আহওয়াযের শাসনকর্তা সুলায়মান ইবনু হাবীব ইবনুল মুহাল্লাবের সঙ্গে দেখা করেন। তখন তাঁর নিকট বদর নাম্নী এক দাসী ছিল। সে ছিল অত্যন্ত রূপসী ও গুণবতী। সুলাইমান খালাফকে বললেন, এই দাসীকে তোমার দেখতে কেমন লাগছে? খালাফ বললেন, হে আমীর, আল্লাহ আপনার ভাল করুন, আমার এ দু'চোখ তার চেয়ে সুন্দরী নারী কখনো দেখেনি। তিনি বললেন, তুমি এর হাত ধরে নিয়ে যাও। খালাফ বললেন, আমি যখন আমীরকে তাকে ভালোবাসতে দেখেছি, তখন আমার পক্ষে তাকে নিয়ে যাওয়া শোভনীয় নয়। শাসনকর্তা তখন বললেন, আরে রাখ, আমি তাকে ভালবাসলেও তুমি তাকে নিয়ে যাও। এতে করে আমার প্রবৃত্তি বুঝতে পারবে, আমি তার উপর জয়যুক্ত হ'তে পেরেছি।[২৯]

এভাবে ধৈর্য-সহিষ্ণুতায় অভ্যস্ত হওয়ার মানসে মনকে কিছু কিছু বৈধ জিনিস থেকে বঞ্চিত করার মাঝেও বিশেষ কল্যাণ রয়েছে। বিশেষ করে মনের ঝোঁক ও প্রবৃত্তি যখন হারামের দিকে ধাবিত হয় তখন তো মুবাহ পরিত্যাগ করাই বাঞ্ছনীয়। এরূপ ক্ষেত্রে মুবাহ বা বৈধ বিষয়ে বরাবর অভ্যস্ত হয়ে উঠলে অনেক সময় ব্যক্তির মন হারামের সামনে দুর্বল হয়ে পড়ে।

৭. খেয়াল-খুশির অনুসরণের পরিণাম সম্পর্কে অজ্ঞতা : কোন কিছুর পরিণতি সম্পর্কে মানুষের জানা না থাকলে তার দ্বারা সেটা বারবার হ'তে পারে। কু-প্রবৃত্তি ও খেয়াল-খুশির অনেক রকম ক্ষতি ও অনিষ্টতা রয়েছে। সেগুলো জানা থাকলে খেয়াল-খুশির অনুসারী লোকটি হতো তা প্রতিহত করতে পারত। আহমাদ ইবনুল কাসেম আত-ত্বাবারাণী কবিতায় বলেছেন,

سَأَحْذَرُ مَا يُخَافُ عَلَيَّ مِنْهُ + وَأَتْرُكُ مَا هَوِيْتُ لِمَا خَشِيْتُ

'আমার থেকে যা হওয়ার ভয় হয় আমি তা থেকে অবশ্যই সাবধান থাকব। আর যা আমি ভয় করি তার কারণে আমি আমার কামনা-বাসনার জিনিস বর্জন করি'।[৩০]

[চলবে]

---

২৯. *যাম্মুল হাওয়া, পৃঃ ২৬।*
৩০. *ইবনু আসাকির, তারিখু দিমাশ্‌ক ৭/৩৭২।*

মুহাররম মাসের সুন্নাত ও বিদ‘আত

*মুহাম্মাদ শরীফুল ইসলাম**

ভূমিকা :

আল্লাহ তা‘আলা বার মাসের মধ্যে মুহাররম, রজব, যুলক্বা‘দাহ ও যুলহিজ্জাহ এই চারটি মাসকে বিশেষ মর্যাদা দান করেছেন। এই মাসগুলো ‘হারাম’ বা সম্মানিত মাস হিসাবে পরিগণিত। ঝগড়া-বিবাদ, লড়াই, খুন-খারাবী ইত্যাদি অন্যায়-অপকর্ম হ’তে দূরে থেকে এর মর্যাদার প্রতি সম্মান প্রদর্শন করা প্রত্যেক মুসলমানের কর্তব্য। যেমন আল্লাহ বলেন, فَلاَ تَظْلِمُوْا فِيْهِنَّ أَنْفُسَكُمْ ‘এই মাসগুলিতে তোমরা পরস্পরের উপরে অত্যাচার কর না’ *(তওবা ৯/৩৬)*। রাসূল (ছাঃ) কর্তৃক আশূরার ছিয়াম পালন ও এর ফযীলত বর্ণনার মাধ্যমে স্বাভাবিকভাবেই এ মাসের মর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। তবে দুঃখের বিষয় হ’ল, রাসূল (ছাঃ) যে উদ্দেশ্যে আশূরার ছিয়াম পালন করেছেন, আমরা তাঁর উদ্দেশ্যের কথা ভুলে গিয়ে এমন উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করছি যা কুরআন ও সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিরোধী। সাথে সাথে এমন সব বিদ‘আতে লিপ্ত হয়েছি যা থেকে বেঁচে থাকা একান্ত যরূরী। নিম্নে মুহাররম মাসের সুন্নাত ও বিদ‘আত সম্পর্কে আলোকপাত করা হ’ল।-

মুহাররম মাসের সুন্নাতী আমল

মুহাররম মাসের সুন্নাতী আমল সম্পর্কে ছহীহ হাদীছ সমূহে যা বর্ণিত হয়েছে তা হ’ল আশূরার ছিয়াম পালন করা। রাসূল (ছাঃ) ১০ই মুহাররমে ছিয়াম পালন করেছেন। ইহূদী ও নাছারারা শুধুমাত্র ১০ই মুহাররমকে সম্মান করত এবং ছিয়াম পালন করত। তাই রাসূল (ছাঃ) তাদের বিরোধিতা করার জন্য ঐ দিন সহ তার পূর্বের অথবা পরের দিন সহ ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিয়েছেন। অতএব সুন্নাত হ’ল, ৯ ও ১০ই মুহাররম অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররমে ছিয়াম পালন করা। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন,

حِيْنَ صَامَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ قَالُوْا يَا رَسُوْلَ اللهِ إِنَّهُ يَوْمٌ تُعَظِّمُهُ الْيَهُوْدُ وَالنَّصَارَى. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَإِذَا كَانَ الْعَامُ الْمُقْبِلُ إِنْ شَاءَ اللهُ صُمْنَا الْيَوْمَ التَّاسِعَ قَالَ فَلَمْ يَأْتِ الْعَامُ الْمُقْبِلُ حَتَّى تُوُفِّىَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم-

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন আশূরার ছিয়াম পালন করলেন এবং ছিয়াম পালনের নির্দেশ দিলেন, তখন ছাহাবায়ে কেরাম রাসূল (ছাঃ)-কে বললেন, হে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ)! ইহূদী ও নাছারাগণ এই দিনটিকে (১০ই মুহাররম) সম্মান করে। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, ‘আগামী বছর বেঁচে থাকলে ইনশাআল্লাহ আমরা ৯ই মুহাররম সহ ছিয়াম রাখব’। রাবী বলেন, কিন্তু পরের বছর মুহাররম আসার আগেই তাঁর মৃত্যু হয়ে যায়।[31] অন্য হাদীছে এসেছে, ইবনু আব্বাস (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, صُوْمُوْا يَوْمَ عَاشُوْرَاءَ وَخَالِفُوْا فِيْهِ الْيَهُوْدَ صُوْمُوْا قَبْلَهُ يَوْماً أَوْ بَعْدَهُ يَوْماً- ‘তোমরা আশূরার দিন ছিয়াম রাখ এবং ইহূদীদের বিরোধিতা কর। তোমরা আশূরার সাথে তার পূর্বে একদিন বা পরে একদিন ছিয়াম পালন কর’।[32]

আশূরার ছিয়ামের ফযীলত :

ফযীলতের দিক থেকে রামাযানের ছিয়ামের পরেই আশূরার ছিয়ামের অবস্থান। এটা পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহের কাফফারা স্বরূপ। অর্থাৎ এর মাধ্যমে পূর্ববর্তী এক বছরের গুনাহ ক্ষমা হয়। আবু হুরায়রা (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, أَفْضَلُ الصِّيَامِ بَعْدَ رَمَضَانَ شَهْرُ اللهِ الْمُحَرَّمُ وَأَفْضَلُ الصَّلاَةِ بَعْدَ الْفَرِيْضَةِ صَلاَةُ اللَّيْلِ- ‘রামাযানের পরে সর্বোত্তম ছিয়াম হ’ল মুহাররম মাসের ছিয়াম (অর্থাৎ আশূরার ছিয়াম) এবং ফরয ছালাতের পরে সর্বোত্তম ছালাত হ’ল রাতের নফল ছালাত’ (অর্থাৎ তাহাজ্জুদের ছালাত)।[33] অন্য হাদীছে এসেছে, আবু ক্বাতাদাহ (রাঃ) হ’তে বর্ণিত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, وَصِيَامُ يَوْمِ عَاشُوْرَاءَ أَحْتَسِبُ عَلَى اللهِ أَنْ يُكَفِّرَ السَّنَةَ الَّتِى قَبْلَهُ- ‘আমি আশা করি আশূরা বা ১০ই মুহাররমের ছিয়াম আল্লাহ্র নিকটে বান্দার বিগত এক বছরের (ছগীরা) গোনাহের কাফফারা হিসাবে গণ্য হবে’।[34]

আশূরার ছিয়াম পালনের উদ্দেশ্য :

১০ই মুহাররম তারিখে অত্যাচারী পাপিষ্ঠ ফেরাঊন ও তার কওম আল্লাহ্র প্রিয় নবী মূসা (আঃ)-কে হত্যার ঘৃণিত ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হ’লে ফেরাঊনের সাগরডুবি হয় এবং মূসা (আঃ) ও তাঁর সম্প্রদায় বনু ইস্রাঈল আল্লাহ তা‘আলার বিশেষ রহমতে অত্যাচারী ফেরাঊনের হাত থেকে মুক্তিলাভ করে। তার শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন নফল ছিয়াম রাখেন। মূসা (আঃ)-এর তাওহীদী আদর্শের সনিষ্ঠ অনুসারী হিসাবে স্বয়ং মুহাম্মাদ (ছাঃ) এ দিনে নফল ছিয়াম পালন করেছেন এবং তাঁর উম্মতকে পালন করতে বলেছেন। ইহূদীরা কেবল ১০ তারিখে ছিয়াম রাখত। তাই তাদের বিরোধিতার লক্ষ্যে তার আগের অথবা পরের দিনকে যোগ করার কথা রাসূল (ছাঃ) বলেছেন। হাদীছে এসেছে, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় হিজরত করে ইহূদীদেরকে আশূরার ছিয়াম রাখতে দেখে কারণ জিজ্ঞেস করলে তারা বলেন,

---

* *লিসান্স, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব; দাঈ, আল-ফুরক্বান ইসলামিক সেন্টার, মানামা, বাহারাইন।*

৩১. *মুসলিম হা/১১৩৪।*
৩২. *বায়হাক্বী ৪র্থ খণ্ড, পৃঃ ২৮৭। অত্র রেওয়ায়াতটি ‘মারফূ’ হিসাবে ছহীহ নয়, তবে ‘মওকূফ’ হিসাবে ‘ছহীহ’। দ্রঃ হাশিয়া ছহীহ ইবনু খুযায়মা হা/২০৯৫, ২/২৯০ পৃঃ। ৯, ১০ বা ১০ ও ১১ দু’দিন ছিয়াম রাখা উচিত। তবে ৯ ও ১০ দু’দিন রাখাই সর্বোত্তম।*
৩৩. *মুসলিম হা/১১৬৩, মিশকাত হা/২০৩৯ ‘নফল ছিয়াম’ অনুচ্ছেদ; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪১।*
৩৪. *মুসলিম হা/১১৬২, মিশকাত হা/২০৪৪; ঐ, বঙ্গানুবাদ হা/১৯৪৬।*

هَذَا يَوْمٌ عَظِيمٌ أَنْجَى اللهُ فِيْهِ مُوْسَى وَقَوْمَهُ وَغَرَّقَ فِرْعَوْنَ وَقَوْمَهُ فَصَامَهُ مُوْسَى شُكْرًا فَنَحْنُ نَصُوْمُهُ. فَقَالَ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم فَنَحْنُ أَحَقُّ وَأَوْلَى بِمُوْسَى مِنْكُمْ. فَصَامَهُ رَسُوْلُ اللهِ صلى الله عليه وسلم وَأَمَرَ بِصِيَامِهِ

‘এটি একটি মহান দিন। এদিনে আল্লাহ মূসা (আঃ) ও তাঁর কওমকে নাজাত দিয়েছিলেন এবং ফেরাউন ও তার লোকদের ডুবিয়ে মেরেছিলেন। তাঁর শুকরিয়া হিসাবে মূসা (আঃ) এ দিন ছিয়াম পালন করেন। তাই আমরাও এ দিন ছিয়াম পালন করি। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তোমাদের চাইতে আমরাই মূসা (আঃ)-এর (আদর্শের) অধিক হকদার ও অধিক দাবীদার। অতঃপর তিনি ছিয়াম রাখেন ও সকলকে রাখতে বলেন’।[৩৫]

উল্লেখ্য যে, আশূরায়ে মুহাররম উপলক্ষে ৯ ও ১০ই মহাররম অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম এই দু’টি ছিয়াম পালন করা সুন্নাত। এছাড়া অন্য কোন ইবাদত সুন্নাত নয়। আর তাও হ’তে হবে একমাত্র ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ। শাহাদতে হুসাইনের শোক বা মাতম স্বরূপ কখনোই নয়।

মুহাররম মাসের বিদ‘আত সমূহ

(১) শাহাদতে হুসাইনের শোক পালনের উদ্দেশ্যে ছিয়াম পালন করা : উপরোক্ত আলোচনায় মুহাররম মাসের সুন্নাতী আমল এবং তা পালনের উদ্দেশ্য ছহীহ হাদীছ দ্বারা স্পষ্টভাবে প্রমাণিত হ’ল। আর তা হ’ল, অত্যাচারী শাসক ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ ৯ ও ১০ই মুহাররম অথবা ১০ ও ১১ই মুহাররম ছিয়াম পালন করা। বর্তমান সমাজে উক্ত দু’টি ছিয়াম পালনের প্রচলন রয়েছে। তবে তা শাহাদতে হুসাইনের শোক পালনের উদ্দেশ্যেই পালিত হয়ে থাকে। যা সম্পূর্ণরূপে ছহীহ হাদীছ বিরোধী এবং স্পষ্ট বিদ‘আত। কেননা এই ছিয়ামের সূচনা হয়েছে মূসা (আঃ)-এর সময় থেকে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তাঁর জীবদ্দশাতেই মুহাররমের ছিয়াম পালন করেছেন। আর কারবালার ঘটনা ঘটেছে রাসূল (ছাঃ)-এর মৃত্যুর ৫০ বছর পরে ৬১ হিজরীতে। তাহ’লে কি করে আল্লাহর রাসূল (ছাঃ) হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের কারণে এই ছিয়াম পালন করলেন? অতএব এসব নিছক ভিত্তিহীন কথা মাত্র। রাসূল (ছাঃ) আশূরার ছিয়াম পালন করেছিলেন অত্যাচারী শাসক ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের আনন্দে আল্লাহর শুকরিয়া স্বরূপ। পক্ষান্তরে আমরা আজ তা পালন করছি হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের শোক স্বরূপ। অথচ ওমর (রাঃ), ওছমান (রাঃ) সহ আরো অনেক ছাহাবী শাহাদত বরণ করেছেন। আমরা তাঁদের স্মরণে কিছুই করি না। যদি হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের কারণে শোক দিবস পালন করা হয়, তাহ’লে ওমর ও ওছমান (রাঃ)-এর শোক দিবস পালনের অধিক হক রাখে। বিদ‘আতীদের নিকট এ সমস্ত ছাহাবায়ে কেরামের শাহাদত বরণে শোক তো দূরের কথা; বরং আনন্দ দিবসে পরিণত হয়। যেমন- আব্বাসীয় খলীফা মুত্বী‘ বিন মুক্বতাদিরের সময়ে (৩৩৪-৩৬৩হিঃ/৯৪৬-৯৭৪ খৃঃ) তাঁর কট্টর শী‘আ আমীর আহমাদ বিন বুইয়া দায়লামী ওরফে মুইযযুদ্দৌলা ৩৫১ হিজরীর ১৮ই যিলহজ্জ তারিখে বাগদাদে ওছমান (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের তারিখকে তাদের হিসাবে খুশীর দিন মনে করে ‘ঈদের দিন’ (عيد غدير خم) হিসাবে ঘোষণা করেন। শী‘আদের নিকটে এই দিনটি পরবর্তীতে ঈদুল আযহার চাইতেও গুরুত্ব পায়। অতঃপর ৩৫২ হিজরীর শুরুতে ১০ই মুহাররমকে তিনি হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদত বরণের ‘শোক দিবস’ ঘোষণা করেন এবং সকল দোকান-পাট, ব্যবসা-বাণিজ্য, অফিস-আদালত বন্ধ করে দেন এবং মহিলাদেরকে শোকে চুল ছিঁড়তে, চেহারা কালো করতে, রাস্তায় নেমে শোকগাথা গেয়ে চলতে বাধ্য করেন। শহর ও গ্রামের সর্বত্র সকলকে শোক মিছিলে যোগদান করতে নির্দেশ দেন। শী‘আরা খুশী মনে এই নির্দেশ পালন করে। কিন্তু সুন্নীরা নিষ্ক্রিয় থাকেন। পরে সুন্নীদের উপরে এই ফরমান জারি করা হ’লে ৩৫৩ হিজরীতে উভয় দলে ব্যাপক সংঘর্ষ বেধে যায়। এতে বাগদাদে তীব্র নাগরিক অসন্তোষ ও সামাজিক অশান্তির সৃষ্টি হয়।[৩৬] আমরা বর্তমানে যে উদ্দেশ্যে আশূরার ছিয়াম পালন করছি তা শী‘আদের থেকে গৃহীত; যা অবশ্যই বর্জনীয়।

(২) ১০ই মুহাররমকে আনন্দ উৎসবে পরিণত করা : রাফেযীরা (কট্টর শী‘আ) হুসাইন (রাঃ)-এর শাহাদতের শোক স্বরূপ শোক দিবস পালন করে। পক্ষান্তরে একটি গোষ্ঠী রাফেযীদের বিরোধিতা করার লক্ষ্যে এ দিনটিকে আনন্দ উৎসবে পরিণত করে। এ দিনে রাফেযীদের শোক দিবস যেমন বিদ‘আত; তেমনি তাদের বিরোধিতার লক্ষ্যে এ দিনে আনন্দ উৎসব করাও বিদ‘আত। এটা যেন বিদ‘আত দিয়ে বিদ‘আত এবং মিথ্যা দিয়ে মিথ্যা প্রতিহত করার চেষ্টা। অথচ উচিত ছিল সুন্নাত দিয়ে বিদ‘আত প্রতিহত করা। সত্য দিয়ে মিথ্যা প্রতিহত করা। রাসূল (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম এ দিনটিকে শোক দিবস হিসাবেও পালন করেননি। আবার আনন্দ উৎসবেও পরিণত করেননি। তাঁরা শুধুমাত্র ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ ছিয়াম পালন করেছেন।[৩৭]

(৩) তা‘যিয়া : তা‘যিয়া অর্থ বিপদে সান্ত্বনা দেওয়া। যেটা বর্তমানে শাহাদাতে হোসাইনের শোক মিছিলে রূপ নিয়েছে। অথচ ইসলামে কারো মৃত্যুতে তিন দিনের অধিক শোক পালন করা নিষেধ।[৩৮] কিন্তু বাগদাদের গোঁড়া শী‘আ আমীর মু‘ইযযুদ্দৌলা ৩৫২ হিজরীর ১০ই মুহাররমকে জাতীয় শোক দিবস ঘোষণা করেন এবং শহর ও গ্রামের সকলকে তা‘যিয়া মিছিলে যোগদানের নির্দেশ দেন। সেদিন থেকেই এই বিদ‘আতী প্রথা চালু হয়েছে। শী‘আদের উদ্ভাবিত এই

৩৫. মুসলিম হা/১১৩০।

৩৬. ইবনুল আছীর, তারীখ ৮/১৮৪ পৃঃ; মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব, আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৬-৭।

৩৭. ড. সুলাইমান ইবনে সালেম আস-সুহাইমী, আল-আ‘ইয়াদ ওয়া আছারুহা, পৃঃ ২৭৩।

৩৮. আবুদাঊদ, নাসাঈ, মিশকাত হা/৪৪৬৩ ‘চুল আঁচড়ানো’ অনুচ্ছেদ।

Contents

বিদ‘আতী প্রথার অনুসরণেই বাংলাদেশের বিদ‘আতীরা ১০ই মুহাররমে মিছিল বের করে থাকে। প্রত্যেক আল্লাহভীরু মুসলমানের এই সব বিদ‘আত হ’তে দূরে থাকা আবশ্যক।

(৪) ১০ই মুহাররমে চোখে সুরমা লাগানো : অনেকেই আশুরার দিন বা ১০ই মুহাররমে বিশেষ ফযীলতের আশায় চোখে সুরমা লাগিয়ে থাকে; যা সুস্পষ্ট বিদ‘আত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম আশূরার দিনে চোখে সুরমা লাগাননি এবং এর কোন ফযীলত বর্ণনা করেননি। ‘আশূরার দিনে চোখে ইছমিদ সুরমা লাগালে কখনোই চোখে রোগ হবে না’ মর্মে প্রচলিত হাদীছটি মাওযূ বা জাল।[৩৯]

(৫) ১০ই মুহাররমে বিশেষ ফযীলতের আশায় বিশেষ পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করা : ১০ই মুহাররমে বিশেষ ফযীলতের আশায় বিশেষ পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করা হয়ে থাকে; যা সুস্পষ্ট বিদ‘আত। কেননা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম এ দিনে বিশেষ কোন ছালাত আদায় করেছেন মর্মে কোন ছহীহ দলীল পাওয়া যায় না। এ সম্পর্কে যা পাওয়া যায় তার সবগুলিই জাল বা বানোয়াট। যেমন-

(ক) আবু হুরায়রা (রাঃ) হ’তে বর্ণিত, রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, ‘আশূরার দিনে যে ব্যক্তি চার রাক‘আত ছালাত আদায় করবে এবং প্রত্যেক রাক‘আতে একবার সূরা ফাতিহা ও পঞ্চাশবার সূরা ইখলাছ তেলাওয়াত করবে, আল্লাহ তা‘আলা তার অতীতের পঞ্চাশ বছরের গুনাহ এবং ভবিষ্যতের পঞ্চাশ বছরের গুনাহ ক্ষমা করে দিবেন’। উল্লিখিত হাদীছটি জাল বা বানোয়াট।[৪০]

(খ) রাসূল (ছাঃ) বলেছেন, যে ব্যক্তি আশূরার দিনে যোহর ও আছরের ছালাতের মাঝখানে চল্লিশ রাক‘আত ছালাত আদায় করবে। প্রত্যেক রাক‘আতে একবার সূরা ফাতিহা, দশবার আয়াতুল কুরসী, দশবার সূরা ইখলাছ, পাঁচবার সূরা ফালাক্ব এবং পাঁচবার সূরা নাস তেলাওয়াত করবে আল্লাহ তা‘আলা তাকে জান্নাতুল ফিরদাউস দান করবেন’। অত্র হাদীছটিও জাল বা বানোয়াট।[৪১]

শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ (রহঃ) বলেন, ليس في حديث عاشوراء حديث صحيح غير الصوم، وما يروي في فضل صلاة معينة فيه فهذا كله كذب موضوع باتفاق أهل المعرفة، ولم ينقل هذه الأحاديث أحد من أئمة أهل العلم في كتبهم– ‘ছিয়াম ব্যতীত আশূরা সম্পর্কিত কোন ছহীহ হাদীছ নেই। এই দিনে নির্দিষ্ট ছালাতের ফযীলত সম্পর্কে যে বর্ণনা এসেছে প্রসিদ্ধ মুহাদ্দিছগণের ঐক্যমতে তার সবগুলিই মিথ্যা ও বানোয়াট। মুহাক্কিক আলেমদের কেউই তাদের কিতাব সমূহে এ সমস্ত হাদীছ সংকলন করেননি।[৪২]

অতএব এ উপলক্ষে আশূরার দু’টি ছিয়াম ব্যতীত অন্য কোন ইবাদত রাসূলুল্লাহ (ছাঃ), ছাহাবায়ে কেরাম, তাবেঈনে ইযাম, ইমাম চতুষ্টয়ের কেউ কখনোই করেননি। আর তাঁরা ছিয়াম দু’টি পালন করেছেন কেবল ফেরাউনের কবল থেকে মূসা (আঃ)-এর নাজাতের শুকরিয়া স্বরূপ; শাহাদতে হুসাইনের শোক স্বরূপ নয়। সুতরাং বর্তমানে আশূরা উপলক্ষে যা হচ্ছে তার সবগুলিই পরবর্তী যুগের বিদ‘আতীদের আবিষ্কার; যা অবশ্যই বর্জনীয়।

(৬) তাবেঈ ইয়াযীদ বিন মু‘আবিয়া-কে ‘মালঊন’ বা অভিশপ্ত বলে গালি দেওয়া : ইয়াযীদ বিন মু‘আবিয়াকে ‘মালঊন’ বা অভিশপ্ত বলে গালি দেওয়া আদৌ ঠিক নয়। বরং সকল মুসলমানের ন্যায় তার মাগফেরাতের জন্য দো‘আ করা উচিত। কেননা মানুষ হিসাবে তার কিছু ভুল-ত্রুটি থাকলেও কারবালার মর্মান্তিক ঘটনার জন্য তিনি দায়ী নন। এজন্য মূলতঃ দায়ী বিশ্বাসঘাতক কূফাবাসী ও নিষ্ঠুর গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ। কেননা ইয়াযীদ কেবল হুসাইন (রাঃ)-এর আনুগত্য চেয়েছিলেন, তাঁর খুন চাননি। হুসাইন (রাঃ) সে আনুগত্য দিতেও প্রস্তুত ছিলেন। ইয়াযীদ স্বীয় পিতার অছিয়ত অনুযায়ী হুসাইনকে সর্বদা সম্মান করেছেন এবং তখনও করতেন। হুসাইন (রাঃ)-এর ছিন্ন মস্তক ইয়াযীদের সামনে রাখা হ’লে তিনি কেঁদে বলে ওঠেন, ‘ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের উপর আল্লাহ লা‘নত করুন। আল্লাহর কসম! যদি হুসাইনের সাথে ওর রক্তের সম্পর্ক থাকত, তাহ’লে সে কিছুতেই তাঁকে হত্যা করত না। তিনি আরো বলেন, হুসাইনের খুন ছাড়াও আমি ইরাকীদেরকে আমার আনুগত্যে রাযী করাতে পারতাম’।[৪৩]

কূফার নেতাদের লিখিত ১৫০টি পত্র পেয়ে হুসাইন (রাঃ) কূফায় আসলে বছরার গভর্ণর ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদ কূফার গভর্ণর মুসলিম বিন আকীলকে গ্রেফতার করে হত্যা করে। এদিকে হুসাইন (রাঃ) প্রদত্ত তিনটি প্রস্তাবের কোনটি গ্রহণ না করায় দুষ্টমতি ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের সাথে সংঘর্ষ অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। এতে হুসাইন (রাঃ) সপরিবারে নিহত হন।[৪৪]

উপসংহার :

সম্মানিত পাঠক! পরিপূর্ণভাবে ইসলামের উপর টিকে থাকতে হ’লে ফিরে যেতে হবে একমাত্র পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর দিকে। মুসলিম জাতি আজ কুরআন-সুন্নাহ থেকে ছিটকে পড়েছে। ফলে বিদ‘আতের কাল মেঘে আচ্ছাদিত হয়েছে ইসলামী শরী‘আতের স্বচ্ছ আকাশ। এ থেকে বেরিয়ে আসার জন্য শারঈ জ্ঞানার্জন অপরিহার্য। মুহাররম মাসে রাসূল (ছাঃ) কি করেছেন আর আমরা কি করছি তা মিলিয়ে দেখতে হবে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর সাথে। কারবালার ঘটনা সম্পর্কে সকল প্রকার আবেগ ও বাড়াবাড়ি হ’তে দূরে থাকতে হবে এবং আশূরা উপলক্ষে প্রচলিত শিরক ও বিদ‘আতী আক্বীদা-বিশ্বাস ও রসম-রেওয়াজ পরিহার করতে হবে। আল্লাহ আমাদেরকে বিদ‘আত মুক্ত জীবন-যাপন করার তওফীক্ব দান করুন- আমীন!

---

৩৯. ইবনুল জাওযী, আল-মাওযূ‘আত পৃঃ ২/২০৩; মোল্লা আলী ক্বারী, আসরারুল মারফূ‘আহ, পৃঃ ৪৪।
৪০. আল-মাওযূ‘আত পৃঃ ২/১২২।
৪১. আল-মাওযূ‘আত পৃঃ ২/১২২-১২৩; শাওকানী, আল-ফাওয়াইদুল মাজমূ‘আহ পৃঃ ৪৮।
৪২. শায়খুল ইসলাম ইবনে তায়মিয়াহ, মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/১১৬।
৪৩. ইবনু তায়মিয়া, মুখতাছার মিনহাজুস সুন্নাহ, ১/৩৫০; আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/১৭৩; আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়, পৃঃ ৭-১০।
৪৪. ইবনু হাজার, আল-ইছাবাহ ২/২৫২; ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ৮/১৫৪, ১৭১।

কুরআন ও সুন্নাহ্‌র আলোকে ঈমান

আব্দুল মতীন*

(৩য় কিস্তি)

ঈমান বৃদ্ধির উপায় সমূহ :

(১) মানব জীবনে তাওহীদ প্রতিষ্ঠা করা : তাওহীদ তিন প্রকার। যথা- (ক) তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ (খ) তাওহীদে উলূহিয়্যাহ (গ) তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাত।

(ক) তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ :

তাওহীদে রুবূবিয়্যাহ হল প্রতিপালক হিসাবে আল্লাহকে একক গণ্য করা। যেমন- আল্লাহ তা'আলা সকল সৃষ্টির পালনকর্তা, সৃষ্টিকর্তা, রিযিকদাতা, জীবন ও মৃত্যুদাতা, কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক। অতএব সকল বিপদাপদে তাঁর নিকটেই প্রার্থনা করতে হবে। তাঁর কোন শরীক নেই। তিনি বিশ্বজাহানের প্রতিপালক। যেমন মহান আল্লাহ বলেন, اَلْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ 'সমস্ত প্রশংসা আল্লাহ্‌র জন্য, যিনি জগৎসমূহের প্রতিপালক' *(ফাতেহা ১)*। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন, قُلْ أَعُوْذُ بِرَبِّ النَّاسِ 'বল, আমি আশ্রয় প্রার্থনা করছি মানুষের প্রতিপালকের নিকট' *(নাস ১)*। আল্লাহ তা'আলা সকলের সৃষ্টিকর্তা। তিনি বলেন, 'তারা কি স্রষ্টা ব্যতীতই সৃষ্ট হয়েছে, না তারা নিজেরাই (নিজেদের) স্রষ্টা' *(তূর ৩৫)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَلَئِنْ سَأَلْتَهُم مَّنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ لَيَقُولُنَّ خَلَقَهُنَّ الْعَزِيْزُ الْعَلِيْمُ 'তুমি যদি তাদেরকে (মুশরিকদেরকে) জিজ্ঞেস কর, কে আকাশমণ্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছে? তারা অবশ্যই বলবে, এগুলো তো সৃষ্টি করেছেন পরাক্রমশালী, সর্বজ্ঞ আল্লাহ' *(যুখরুফ ৯)*।

আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন,

خَلَقَ السَّمَاوَاتِ بِغَيْرِ عَمَدٍ تَرَوْنَهَا وَأَلْقَى فِي الْأَرْضِ رَوَاسِيَ أَن تَمِيدَ بِكُمْ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ وَأَنزَلْنَا مِنَ السَّمَاءِ مَاءً فَأَنبَتْنَا فِيهَا مِن كُلِّ زَوْجٍ كَرِيمٍ- هَذَا خَلْقُ اللَّهِ فَأَرُونِي مَاذَا خَلَقَ الَّذِينَ مِن دُونِهِ بَلِ الظَّالِمُونَ فِي ضَلَالٍ مُّبِينٍ-

'তিনি আকাশমণ্ডলী নির্মাণ করেছেন স্তম্ভ ব্যতীত, তোমরা এটা দেখছ। তিনি পৃথিবীতে স্থাপন করেছেন পর্বতমালা যাতে এটা তোমাদেরকে নিয়ে ঢলে না পড়ে এবং এতে ছড়িয়ে দিয়েছেন সর্বপ্রকার জীব-জন্তু এবং আমরাই আকাশ হ'তে বৃষ্টি বর্ষণ করে এতে উদগত করি সর্বপ্রকার কল্যাণকর উদ্ভিদরাজি। এটা আল্লাহ্‌র সৃষ্টি! তিনি ছাড়া অন্যেরা কি সৃষ্টি করেছে তা আমাকে দেখাও; বরং সীমালংঘনকারীরা তো স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে রয়েছে' *(লোকমান ১০-১১)*। মহান আল্লাহই সকল সৃষ্টির রিযিকদাতা। তিনি বলেন, وَمَا مِنْ دَآبَّةٍ فِي الأَرْضِ إِلاَّ عَلَى اللهِ رِزْقُهَا 'আর ভূ-পৃষ্ঠে যত প্রাণী বিচরণ করে তাদের সকলেরই রিযিক আল্লাহ দিয়ে থাকেন' *(হূদ ৬)*। আল্লাহই মানুষের জীবনদাতা ও মৃত্যুদাতা। মহান আল্লাহ বলেন, كَيْفَ تَكْفُرُوْنَ بِاللهِ وَكُنتُمْ أَمْوَاتاً فَأَحْيَاكُمْ ثُمَّ يُمِيْتُكُمْ ثُمَّ يُحْيِيْكُمْ ثُمَّ إِلَيْهِ تُرْجَعُوْنَ 'কিরূপে তোমরা আল্লাহকে অবিশ্বাস করছ? অথচ তোমরা নির্জীব ছিলে, পরে তিনিই তোমাদেরকে জীবিত করেছেন, পুনরায় তিনি তোমাদেরকে নির্জীব করবেন, পরে আবার জীবন্ত করবেন। অবশেষে তোমাদেরকে তাঁরই দিকে ফিরে যেতে হবে' *(বাক্বারাহ ২/২৮)*।

উপরে বর্ণিত বিষয় সমূহে আল্লাহ্‌র সাথে কাউকে শরীক করা যাবে না। কারণ আমরা সবাই রূহের জগতে মহান আল্লাহকে প্রতিপালক হিসাবে স্বীকৃতি দান করেছি। মহান আল্লাহ বলেন, وَإِذْ أَخَذَ رَبُّكَ مِنْ بَنِي آدَمَ مِنْ ظُهُوْرِهِمْ ذُرِّيَّتَهُمْ وَأَشْهَدَهُمْ عَلَى أَنْفُسِهِمْ أَلَسْتُ بِرَبِّكُمْ قَالُوْا بَلَى شَهِدْنَا أَنْ تَقُوْلُوْا يَوْمَ الْقِيَامَةِ إِنَّا كُنَّا عَنْ هَذَا غَافِلِيْنَ 'হে নবী! যখন তোমার প্রতিপালক বনী আদমের পৃষ্ঠদেশ হ'তে তাদের সন্তানদেরকে বের করলেন এবং তাদেরকেই তাদের উপর সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন, 'আমি কি তোমাদের প্রতিপালক নই? তারা বলল, হ্যাঁ! আমরা সাক্ষী থাকলাম। (এই স্বীকৃতি এজন্য যে), যাতে তোমরা ক্বিয়ামতের দিন বলতে না পার আমরা এ বিষয়ে সম্পূর্ণ অনবহিত ছিলাম' *(আ'রাফ ১৭২)*।

প্রত্যেক আদম সন্তানই ইসলামের উপর তথা তাওহীদের উপর জন্মলাভ করে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, مَا مِنْ مَوْلُودٍ إِلاَّ يُولَدُ عَلَى الْفِطْرَةِ، فَأَبَوَاهُ يُهَوِّدَانِهِ أَوْ يُنَصِّرَانِهِ أَوْ يُمَجِّسَانِهِ، كَمَا تُنْتَجُ الْبَهِيمَةُ بَهِيمَةً جَمْعَاءَ، هَلْ تُحِسُّونَ فِيهَا مِنْ جَدْعَاءَ. ثُمَّ يَقُولُ أَبُو هُرَيْرَةَ رضى الله عنه (فِطْرَةَ اللهِ الَّتِى فَطَرَ النَّاسَ عَلَيْهَا لاَ تَبْدِيلَ لِخَلْقِ اللهِ ذَلِكَ الدِّينُ الْقَيِّمُ). 'প্রত্যেক নবজাতকই ফিৎরাতের উপর (তাওহীদের উপর) জন্মলাভ করে। অতঃপর তার পিতা-মাতা তাকে ইহূদী, নাছারা বা অগ্নিপূজক রূপে গড়ে তোলে। যেমন চতুষ্পদ প্রাণী একটা পূর্ণাঙ্গ বাচ্চা জন্ম দেয়। তোমরা কি তাকে কোন (জন্মগত) কানকাটা দেখতে পাও? অতঃপর আবু হুরায়রা (রাঃ) তিলাওয়াত করলেন, তাঁর (আল্লাহ্‌র) দেয়া ফিৎরাতের অনুসরণ কর, যে ফিৎরাতের উপর তিনি মানুষ সৃষ্টি করেছেন। আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন পরিবর্তন নেই, এটাই সরল সুদৃঢ় দ্বীন' *(রূম ৩০)*।[৪৫] অতএব যে ফিৎরাতের উপর মানুষ সৃষ্টি হয়েছে তার উপর অটল থাকলে সে সরল-সঠিক সুদৃঢ় পথে টিকে থাকবে। এতে তার ঈমান বাড়বে

* *লিসান্স ও এম.এ, মদীনা ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়, সঊদী আরব।*

৪৫. *বুখারী হা/১৩৫৯।*

Contents

এবং পরকালে সুখময় স্থান জান্নাত লাভ করবে ইনশাআল্লাহ। পক্ষান্তরে ফিৎরাতের পরিবর্তন করলেই সঠিক পথ হারিয়ে বিভ্রান্ত হবে।

(খ) তাওহীদে উলূহিয়্যাহ বা তাওহীদে ইবাদত :

সকল প্রকার ইবাদতে আল্লাহকে একক গণ্য করা। যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, যবেহ-কুরবানী, নযর-নিয়াজ, রুকূ-সিজদা, ভয়-ভীতি, আশা-ভরসা ইত্যাদি সকল কিছু আল্লাহ্র জন্যই হ'তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِيْنُ 'আমরা শুধুমাত্র আপনারই ইবাদত করি এবং আপনারই নিকট সাহায্য প্রার্থনা করি' *(ফাতেহা ৪)*। অতএব আমরা আমাদের প্রকৃত মা'বূদের নিকটেই সকল বিপদ-আপদ থেকে আশ্রয় চাইব। একমাত্র তাঁরই ইবাদত করব। মহান আল্লাহ আরো বলেন, وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَّسُوْلاً أَنِ اعْبُدُواْ اللهَ وَاجْتَنِبُواْ الطَّاغُوْتَ 'আমরা প্রত্যেক জাতির মধ্যেই রাসূল পাঠিয়েছি এই মর্মে যে, তোমরা আল্লাহ্র ইবাদত করবে এবং তাগূত হ'তে নিরাপদ থাকবে' *(নাহল ৩৬)*। অতএব শুধু আল্লাহ্রই ইবাদত করতে হবে, অন্য কারো নয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِن رَّسُوْلٍ إِلَّا نُوحِي إِلَيْهِ أَنَّهُ لاَ إِلَهَ إِلَّا أَنَا فَاعْبُدُوْنِ 'আমরা তোমার পূর্বে কোন রাসূল প্রেরণ করিনি এই অহী ব্যতীত যে, আমি ছাড়া অন্য কোন (হক্ব) মা'বূদ নেই। সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদত কর' *(আম্বিয়া ২৫)*। তিনি আরো বলেন, لَقَدْ أَرْسَلْنَا نُوحاً إِلَى قَوْمِهِ فَقَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ 'নূহকে তার কওমের নিকট পাঠিয়েছিলাম। সে বলল, হে আমার কওম! তোমরা শুধু আল্লাহ্র ইবাদত কর, তিনি ছাড়া তোমাদের আর কোন সত্য মা'বূদ নেই' *(আ'রাফ ৫৯)*। তিনি অন্যত্র বলেন, وَاعْبُدُواْ اللهَ وَلاَ تُشْرِكُواْ بِهِ شَيْئاً 'আর তোমরা আল্লাহ্রই ইবাদত কর এবং তাঁর সাথে কোন কিছুকে শরীক করো না' *(নিসা ৩৬)*। অন্যত্র আল্লাহ বলেন, وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُوْنِ 'আমি জিন ও মানুষকে কেবল মাত্র আমার ইবাদতের জন্যই সৃষ্টি করেছি' *(যারিয়াত ৫৬)*।

অতএব বুঝা যাচ্ছে যে, মহান আল্লাহ জিন ও মানুষকে শুধুমাত্র তাঁর ইবাদত করার জন্যই সৃষ্টি করেছেন। ইবাদতের মধ্যে শিরক মিশ্রিত হ'লে ইবাদত বাতিল হয়ে যায়, যেমন পবিত্রতার মধ্যে অপবিত্র মিশ্রিত হ'লে সেটি বাতিল বলে গণ্য হয়। আর শিরককারী চিরস্থায়ী জাহান্নামী হয়ে যায়। এজন্য শিরক থেকে বেঁচে থাকতে হবে। আল্লাহ বলেন, إِنَّ اللهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُوْنَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে অংশী স্থাপনকারীকে ক্ষমা করবেন না, তবে এতদ্ব্যতীত তিনি যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন' *(নিসা ১১৬)*। আল্লাহ আরো বলেন, إِنَّهُ مَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدْ حَرَّمَ اللّهُ عَلَيهِ الْجَنَّةَ 'নিশ্চয়ই যে ব্যক্তি আল্লাহ্র সাথে (অন্য কাউকে) শরীক করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাত হারাম করে দিবেন' *(মায়েদাহ ৭২)*। অতএব শুধু আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইবাদত করলে ঈমান বাড়বে। পক্ষান্তরে শিরক মিশ্রিত ইবাদত করলে ঈমানে ঘাটতি পড়বে।

(গ) তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাত : কুরআন ও হাদীছে আল্লাহ্র নাম ও ছিফাত (গুণাবলী) সমূহ যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করা এবং সেগুলোর প্রতি ঈমান আনা হচ্ছে তাওহীদে আসমা ওয়াছ ছিফাত। কোন পরিবর্তন-পরিবর্ধন না করে, অস্বীকার না করে, অবস্থা বর্ণনা না করে এবং কারো সাথে সাদৃশ্য প্রদান না করে আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলীর উপর ঈমান আনতে হবে।[৪৬] আল্লাহ তা'আলা বলেন, وَلِلّهِ الأَسْمَاء الْحُسْنَى فَادْعُوْهُ بِهَا وَذَرُواْ الَّذِيْنَ يُلْحِدُوْنَ فِيْ أَسْمَآئِهِ سَيُجْزَوْنَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُوْنَ 'আর আল্লাহ্র সুন্দর নাম সমূহ রয়েছে। সুতরাং তোমরা তাঁকে সেসব নামে ডাকো, আর তাদেরকে বর্জন করো যারা তাঁর নাম সমূহ বিকৃত করে, সত্বরই তাদেরকে তাদের কৃতকর্মের প্রতিফল দেওয়া হবে' *(আ'রাফ ১৮০)*। সুতরাং আল্লাহ্র নাম ও গুণাবলী যেভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করতে হবে। কারো সাথে তার সাদৃশ্য করা যাবে না। তিনি বলেন, لَيْسَ كَمِثْلِهِ شَيْءٌ وَهُوَ السَّمِيْعُ الْبَصِيْرُ 'কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা' *(শূরা ১১)*। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন, وَلاَ تَقْفُ مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٌ 'যে বিষয়ে তোমার কোন জ্ঞান নেই সে বিষয়ের পিছনে পড়ো না' *(বনী ইসরাঈল ৩৬)*। আয়াতটিতে আল্লাহ্র অবস্থা কেমন তা বর্ণনা করতে নিষেধ করা হয়েছে। কুরআন এবং ছহীহ হাদীছে যেভাবে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করতে বলা হয়েছে।[৪৭] মানব জীবনে তিন প্রকার তাওহীদ বাস্তবায়নের মাধ্যমে ঈমান মযবূত হবে ও ইহকাল-পরকাল সুখময় হবে।

আল্লাহ তা'আলার নামগুলো যেভাবে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে বর্ণিত হয়েছে ঠিক সেভাবেই বর্ণনা করতঃ অর্থ বুঝে মুখস্থ করে আমলের মাধ্যমে বাস্তবায়ন করলে ঈমান বাড়বে এবং জান্নাত লাভ করা যাবে ইনশাআল্লাহ। আবু হুরায়রা (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ তা'আলার এক কম একশটি অর্থাৎ নিরানব্বইটি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি এগুলো মুখস্থ করবে (অর্থ বুঝে আমল করবে) সে জান্নাতে প্রবেশ করবে'।[৪৮] অন্য বর্ণনায় এসেছে, 'আল্লাহ তা'আলার নিরানব্বইটি নাম রয়েছে, যে ব্যক্তি এগুলোর

৪৬. *ইবনু তায়মিয়া, শারহুল আক্বীদা আল-ওয়াসিতিয়্যাহ, পৃঃ ১৩।*
৪৭. *মুহাম্মাদ ছালেহ আল-ওছায়মীন, ফাৎহু রাব্বিল বারিয়্যাহ, পৃঃ ১৫।*
৪৮. *বুখারী হা/৭৩৯২, 'তাওহীদ' অধ্যায়।*

হিফাযত করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। আল্লাহ বেজোড়। তিনি বেজোড় পসন্দ করেন'।[৪৯] হাদীছটির ব্যাখ্যা হচ্ছে, যে ব্যক্তি আল্লাহ্র নিরানব্বইটি নাম হেফাযত করবে এবং মর্মার্থ বুঝে আমল করবে সে জান্নাতে প্রবেশ করবে।[৫০]

(২) ইবাদত কবুলের শর্তদ্বয় মানব জীবনে বাস্তবায়ন করা : ইবাদত কবুলের মৌলিক দু'টি শর্ত হ'ল- (ক) ইখলাছ বা আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য ইবাদত করা (খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা। এ দু'টি শর্তের প্রতি খেয়াল রেখে ইবাদত করলে তা আল্লাহ্র নিকট গ্রহণযোগ্য হবে এবং এতে ঈমানও বৃদ্ধি হবে। সকল প্রকার ইবাদত শুধুমাত্র আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্যই সম্পাদন করতে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا أُمِرُوْا إِلَّا لِيَعْبُدُوا اللهَ مُخْلِصِيْنَ لَهُ الدِّيْنَ حُنَفَاء وَيُقِيْمُوا الصَّلَاةَ وَيُؤْتُوا الزَّكَاةَ وَذَلِكَ دِيْنُ الْقَيِّمَةِ 'তারা তো আদিষ্ট হয়েছিল আল্লাহ্র আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁরই ইবাদত করতে এবং ছালাত কায়েম করতে ও যাকাত প্রদান করতে, এটাই সু-প্রতিষ্ঠিত সঠিক দ্বীন' *(বাইয়িনাহ ৫)*। মহান আল্লাহ তাঁর নবীকে বলেন, 'হে নবী! বল, আমি একমাত্র আল্লাহ্র জন্যই ইবাদত করি তাঁর প্রতি আমার আনুগত্যকে একনিষ্ঠ রেখে' *(যুমার ১৪)*। সকল প্রকার ইবাদত যেমন ছালাত, ছিয়াম, হজ্জ, যাকাত, যবেহ-কুরবানী, নযর-নিয়াজ, রুকূ-সিজদা, দো'আ-প্রার্থনা, ভয়-ভীতি, আশা-ভরসা শুধুমাত্র আল্লাহ্র জন্যই করতে হবে। কোন পীর, অলী-আওলিয়ার নামে বা মাযার-কবরের নিকট নয়। ইবাদত অন্যের জন্য করলেই শিরক হয়ে যাবে এবং পরকালীন জীবনে ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত হ'তে হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَلَقَدْ أُوْحِيَ إِلَيْكَ وَإِلَى الَّذِينَ مِنْ قَبْلِكَ لَئِنْ أَشْرَكْتَ لَيَحْبَطَنَّ عَمَلُكَ وَلَتَكُوْنَنَّ مِنَ الْخَاسِرِيْنَ 'নিশ্চয়ই তোমার প্রতি ও তোমার পূর্ববর্তীদের প্রতি এ মর্মে ওহী হয়েছে যে, যদি তুমি আল্লাহ্র সাথে অন্য কাউকে শরীক কর তবে নিঃসন্দেহে তোমার সকল আমল বাতিল হয়ে যাবে এবং অবশ্যই তুমি ক্ষতিগ্রস্ত দের অন্তর্ভুক্ত হবে' *(যুমার ৬৫)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, فَمَنْ كَانَ يَرْجُو لِقَاء رَبِّهِ فَلْيَعْمَلْ عَمَلاً صَالِحاً وَلَا يُشْرِكْ بِعِبَادَةِ رَبِّهِ أَحَداً 'সুতরাং যে তার প্রতিপালকের সাক্ষাৎ কামনা করে সে যেন সৎকর্ম করে ও তার প্রতিপালকের ইবাদতে অন্য কাউকে শরীক না করে' *(কাহফ ১১০)*।

প্রতিটি কাজের জন্য সর্বপ্রথম নিয়ত ঠিক করতে হবে এবং সর্বপ্রকার ইবাদত আল্লাহ্র সন্তুষ্টির জন্য করতে হবে।

মহান আল্লাহ বলেন, 'যারা সৎ আমল করেছে তাদের জন্য সর্বোৎকৃষ্ট বস্তু (জান্নাত) রয়েছে এবং আরো রয়েছে অতিরিক্ত উৎকৃষ্ট জিনিস (আল্লাহ্র সাক্ষাৎ) *(ইউনুস ২৬)*। তিনি আরো বলেন, وَعَدَ اللهُ الْمُؤْمِنِيْنَ وَالْمُؤْمِنَاتِ جَنَّاتٍ تَجْرِيْ مِنْ تَحْتِهَا الأَنْهَارُ خَالِدِيْنَ فِيْهَا وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِيْ جَنَّاتِ عَدْنٍ وَرِضْوَانٌ مِّنَ اللهِ أَكْبَرُ ذَلِكَ هُوَ الْفَوْزُ الْعَظِيْمُ 'আল্লাহ তা'আলা মুমিন পুরুষ ও মুমিন নারীদেরকে এমন জান্নাত সমূহের ওয়াদা করেছেন যার পাদদেশে নহর সমূহ প্রবাহিত রয়েছে। সেখানে তারা অনন্তকাল বসবাস করবে। আরও (ওয়াদা করেছেন) ঐ উত্তম বাসস্থান সমূহের, যা আদন নামক জান্নাতের মাঝে অবস্থিত। আর আল্লাহ্র সন্তুষ্টি হচ্ছে সর্বাপেক্ষা বড়। এটা হচ্ছে অতি বড় সফলতা' *(তওবা ৭২)*।

অতএব পরকালে সুখময় স্থান লাভ করার জন্য সকল সৎকর্ম আল্লাহ্র সন্তুষ্টির লক্ষ্যে করতে হবে এবং নিয়ত খালেছ করতে হবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'সকল কাজ নিয়তের উপর নির্ভরশীল। আর মানুষ তার নিয়ত অনুযায়ী প্রতিফল পাবে। তাই যার হিজরত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের দিকে হবে, তার হিজরত আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উদ্দেশ্যেই গন্য হবে। আর যার হিজরত হবে ইহকাল লাভের জন্য অথবা কোন মহিলাকে বিবাহ করার উদ্দেশ্যে, তার হিজরত সে উদ্দেশ্যেই গণ্য হবে, যে জন্য সে হিজরত করেছে'।[৫১]

ওমর বিন খাত্ত্বাব (রাঃ) তাঁর দো'আয় বলতেন, 'হে আল্লাহ! আমার সকল আমল কবুল কর (রাসূলের সুন্নাত অনুযায়ী করার তাওফীক দাও), সেটি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টির জন্য করার তাওফীক দাও এবং সেটি যেন কারো উদ্দেশ্যে না হয়।

ফুযাইল বিন ইয়ায বলেন, আমল হ'তে হবে ইখলাছের সাথে ও সঠিক পদ্ধতিতে। বলা হ'ল হে আবু আলী! ইখলাছ ও সঠিক পদ্ধতিটা কি? তিনি বললেন, আমলটি যদি খালেছ হয়, সঠিক পদ্ধতিতে না হয় তাহ'লে কবুল হবে না। আর যদি সেটি সঠিক পদ্ধতিতে হয় কিন্তু খালেছ নিয়তে না হয়, তাহ'লেও কবুল হবে না, যতক্ষণ পর্যন্ত খালেছ নিয়তে ও সঠিক পদ্ধতিতে না হবে। আর খালেছ নিয়ত হ'ল শুধুমাত্র আল্লাহ্র উদ্দেশ্যে ইবাদত করা ও সঠিক পদ্ধতি হ'ল রাসূল (ছাঃ)-এর ছহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী করা।[৫২]

(খ) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর অনুসরণ করা : আল্লাহ তা'আলা বলেন, قُلْ إِنْ كُنتُمْ تُحِبُّونَ اللهَ فَاتَّبِعُوْنِي يُحْبِبْكُمُ اللهُ وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوْبَكُمْ وَاللهُ غَفُوْرٌ رَّحِيْمٌ 'হে নবী! বল, যদি তোমরা আল্লাহ্র ভালবাসা পেতে চাও, তবে আমার অনুসরণ কর, তাহ'লে আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন ও তোমাদের অপরাধ সমূহ মার্জনা করে দিবেন, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম করুণাময়' *(আলে ইমরান ৩১)*।

রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমাদেরকে যা দিয়েছেন তার অনুসরণ করতে হবে আর যা থেকে নিষেধ করেছেন তা বর্জন করতে

৪৯. *বুখারী হা/৬৪১০ 'দু'আসমূহ' অধ্যায়।*
৫০. *ইবনে তায়মিয়া, মাজমূউ ফাতাওয়া, ৬/৩৮০-৩৮১; মুহাম্মাদ ছালেহ আল-উছায়মীন, আল-কাওয়ায়েদুল মুছলা, পৃঃ ১৫।*
৫১. *বুখারী হা/১; মুসলিম হা/৪৯২৭, 'জিহাদ' অধ্যায়।*
৫২. *ইবনে তায়মিয়াহ, শারহু রিসালাহ তাদামুরিয়্যাহ (দারু কুনূয ইশবিলিয়া, প্রথম সংস্করণ ১৪২৫ হিঃ), পৃঃ ৫৩৫।*

হবে। মহান আল্লাহ বলেন, وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُوْلُ فَخُذُوْهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوْا وَاتَّقُوْا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيْدُ الْعِقَابِ 'রাসূল তোমাদেরকে যা দিয়েছেন তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা থেকে নিষেধ করেছেন তা হ'তে বিরত থাকো, আর আল্লাহকে ভয় কর, নিশ্চয়ই আল্লাহর শাস্তি খুবই কঠিন' *(হাশর ৭)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে কেউ এমন কোন আমল করল, যে ব্যাপারে আমাদের অনুমোদন নেই তা প্রত্যাখ্যাত'।[৫৩] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আরো বলেন, 'যে ব্যক্তি আমাদের শরী'আতে নেই এমন কিছু নতুন সৃষ্টি করল, তা প্রত্যাখ্যাত'।[৫৪]

ইবাদত কবুলের দু'টি শর্তের সাথে আরেকটি শর্ত : আমলটি বিশুদ্ধ আক্বীদার ভিত্তিতে সম্পন্ন হ'তে হবে, নচেৎ তা কবুল হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, مَنْ عَمِلَ صَالِحاً مِّن ذَكَرٍ أَوْ أُنثَى وَهُوَ مُؤْمِنٌ فَلَنُحْيِيَنَّهُ حَيَاةً طَيِّبَةً وَلَنَجْزِيَنَّهُمْ أَجْرَهُم بِأَحْسَنِ مَا كَانُوْا يَعْمَلُونَ 'মুমিন পুরুষ ও নারীর মধ্যে যে কেউ সৎ কর্ম করবে, তাকে আমরা নিশ্চয়ই আনন্দময় জীবন দান করব এবং তাদেরকে তাদের কর্মের শ্রেষ্ঠ পুরস্কার প্রদান করব' *(নাহল ৯৭)*। আয়াতটিতে শর্তযুক্ত হয়েছে যে, আমল কবুলের জন্য বিশুদ্ধ আক্বীদায় বিশ্বাসী হ'তে হবে এবং মুমিন হ'তে হবে। কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী আমল করলে আল্লাহর নিকট কশ্মিনকালেও তা কবুল হবে না। মহান আল্লাহ বলেন, وَقَدِمْنَا إِلَى مَا عَمِلُوْا مِنْ عَمَلٍ فَجَعَلْنَاهُ هَبَاءً مَّنْثُوْراً 'আমরা তাদের কৃতকর্মগুলোর দিকে অগ্রসর হব, অতঃপর সেগুলিকে বিক্ষিপ্ত ধূলিকণায় পরিণত করব' *(ফুরক্বান ২৩)*। ক্বিয়ামতের দিন মহান আল্লাহ বান্দার ভাল-মন্দের বিচার করবেন। ঐ সময় মুশরিকরা তাদের আমল থেকে কোন ফায়দা পাবে না এবং সেগুলো তাদেরকে নাজাত দিতে পারবে না। কেননা তাদের আমল শরী'আত অনুযায়ী হয়নি এবং তা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য করা হয়নি। সুতরাং সেটা বাতিল হবে।[৫৫] মহান আল্লাহ বলেন, أُوْلَـئِكَ الَّذِيْنَ لَيْسَ لَهُمْ فِي الآخِرَةِ إِلاَّ النَّارُ وَحَبِطَ مَا صَنَعُوْا فِيْهَا وَبَاطِلٌ مَّا كَانُوْا يَعْمَلُوْنَ 'তারা এমন লোক যে, তাদের জন্য আখেরাতে জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই নেই। আর তারা যা কিছু করেছিল তাও বিফল হবে এবং তারা যা করে তা বাতিল হবে' *(হূদ ১৬)*। অন্যত্র তিনি বলেন, وَالَّذِيْنَ كَفَرُوْا أَعْمَالُهُمْ كَسَرَابٍ بِقِيْعَةٍ يَحْسَبُهُ الظَّمْآنُ مَاءً حَتَّى إِذَا جَاءَهُ لَمْ يَجِدْهُ شَيْئاً وَوَجَدَ اللهَ عِنْدَهُ فَوَفَّاهُ حِسَابَهُ وَاللهُ سَرِيْعُ الْحِسَابِ 'যারা কুফরী করে তাদের কর্ম মরুভূমির মরীচিকা সদৃশ, পিপাসার্ত যাকে পানি মনে করে থাকে; কিন্তু সে ওর নিকট উপস্থিত হ'লে দেখবে ওটা কিছু নয় এবং সে তার নিকট পাবে আল্লাহকে। অতঃপর তিনি তার কর্মফল পূর্ণ মাত্রায় দিবেন। আল্লাহ হিসাব গ্রহণে তৎপর' *(নূর ৩৯)*। তিনি আরো বলেন, مَّثَلُ الَّذِيْنَ كَفَرُوْا بِرَبِّهِمْ أَعْمَالُهُمْ كَرَمَادٍ اشْتَدَّتْ بِهِ الرِّيْحُ فِيْ يَوْمٍ عَاصِفٍ لاَّ يَقْدِرُوْنَ مِمَّا كَسَبُوْا عَلَى شَيْءٍ ذَلِكَ هُوَ الضَّلاَلُ الْبَعِيْدُ 'যারা তাদের প্রতিপালককে অস্বীকার করে তাদের উপমা তাদের কর্মসমূহ ভস্ম সদৃশ যা ঝড়ের দিনে বাতাস প্রচণ্ড বেগে উড়িয়ে নিয়ে যায়; যা তারা উপার্জন করে তার কিছুই তারা তাদের কাজে লাগাতে পারে না; এটা তো ঘোর বিভ্রান্তি' *(ইবরাহীম ১৮)*।

(৩) কল্যাণকর ইলম শিক্ষা করা : মানুষ যখন শরী'আতের জ্ঞান অর্জন করবে, কুরআন ও ছহীহ সুন্নাহর জ্ঞানার্জন করে নিজের ব্যক্তিগত জীবনে, পারিবারিক জীবনে, রাষ্ট্রীয় জীবনে বাস্তবায়ন করবে তখনই তার ঈমান বাড়বে। এটি ঈমান বৃদ্ধির অন্যতম উপায়। মহান আল্লাহ বলেন, شَهِدَ اللهُ أَنَّهُ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ وَالْمَلاَئِكَةُ وَأُوْلُوْا الْعِلْمِ قَآئِمَاً بِالْقِسْطِ لاَ إِلَـهَ إِلاَّ هُوَ الْعَزِيْزُ الْحَكِيْمُ 'আল্লাহ সাক্ষ্য প্রদান করেন যে, নিশ্চয়ই তিনি ব্যতীত সত্য কোন মা'বূদ নেই এবং ফেরেশতাগণ, ন্যায়নিষ্ঠ বিদ্বানগণও (সাক্ষ্য প্রদান করেন) তিনি ব্যতীত অন্য কোন সত্য মা'বূদ নেই, তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়' *(আলে ইমরান ১৮)*। মহান আল্লাহ আরো বলেন, لَّـكِنِ الرَّاسِخُوْنَ فِيْ الْعِلْمِ مِنْهُمْ وَالْمُؤْمِنُوْنَ يُؤْمِنُوْنَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيكَ وَمَا أُنزِلَ مِنْ قَبْلِكَ وَالْمُقِيْمِيْنَ الصَّلاَةَ وَالْمُؤْتُوْنَ الزَّكَاةَ وَالْمُؤْمِنُوْنَ بِاللهِ وَالْيَوْمِ الآخِرِ أُوْلَـئِكَ سَنُؤْتِيْهِمْ أَجْراً عَظِيْماً 'কিন্তু তাদের মধ্যে যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বাসীগণের মধ্যে যারা তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে এবং তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল তৎপ্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং যারা ছালাত প্রতিষ্ঠাকারী ও যাকাত প্রদানকারী এবং আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস স্থাপনকারী, তাদেরকেই আমি মহা পুরস্কার দেব' *(নিসা ১৬২)*। কুরআন-সুন্নাহর জ্ঞানার্জন করে আল্লাহর ইবাদতের মাধ্যমে ঈমান বাড়ে। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ آمِنُوْا بِهِ أَوْ لاَ تُؤْمِنُوْا إِنَّ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ مِن قَبْلِهِ إِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ يَخِرُّوْنَ لِلأَذْقَانِ سُجَّداً، وَيَقُوْلُوْنَ سُبْحَانَ رَبِّنَا إِن كَانَ وَعْدُ رَبِّنَا لَمَفْعُوْلاً، وَيَخِرُّوْنَ لِلأَذْقَانِ يَبْكُوْنَ وَيَزِيْدُهُمْ خُشُوْعاً– 'তুমি বল, তোমরা কুরআনে বিশ্বাস কর অথবা বিশ্বাস না কর, যাদেরকে এর পূর্বে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তাদের নিকট যখন এটা পাঠ করা হয় তখনই তারা সিজদায় লুটিয়ে পড়ে এবং বলে, আমাদের প্রতিপালক পবিত্র। আমাদের প্রতিপালকের

---

৫৩. *মুসলিম হা/৪৪৯৩, 'বিচার-ফায়ছালা' অধ্যায়।*
৫৪. *মুসলিম হা/৪৪৯২।*
৫৫. *তাফসীর ইবনে কাছীর ৬/১১৪।*

প্রতিশ্রুতি কার্যকরী হয়েই থাকে। আর তারা কাঁদতে কাঁদতে ভূমিতে লুটিয়ে পড়ে এবং তাদের বিনয় বৃদ্ধি করে' *(বানী ইসরাঈল ১০৭-১০৯)*।

বিদ্বানগণ কুরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানার্জন করে নিজেরা তদনুযায়ী আমল করেন এবং অন্যদের নিকট প্রচার করে থাকেন। এতে একে অপরের ঈমান বাড়ে এবং ইহকালীন কল্যাণ ও পরকালীন মুক্তি নিশ্চিত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَلِيَعْلَمَ الَّذِيْنَ أُوْتُوْا الْعِلْمَ أَنَّهُ الْحَقُّ مِن رَّبِّكَ فَيُؤْمِنُوْا بِهِ فَتُخْبِتَ لَهُ قُلُوْبُهُمْ وَإِنَّ اللهَ لَهَادِ الَّذِيْنَ آمَنُوْا إِلَى صِرَاطٍ مُّسْتَقِيْمٍ 'আর এজন্যও যে, যাদের জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা যেন জানতে পারে যে, এটা তোমার প্রতিপালকের নিকট হ'তে প্রেরিত সত্য। অতঃপর তারা যেন বিশ্বাস স্থাপন করে এবং তাদের অন্তর যেন ওর প্রতি অনুগত হয়। যারা ঈমান এনেছে তাদেরকে আল্লাহ সরল পথে পরিচালিত করেন' *(হজ্জ ৫৪)*। মানুষ কুরআন-সুন্নাহ্র জ্ঞানার্জন দ্বারাই সঠিক পথ প্রাপ্ত হয়। মহান আল্লাহ বলেন, وَيَرَى الَّذِيْنَ أُوتُوا الْعِلْمَ الَّذِيْ أُنْزِلَ إِلَيْكَ مِنْ رَّبِّكَ هُوَ الْحَقَّ وَيَهْدِيْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيْزِ الْحَمِيْدِ 'যাদেরকে জ্ঞান দেয়া হয়েছে তারা বিশ্বাস করে যে, তোমার প্রতিপালকের নিকট হ'তে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা সত্য। এটা মানুষকে পরাক্রমশালী ও মহা প্রশংসিত আল্লাহ্র পথ নির্দেশ করে' *(সাবা ৬)*। মহান আল্লাহ বলেন, إِنَّمَا يَخْشَى اللَّهَ مِنْ عِبَادِهِ الْعُلَمَاءُ إِنَّ اللَّهَ عَزِيزٌ غَفُورٌ 'নিশ্চয়ই আল্লাহ্র বান্দাদের মধ্য যারা আলেম তারা তাঁকে ভয় করে। আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল' *(ফাতির ২৮)*।

কল্যাণকর ইলম শিক্ষার মাধ্যমে সমাজ থেকে অন্ধকার দূর করা এবং ঈমান বৃদ্ধি করা সম্ভব। মহান আল্লাহ বলেন, قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِيْنَ يَعْلَمُوْنَ وَالَّذِيْنَ لَا يَعْلَمُوْنَ إِنَّمَا يَتَذَكَّرُ أُوْلُوْا الْأَلْبَابِ 'বল, যারা জানে আর যারা জানে না তারা কি সমান? বোধশক্তিসম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে' *(যুমার ৯)*। অতএব কুরআন-সুন্নাহ্র ইলম অর্জন করা ফরয। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'প্রত্যেক মুসলমানের উপর (শরী'আতের) জ্ঞান অন্বেষণ করা ফরয'।[৫৬] রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'আল্লাহ যার কল্যাণ চান, তাকেই দ্বীনের ইলম দান করেন'।[৫৭] ইলম শিক্ষা করলে জান্নাতে যাবার পথ সহজ হয়ে যায়। আর যে ব্যক্তি ইলম শিক্ষার জন্য পথ চলে, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জান্নাতের পথ সুগম করে দেন।[৫৮] ইলম অর্জনের মাধ্যমে নবীগণের উত্তরাধিকারী হওয়া যায়। নবী করীম (ছাঃ) বলেন, 'আলেমগণই হ'লেন নবীগণের উত্তরাধিকারী। নবীগণ দীনার বা দিরহামের উত্তরাধিকারী করেন না। নিশ্চয়ই তাঁরা ইলমের উত্তরাধিকারী করেন। সুতরাং যে ব্যক্তি তা গ্রহণ করল, সে বৃহদাংশ গ্রহণ করল'।[৫৯] ইলম অর্জন করে অপরকে শিক্ষা দিলে, সে অনুযায়ী আমলকারী যে নেকী পাবে, শিক্ষাদাতাও অনুরূপ নেকী পাবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, যে ব্যক্তি দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিবে সে ঐ ব্যক্তির ন্যায় ছওয়াব পাবে, যে তার উপর আমল করল। কিন্তু আমলকারীর ছওয়াব থেকে একটুকুও কমানো হবে না'।[৬০]

কল্যাণকর জ্ঞান অর্জনকারীর উপর আল্লাহ রহম করেন। আর ফেরেশতাগণ, আসমান-যমীনের অধিবাসীগণ, পিপীলিকা এমনকি সমুদ্রের মাছও তার জন্য দো'আ করতে থাকে। আবু উমামা বাহেলী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর সামনে দু'জন লোকের কথা উল্লেখ করা হ'ল। তাদের একজন আলেম, অপর জন আবেদ। তখন তিনি বলেন, আলেমের মর্যাদা আবেদের উপর ঐরূপ, যেরূপ আমার মর্যাদা তোমাদের সাধারণের উপর। তারপর রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ রহমত করেন এবং তাঁর ফেরেশতামণ্ডলী, আসমান-যমীনের অধিবাসী এমনকি পিপীলিকা তার গর্তে থেকে এবং মাছও কল্যাণের শিক্ষা দানকারীর জন্য দো'আ করে'।[৬১] দ্বীনী ইলম শিক্ষা দিয়ে গেলে মৃত্যুর পরেও তার ছওয়াব পাওয়া যায়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যখন মানুষ মৃত্যুবরণ করে তখন তিনটি ব্যতীত তার সব আমল বন্ধ হয়ে যায়। ঐ তিনটি আমল হ'ল প্রবাহমান দান-ছাদাক্বা, এমন ইলম যার দ্বারা উপকৃত হওয়া যায় এবং এমন নেক সন্তান যে তার জন্য দো'আ করে'।[৬২]

অতএব ঈমান বাড়াতে হ'লে ও ইহলোক-পারলোক সুখময় জীবন-যাপন করতে হ'লে সবার উপর আবশ্যক হবে সন্তান-সন্ততিক ছোট থেকেই দ্বীনের সঠিক জ্ঞান শিক্ষা দেওয়া। দ্বীনী ইলম শিক্ষা লাভ না করলে পৃথিবী অজ্ঞতার অন্ধকারে নিমজ্জিত হবে। ফলে মানুষ দ্বীনী বিষয়ে অজ্ঞদের নিকট থেকে ফৎওয়া নিয়ে গোমরাহ হবে। আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনুল আছ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, আমি আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আল্লাহ তাঁর বান্দাদের থেকে ইলম ছিনিয়ে নেন না। বরং দ্বীনের আলেমদের উঠিয়ে নেয়ার মাধ্যমে ইলমকে উঠিয়ে নিবেন। তখন কোন আলেম অবশিষ্ট থাকবে না। ফলে লোকেরা মূর্খদেরকেই নেতা বানিয়ে নিবে, তাদের জিজ্ঞেস করা হ'লে তারা না জেনে ফৎওয়া প্রদান করবে, এতে তারা নিজেরাও পথভ্রষ্ট হবে এবং অন্যদেরকেও পথভ্রষ্ট করবে'।[৬৩]

[চলবে]

৫৬. *ইবনু মাজাহ হা/২২৪ সনদ ছহীহ।*
৫৭. *বুখারী হা/৭১।*
৫৮. *বুখারী 'ইলম' অধ্যায়, পৃঃ ১৬।*
৫৯. *আবু দাঊদ হা/৩১৫৭; ইবনু মাজাহ হা/২২৩; তিরমিযী হা/২৬০৬; সনদ ছহীহ।*
৬০. *ইবনু মাজাহ হা/২৪০, সনদ হাসান।*
৬১. *ছহীহ তারগীব হা/৭৭; মিশকাত হা/২১৩; ইবনু মাজাহ হা/২২৩, সনদ ছহীহ।*
৬২. *মুসলিম হা/১৬৩১।*
৬৩. *বুখারী হা/১০০; মুসলিম হা/২৬৭৩।*

Contents

কুরবানীর মাসায়েল

আত-তাহরীক ডেস্ক

(১) চুল-নখ না কাটা : উম্মে সালামাহ (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমাদের মধ্যে যারা কুরবানী দেওয়ার এরাদা রাখে, তারা যেন যিলহজ্জ মাসের চাঁদ ওঠার পর হ'তে কুরবানী সম্পন্ন করা পর্যন্ত স্ব স্ব চুল ও নখ কর্তন করা হ'তে বিরত থাকে'।[৬৪]

(২) কুরবানীর পশু : এটা তিন প্রকার- উট, গরু ও ছাগল। দুম্বা ও ভেড়া ছাগলের মধ্যে গণ্য। প্রত্যেকটির নর ও মাদি। এগুলির বাইরে অন্য পশু দিয়ে কুরবানী করার প্রমাণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ও ছাহাবায়ে কেরাম থেকে পাওয়া যায় না। তবে অনেক বিদ্বান গরুর উপরে ক্বিয়াস করে মহিষ দ্বারা কুরবানী জায়েয বলেছেন।[৬৫] ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, 'উপরে বর্ণিত পশুগুলি ব্যতীত অন্য কোন পশু দ্বারা কুরবানী সিদ্ধ হবে না'।[৬৬] কুরবানীর পশু সুঠাম, সুন্দর ও নিখুঁত হ'তে হবে। চার ধরনের পশু কুরবানী করা নাজায়েয। যথা- স্পষ্ট খোঁড়া, স্পষ্ট কানা, স্পষ্ট রোগী ও জীর্ণশীর্ণ এবং অর্ধেক কান কাটা বা ছিদ্র করা ও অর্ধেক শিং ভাঙ্গা।[৬৭] তবে নিখুঁত পশু ক্রয়ের পর যদি নতুন করে খুঁৎ হয় বা পুরানো কোন দোষ বেরিয়ে আসে, তাহ'লে ঐ পশু দ্বারাই কুরবানী বৈধ হবে'।[৬৮]

বিষাক্ত ইনজেকশন দিয়ে ও ট্যাবলেট বা খাবার খাইয়ে মোটাতাজা করা পশু দেখতে যত সুন্দরই হৌক, জেনেশুনে তা কিনলে তাতে কুরবানী হবে না। পরে জানলেও তা বাদ দেওয়া উচিৎ। কেননা ঐসব বিষাক্ত পশুর গোশত ফরমালিনের মত মানুষকে নীরবে হত্যা করে। এতে মানুষ লিভার, কিডনী, ক্যান্সার ও হৃদরোগসহ নানাবিধ জটিল রোগে আক্রান্ত হয়। এইসব গরুর হাড়ের ভিতরকার মজ্জা সবচেয়ে বেশী ক্ষতিকর। পশুর দেহ বিষাক্ত করার পর বাকী বিষের সবটুকু মজ্জায় গিয়ে জমা হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা ক্ষতি করো না ও ক্ষতিগ্রস্ত হয়ো না' *(আবুদাঊদ)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি প্রতারণা করে, সে আমাদের দলভুক্ত নয় *(মুসলিম)*। উল্লেখ্য যে, খাসি করা কোন খুঁৎ নয় এবং খাসি কুরবানীতে শরী'আতে কোন বাধা নেই। রাসূল (ছাঃ) নিজে খাসি কুরবানী করেছেন।[৬৯]

(৩) 'মুসিন্নাহ' দ্বারা কুরবানী : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'তোমরা দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত ওঠা (মুসিন্নাহ) পশু ব্যতীত যবহ করো না। তবে কষ্টকর হ'লে এক বছর পূর্ণকারী ভেড়া (দুম্বা বা ছাগল) কুরবানী করতে পার'।[৭০] জমহূর বিদ্বানগণ অন্যান্য হাদীছের আলোকে এই হাদীছে নির্দেশিত 'মুসিন্নাহ' পশুকে কুরবানীর জন্য 'উত্তম' হিসাবে গণ্য করেছেন।[৭১] 'মুসিন্নাহ' পশু ষষ্ঠ বছরে পদার্পণকারী উট এবং তৃতীয় বছরে পদার্পণকারী গরু বা ছাগল-ভেড়া-দুম্বাকে বলা হয়।[৭২] কেননা এই বয়সে সাধারণতঃ এই সব পশুর দুধের দাঁত ভেঙ্গে নতুন দাঁত উঠে থাকে। তবে অনেক পশুর বয়স বেশী ও হৃষ্টপুষ্ট হওয়া সত্ত্বেও সঠিক সময়ে দাঁত ওঠে না। এসব পশু দ্বারা কুরবানী করা ইনশাআল্লাহ কোন দোষের হবে না।

(৪) নিজের ও নিজ পরিবারের পক্ষ হ'তে একটি পশু :

(ক) মা আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) একটি শিংওয়ালা সুন্দর সাদা-কালো দুম্বা আনতে বললেন, ...অতঃপর নিম্নোক্ত দো'আ পড়লেন, بِسْمِ اللهِ أَللَّهُمَّ تَقَبَّلْ مِنْ مُحَمَّدٍ وَّآلِ مُحَمَّدٍ وَّمِنْ أُمَّـــةِ مُحَمَّـــدٍ– 'আল্লাহ্র নামে (কুরবানী করছি), হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর মুহাম্মাদের পক্ষ হ'তে, তার পরিবারের পক্ষ হ'তে ও তার উম্মতের পক্ষ হ'তে'। এরপর উক্ত দুম্বা দ্বারা কুরবানী করলেন'।[৭৩]

(খ) বিদায় হজ্জে আরাফার দিনে সমবেত জনমণ্ডলীকে উদ্দেশ্য করে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, يَآ أَيُّهَا النَّاسُ إِنَّ عَلَى كُلِّ أَهْلِ بَيْتٍ فِىْ كُلِّ عَامٍ أُضْحِيَةً وَ عَتِيْرَةً... 'হে জনগণ! নিশ্চয়ই প্রত্যেক পরিবারের উপরে প্রতি বছর একটি করে কুরবানী ও আতীরাহ'। আবুদাঊদ (রহঃ) বলেন, 'আতীরাহ' প্রদানের হুকুম পরে রহিত করা হয়।[৭৪] আবু আইয়ুব আনছারী (রাঃ) বলেন, ছাহাবায়ে কেরামের মধ্যে পরিবারপিছু একটি করে বকরী কুরবানীর রেওয়াজ দিল *(তিরমিযী হা/১৫০৫)*। ধনাঢ্য ছাহাবী আবু সারীহা (রাঃ) বলেন, সুন্নাত জানার পর লোকেরা পরিবারপিছু একটি বা দু'টি করে বকরী কুরবানী দিত। অথচ এখন প্রতিবেশীরা আমাদের বখীল বলছে' *(ইবনু মাজাহ হা/৩১৪৮)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মদীনায় মুক্বীম অবস্থায় নিজ পরিবার ও উম্মতের পক্ষ হতে দু'টি করে 'খাসি' এবং হজ্জের সফরে গরু ও উট কুরবানী করেছেন *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৫৩)*। অতএব একান্নবর্তী পরিবারের সদস্য সংখ্যা যত বেশীই হৌক না কেন সকলের পক্ষ থেকে একটি পশুই যথেষ্ট। এক পিতার সন্তান হ'লেও পৃথকান্ন হ'লে তারা পৃথক পরিবার হিসাবে গণ্য হবেন। তবে তারা পৃথক কুরবানীর জন্য পিতাকে অর্থ সাহায্য করতে পারেন। উল্লেখ্য যে, সাত ভাগা কুরবানীর হাদীছ সফরের সাথে সংশ্লিষ্ট, মুক্বীম অবস্থায় এটি প্রযোজ্য নয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বা ছাহাবায়ে কেরাম মুক্বীম অবস্থায় কখনো সাত ভাগা কুরবানী করেননি। অনেকে ৩ বা ৫ ভাগে কুরবানী করেন, যা আদৌ শরী'আতসম্মত নয়।

(৫) 'কুরবানী ও আক্বীক্বা দু'টিরই উদ্দেশ্য আল্লাহ্র নৈকট্য হাছিল করা' এই (ইসতিহসানের) যুক্তি দেখিয়ে কোন কোন হানাফী বিদ্বান কুরবানীর গরু বা উটে এক বা একাধিক সন্তানের আক্বীক্বা সিদ্ধ বলে মত প্রকাশ করেছেন (যা এদেশে অনেকের মধ্যে চালু আছে)।[৭৫] হানাফী মাযহাবের স্তম্ভ বলে খ্যাত ইমাম আবু ইউসুফ (রহঃ) এই মতের বিরোধিতা করেন। ইমাম শাওকানী

---

৬৪. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৯; নাসাঈ, মির'আত হা/১৪৭৪-এর ব্যাখ্যা, ৫/৮৬।*
৬৫. *আন'আম ১৪৪-৪৫; মির'আত ৫/৮১ পৃঃ।*
৬৬. *কিতাবুল উম্ম (বৈরূত : ছাপাঃ তারিখ বিহীন) ২/২২৩ পৃঃ।*
৬৭. *মুওয়াত্ত্বা, তিরমিযী প্রভৃতি মিশকাত হা/১৪৬৫, ১৪৬৩, ১৪৬৪; ফিক্বহুস সুন্নাহ (কায়রো ছাপাঃ ১৪১২/১৯৯২) ২/৩০ পৃঃ।*
৬৮. ***মির'আত ৫/৯৯ পৃঃ।***
৬৯. *ইবনু মাজাহ হা/৩১২২, ইরওয়া হা/১১৩৮, সনদ ছহীহ।*
৭০. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৫; নাসাঈ তা'লীক্বাত সহ (লাহোর ছাপাঃ তারিখ বিহীন), ২/১৯৬ পৃঃ।*
৭১. *মির'আত (লাক্ষ্ণৌ) ২/৩৫৩ পৃঃ; ঐ, (বেনারস) ৫/৮০ পৃঃ।*
৭২. *মির'আত, ২/৩৫২ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৮-৭৯ পৃঃ।*
৭৩. *মুসলিম, মিশকাত হা/১৪৫৪।*
৭৪. *তিরমিযী প্রভৃতি, মিশকাত হা/১৪৭৮। হাদীছটির সনদ 'শক্তিশালী' ইবনু হাজার, ফাৎহুল বারী ১০/৬ পৃঃ; সনদ 'হাসান' আলবানী, ছহীহ নাসাঈ (বৈরূত : ১৯৮৮), হা/৩৯৪০।*
৭৫. *বুরহানুদ্দীন মারগীনানী, হেদায়া (দিল্লী : ১৩৫৮ হিঃ) 'কুরবানী' অধ্যায় ৪/৪৩৩; আশরাফ আলী থানভী, বেহেশতী জেওর (ঢাকা : এমদাদিয়া লাইব্রেরী, ১০ম মুদ্রণ ১৯৯০) 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ১/৩০০ পৃঃ।*

(রহঃ) এর ঘোর প্রতিবাদ করে বলেন, এটি শরী'আত, এখানে সুনির্দিষ্ট দলীল ব্যতীত কিছুই প্রমাণ করা সম্ভব নয়।[৭৬]

(৬) কুরবানী করার পদ্ধতি : (ক) উট দাঁড়ানো অবস্থায় এর 'হলকূম' বা কণ্ঠনালীর গোড়ায় কুরবানীর নিয়তে 'বিসমিল্লা-হি আল্লাহু আকবার' বলে অস্ত্রাঘাতের মাধ্যমে রক্ত প্রবাহিত করে 'নহর' করতে হয় এবং গরু বা ছাগলের মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে 'যবহ' করতে হয়।[৭৭] কুরবানী দাতা ধারালো ছুরি নিয়ে ক্বিবলামুখী হয়ে দো'আ পড়ে নিজ হাতে খুব জলদি যবহের কাজ সমাধা করবেন, যেন পশুর কষ্ট কম হয়। এ সময় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজের ডান পা দিয়ে পশুর ঘাড় চেপে ধরতেন। যবহকারী বাম হাত দ্বারা পশুর চোয়াল চেপে ধরতে পারেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) নিজ হাতে যবহ করেছেন। অন্যের দ্বারা যবহ করানো জায়েয আছে। তবে এই গুরুত্বপূর্ণ ইবাদতটি নিজ হাতে করা অথবা যবহের সময় স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা উত্তম। ১০, ১১, ১২ যিলহাজ্জ তিন দিনের রাত-দিন যে কোন সময় কুরবানী করা যাবে।[৭৮] অনেক ছাহাবী ও বিদ্বানগণ ১৩ তারিখেও জায়েয বলেছেন।[৭৯]

(৭) যবহকালীন দো'আ : **(১)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হু আকবার (অর্থ: আল্লাহ্‌র নামে, আল্লাহ সর্বোচ্চ) **(২)** বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন্নী ওয়া মিন আহলে বায়তী (আল্লাহ্‌র নামে, হে আল্লাহ! তুমি কবুল কর আমার ও আমার পরিবারের পক্ষ হ'তে)।

এখানে কুরবানী অন্যের হ'লে তার নাম মুখে বলবেন অথবা মনে মনে নিয়ত করে বলবেন, 'বিসমিল্লা-হি আল্লা-হুম্মা তাক্বাব্বাল মিন ফুলান ওয়া মিন আহলে বায়তিহী' (...অমুকের ও তার পরিবারের পক্ষ হ'তে)। এই সময় দরূদ পাঠ করা মাকরূহ'।[৮০] (৩) যদি দো'আ ভুলে যান বা ভুল হবার ভয় থাকে, তবে শুধু 'বিসমিল্লাহ' বলে মনে মনে কুরবানীর নিয়ত করলেই যথেষ্ট হবে।[৮১]

(৮) ঈদের ছালাত ও খুৎবা শেষ হওয়ার পূর্বে কুরবানী করা নিষেধ। করলে তাকে তদস্থলে আরেকটি কুরবানী দিতে হবে।[৮২]

(৯) গোশত বণ্টন : কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করে এক ভাগ নিজ পরিবারের খাওয়ার জন্য, এক ভাগ প্রতিবেশী যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের জন্য ও এক ভাগ সায়েল ফক্বীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবে। প্রয়োজনে উক্ত বণ্টনে কমবেশী করায় কোন দোষ নেই।[৮৩] কুরবানীর গোশত যত দিন খুশী রেখে খাওয়া যায়।[৮৪] অমুসলিম দরিদ্র প্রতিবেশীকেও দেওয়া যায়।[৮৫]

(১০) মৃত ব্যক্তির জন্য পৃথকভাবে কুরবানী দেওয়ার কোন ছহীহ দলীল নেই। মৃত ব্যক্তিগণ পরিবারের সদস্য থাকেন না এবং তাদের উপরে শরী'আত প্রযোজ্য নয়। অথচ কুরবানী হয় জীবিত ব্যক্তি ও পরিবারের পক্ষ হ'তে। এক্ষণে যদি কেউ মৃতের নামে কুরবানী করেন, তবে হযরত আব্দুল্লাহ ইবনুল মুবারক (১১৮-১৮১ হিঃ) বলেন, তাকে সবটুকুই ছাদাক্বা করে দিতে হবে।[৮৬]

(১১) কুরবানীর গোশত বিক্রি করা নিষেধ। তবে তার চামড়া বিক্রি করে[৮৭] শরী'আত নির্দেশিত ছাদাক্বার খাত সমূহে ব্যয় করবে *(তওবা ৬০)*। অনেকে কুরবানীর গোশত ফ্রিজে জমা করে পরবর্তীতে কমদামে বিক্রি করেন। এগুলি প্রতারণা মাত্র। বরং তা অন্যদের মধ্যে ছাদাক্বা বা হাদিয়া হিসাবে বিতরণ করে দিতে হবে। অথবা নিজে রেখে যতদিন খুশী খাবে। কুরবানী আল্লাহ্‌র মেযবানী। অতএব এর গোশত নিয়ে ব্যবসা করা বৈধ নয়।

(১২) কুরবানীর পশু যবহ করা কিংবা কুটা-বাছা বাবদ কুরবানীর গোশত বা চামড়ার পয়সা হ'তে কোনরূপ মজুরী দেওয়া যাবে না। ছাহাবীগণ নিজ নিজ পকেট থেকে এই মজুরী দিতেন। অবশ্য ঐ ব্যক্তি দরিদ্র হ'লে হাদিয়া স্বরূপ তাকে কিছু দেওয়ায় দোষ নেই।[৮৮]

(১৩) রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) ঈদুল ফিৎরের দিন কয়েকটি বেজোড় খেজুর খেয়ে ঈদগাহে বের হ'তেন এবং ঈদুল আযহার দিন ছালাত আদায় না করা পর্যন্ত কিছুই খেতেন না।[৮৯] তিনি কুরবানীর পশুর গোশত দ্বারা ইফতার করতেন।[৯০]

(১৫) কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করা নাজায়েয। আল্লাহ্‌র রাহে রক্ত প্রবাহিত করাই এখানে মূল ইবাদত। যদি কেউ কুরবানীর বদলে তার মূল্য ছাদাক্বা করতে চান, তবে তিনি মুহাম্মাদী শরী'আতের প্রকাশ্য বিরোধিতা করবেন।[৯১]

(১৬) কুরবানী করা সুন্নাতে মুওয়াক্কাদাহ। এটি ওয়াজিব নয় যে, যেকোন মূল্যে প্রত্যেককে কুরবানী করতেই হবে। লোকেরা যাতে এটাকে ওয়াজিব মনে না করে, সেজন্য সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হযরত আবুবকর ছিদ্দীক ওমর ফারূক আব্দুল্লাহ ইবনে ওমর, আব্দুল্লাহ ইবনে আব্বাস (রাঃ) প্রমুখ ছাহাবী কখনো কখনো কুরবানী করতেন না।[৯২] অতএব ঋণ থাকলে সেটা পরিশোধ করাই যরূরী। তবে দাতার সম্মতিতে ঋণ দেরীতে পরিশোধ করে কুরবানী দেওয়ায় কোন বাধা নেই।

কুরবানীর অন্যান্য মাসায়েল :

(ক) পোষা বা খরিদ করা কোন পশুকে কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা দিলে তা আর বদল করা যাবে না। অবশ্য যদি নির্দিষ্ট না করে থাকেন, তবে তার বদলে উত্তম পশু কুরবানী দেওয়া যাবে। (খ) কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট গাভিন গরু বা বকরী যদি কুরবানীর পূর্বেই জীবিত বাচ্চা প্রসব করে, তবে ঐ বাচ্চা ঈদের দিনগুলির মধ্যেই কুরবানী করবে। কুরবানীর পূর্ব পর্যন্ত বাচ্চার প্রয়োজনের অতিরিক্ত দুধ মালিক পান করতে পারবে বা তার বিক্রয়লব্ধ পয়সা নিজে ব্যবহার করতে পারবে। তবে ইমাম আবু হানিফা (রহঃ)-এর মতে দুধ বা দুধ বিক্রির পয়সা ছাদাক্বা করে দেওয়া ভাল। অবশ্য কুরবানীর জন্য নির্দিষ্ট না করলে ও সেই মর্মে ঘোষণা না দিলে, সেটাকে যবহ করাও যেতে পারে, রেখে দেওয়াও যেতে পারে। (গ) যদি কুরবানীর পশু হারিয়ে যায় বা চুরি হয়ে যায়, তবে তার পরিবর্তে অন্য কুরবানী যরূরী নয়। যদি ঐ পশু ঈদুল আযহার দিন বা পরে পাওয়া যায়, তবে তা তখনই আল্লাহ্‌র রাহে যবহ করে দিতে হবে। (ঘ) যদি কুরবানীর পূর্বে কুরবানী দাতা মৃত্যুবরণ করেন এবং তার অবস্থা এমন হয় যে, ঐ পশু বিক্রয়লব্ধ পয়সা ভিন্ন তার ঋণ পরিশোধের আর কোন উপায় নেই, তখন কেবল ঋণ পরিশোধের স্বার্থেই কুরবানীর পশু বিক্রয় করা যাবে।[৯৩]

[বিস্তারিত জানার জন্য পাঠ করুন, 'মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই]

---

৭৬. নায়লুল আওত্বার, 'আক্বীক্বা' অধ্যায় ৬/২৬৮ পৃঃ।
৭৭. সুবুলুস সালাম, ৪/১৭৭ পৃঃ; মির'আত ২/৩৫১; ঐ, ৫/৭৫ প্রভৃতি।
৭৮. ফিক্বহুস সুন্নাহ ২/৩০ পৃঃ।
৭৯. মির'আত ৫/১০৬-১০৯।
৮০. মির'আত ২/৩৫০ পৃঃ; ঐ, ৫/৭৪ পৃঃ।
৮১. ইবনু কুদামা, আল-মুগনী (বৈরূত ছাপা : তারিখ বিহীন), ১১/১১৭ পৃঃ।
৮২. মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১৪৭২; মুসলিম, নায়ল ৬/২৪৮-২৪৯ পৃঃ।
৮৩. মির'আত ৫/১২০।
৮৪. তিরমিযী হা/১৫১০; আহমাদ হা/২৬৪৫৮ সনদ হাসান।
৮৫. আল-আদাবুল মুফরাদ হা/১২৮।
৮৬. তিরমিযী তুহফা সহ, হা/১৫২৮, ৫/৭৯ পৃঃ; মির'আত ৫/৯৪ পৃঃ।
৮৭. আহমাদ, মির'আত ৫/১২১; আল-মুগনী ১১/১১১ পৃঃ।
৮৮. আল-মুগনী, ১১/১১০ পৃঃ।
৮৯. বুখারী, মিশকাত হা/১৪৩৩; তিরমিযী, মিশকাত, হা/১৪৪০ সনদ ছহীহ।
৯০. আহমাদ হা/২৩০৩৪, সনদ হাসান; নায়লুল আওত্বার ৪/২৪১।
৯১. মাজমূ' ফাতাওয়া ইবনে তায়মিয়াহ, ২৬/৩০৪; মুগনী, ১১/৯৪-৯৫ পৃঃ।
৯২. বায়হাক্বী, ইরওয়াউল গালীল হা/১১৩৯; মির'আত ৫/৭২-৭৩।
৯৩. মির'আত, ২/৩৬৮-৬৯; ঐ, ৫/১১৭-১২০; কিতাবুল উম্ম ২/২২৫-২৬।

পিউ রিসার্চ সেন্টারের সমীক্ষায় মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক হালচাল

*আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব**

যুক্তরাষ্ট্রের ওয়াশিংটন ভিত্তিক একটি প্রসিদ্ধ সামাজিক গবেষণা সংস্থা 'পিউ রিসার্চ সেন্টার'। গত বছর এপ্রিলে ২২৬ পৃষ্ঠার একটি দীর্ঘ সমীক্ষা রিপোর্ট প্রকাশ করে।[৯৪] দু'দফায় ২০০৮-০৯ এবং ২০১১-১২ মোট চার বছর ধরে ৩৯টি মুসলিম অধ্যুষিত দেশে আশিরও অধিক ভাষায় ৩৮০০০-এর বেশী মৌখিক সাক্ষাৎকার গ্রহণের মাধ্যমে সমীক্ষাটি চালানো হয়। এতে বিভিন্ন পেশা ও শ্রেণীর মুসলমানদেরকে মৌলিক ৭টি ক্যাটাগরিতে প্রশ্ন করা হয়, যেখান থেকে এমন কিছু বিষয় উঠে এসেছে, যা সত্যিই চমকপ্রদ ও আগ্রহউদ্দীপক এবং সেই সাথে উদ্বেগজনকও বটে। বিশেষতঃ এতে মাঠ পর্যায়ে আধুনিক মুসলিম বিশ্বের ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক অবস্থান ও হালচাল সম্পর্কে একটা সাধারণ চিত্র ফুটে উঠেছে। এই সমীক্ষার কিছু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় আলেম-ওলামা এবং ইসলামী সমাজনেতাদের জন্য চিন্তার খোরাক হ'তে পারে, যা তাঁদের কাছে নতুনভাবে কর্মপরিকল্পনা তৈরীর দাবী রাখে। নিম্নে সমীক্ষার উল্লেখযোগ্য অংশসমূহ উল্লেখ করা হ'ল।

১. ইসলামী শরী'আহ আইন :

বলার অপেক্ষা রাখে না যে, আধুনিক মুসলিম বিশ্বের সমাজ ও রাজনীতিতে সেক্যুলারিজম, মানবতাবাদ, সংশয়বাদ ইত্যাদি নাস্তিক্যবাদী চিন্তাধারা অতিশয় বিস্তৃতভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। সাথে সাথে সাম্রাজ্যবাদী বিশ্ব এবং সেক্যুলার মিডিয়া সমূহের প্রোপাগাণ্ডায় ইসলামোফোবিয়া বর্তমান বিশ্বের অন্যতম একটি আলোচিত প্রপঞ্চ। পরিস্থিতি অনেক ক্ষেত্রে এমন দাঁড়িয়েছে যে, এক শ্রেণীর মুসলমান স্বীয় ধর্মপরিচয় নিয়েই বিব্রত। এতদসত্ত্বেও বিস্ময়করভাবে এই সমীক্ষায় দেখা গেছে মুসলিম অধ্যুষিত দেশগুলোতে অধিকাংশ মুসলমানই তাদের দেশের রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামী শরী'আহ আইনের প্রয়োগ দেখতে চেয়েছেন। মজার ব্যাপার হ'ল এই রিপোর্ট অনুযায়ী আমাদের বাংলাদেশে শতকরা ৮২ ভাগ মুসলমান, শরী'আহ আইনকে দেশের শাসনতন্ত্র হিসাবে দেখতে চান। এছাড়া আফগানিস্তানে ৯৯ ভাগ, মালয়েশিয়া ৮৬ ভাগ, পাকিস্তানে ৮৪ ভাগ, মধ্যপ্রাচ্যের ইরাকে ৯১ ভাগ, ফিলিস্তীনে ৮৯ ভাগ, উত্তর আফিকার মরক্কোতে ৮৩ ভাগ, মিসরে ৭৪ ভাগ এবং সাব-সাহারান আফ্রিকার নাইজারে ৮৬ ভাগ, জিবুতিতে ৮২ ভাগ মানুষ রাষ্ট্রীয়ভাবে শরী'আহ আইন কামনা করেন। উল্লেখ্য যে, সঊদী আরব, সুদান, ভারত ও ইরানে এই সমীক্ষাটি গ্রহণ করা হয়নি নিরাপত্তাহীনতার কারণে।

তালিকায় দেখানো হয়েছে সামগ্রিকভাবে দক্ষিণ এশিয়ার ৮৪ ভাগ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ৭৭ ভাগ, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকার ৭৪ ভাগ, সাব-সাহারান আফ্রিকার ৬৪ ভাগ মুসলমান ইসলামী শরী'আহ আইন বাস্তবায়নের পক্ষপাতী। তবে এ সংখ্যাটা উত্তর-পূর্ব ইউরোপে এবং মধ্য-এশিয়ায় অনেক কম। যথাক্রমে মাত্র ১৮% এবং ১২%। সেই সাথে বিস্ময়করভাবে ইসলামী খেলাফতের সর্বশেষ রাজধানী তুরস্কে এই সংখ্যাটা মাত্র ১২%। এমনকি সেখানে অন্ততঃ ৭৬% মুসলমান মনে করেন যে, পারিবারিক ও সম্পত্তি বিষয়ক বিচার-আচারের জন্যও শারঈ আদালতের বিশেষ প্রয়োজন নেই। উল্লেখ্য যে, ১৯২০ সালে সেক্যুলারিস্ট আন্দোলনের সময় সে দেশ থেকে শারঈ আদালত বিলুপ্ত করা হয়।

পরিসংখ্যানে আরো দেখা গেছে, যেসব দেশে ইসলাম রাষ্ট্রধর্ম হিসাবে ঘোষিত হয়েছে, সেসব দেশেই সমর্থকের সংখ্যাটা বেশী। তবে কিরগিজিস্তান (৩৫%), লেবানন (২৯%), তাজিকিস্তান (২৭%)-এর মত পাঁড় ধর্মনিরপেক্ষ রাষ্ট্রেও সমর্থনের হারটা একেবারে কম নয়।

শরী'আহ আইনের সমর্থকদের বয়সের একটা হিসাবও দেয়া হয়েছে এখানে। তাতে দেখা যায় সমর্থকদের অধিকাংশই বয়স্ক তথা পঁয়ত্রিশোর্ধ। পাকিস্তানে আবার পুরুষদের তুলনায় নারী সমর্থকদের সংখ্যা শতকরা ১৬ ভাগ বেশী। আরেকটি বিষয় হ'ল, মতামতদাতাদের মধ্যে শিক্ষিত ও অশিক্ষিতের হারে বিশেষ তারতম্য নেই।

২. আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাস :

শরী'আহ আইনকে রাষ্ট্রীয়ভাবে প্রতিষ্ঠায় সমর্থন থাক বা না থাক, অধিকাংশ মুসলিম দেশে প্রায় শতভাগের কাছাকাছি মুসলমান আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসকেই ভাল মানুষ হওয়ার এবং মানবিক মূল্যবোধ অর্জনের জন্য প্রধান এবং আবশ্যকীয় শর্ত হিসাবে মনে করেন। এই সংখ্যা দক্ষিণ এশিয়ায় ৯৪ ভাগ, মধ্যপ্রাচ্য ও উত্তর আফ্রিকায় ৯১ ভাগ, দক্ষিণ এশিয়ায় ৮৭ ভাগ, আফ্রিকায় ৭০ ভাগ এবং মধ্য-এশিয়ায় ৬৯ ভাগ। কট্টর ধর্মনিরপেক্ষ উত্তর-পূর্ব ইউরোপেও এই সংখ্যা ৬১ ভাগ। কেবলমাত্র আলবেনিয়া (৪৫%) এবং কাজাখস্তানেই (৪১%) এই হিসাবটি শতকরা ৫০ ভাগের কম। বাংলাদেশেরও শতকরা ৮৯ ভাগ মানুষ একজন মানবিক মূল্যবোধসম্পন্ন মানুষ হ'তে গেলে আল্লাহ্‌র প্রতি বিশ্বাসকে অপরিহার্য মনে করেন।

৩. চুরির শাস্তি (হুদূদ) :

মুসলিম দেশগুলিতে সাধারণভাবে শরী'আহ আইনের পক্ষে জনসমর্থন থাকলেও নির্দিষ্টভাবে শরী'আহ আইনের কোন কোন ধারার ব্যাপারে বেশ কিছু তারতম্য লক্ষ্য করা যায়।

---

* *এমএস (হাদীছ), উছূলুদ্দীন বিভাগ, ইন্টারন্যাশনাল ইসলামিক ইউনিভার্সিটি, ইসলামাবাদ, পাকিস্তান।*

৯৪. *The Worlds Muslims : Religion, Politics and Society (Pew Research Center, Washington DC, 2013, 226 pages), Published on April 30, 2013.*

যেমন চুরির শাস্তিতে হাত কর্তন করা সমর্থন করেন কি-না এমন প্রশ্নে বাংলাদেশের শতকরা ৫০ ভাগ মানুষই ইতিবাচক মন্তব্য করেছেন। এছাড়া দক্ষিণ এশিয়ার মধ্যে পাকিস্তানে ৮৮ ভাগ, আফগানিস্তানে ৮১ ভাগ, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়াতে ৬৬ ভাগ, থাইল্যাণ্ডে ৪৬ ভাগ, ইন্দোনেশিয়াতে ৪৫ ভাগ, মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তীনে ৭৬ ভাগ, মিসরে ৭০ ভাগ, মধ্য এশিয়ার কিরগিজিস্তানে ৫৪ ভাগ, তুরস্কে ৩৫ ভাগ, উত্তর-পূর্ব ইউরোপের আলবেনিয়াতে ৪৩ ভাগ, রাশিয়াতে ৩৯ ভাগ মতামতদাতা এই আইনকে সমর্থন করেছেন।

৪. রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা (হুদূদ) :

ব্যভিচারের শাস্তি হিসাবে রজম বা পাথর নিক্ষেপে হত্যা করাকে সমর্থন করেন কি-না এই প্রশ্নে আশ্চর্যজনকভাবে বিশ্বের ২০টি মুসলিম দেশের ১০টিতেই অর্ধেকের বেশী মানুষ সমর্থনসূচক মন্তব্য করেছেন। সবচেয়ে বেশী অগ্রসর পাকিস্তান এবং আফগানিস্তানের মতামতদাতারা। পাকিস্তানের ৮৯ ভাগ এবং আফগানিস্তানের ৮৫ ভাগ মানুষ এই আইনকে জোর সমর্থন করেছেন। বাংলাদেশেও এই আইনের সমর্থক প্রায় ৫৫ ভাগ। এছাড়া দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়াতে ৬০ ভাগ, থাইল্যাণ্ডে ৫১ ভাগ, ইন্দোনেশিয়াতে ৪৮ ভাগ, মধ্যপ্রাচ্যের ফিলিস্তীনে ৮৪ ভাগ, মিসরে ৮১ ভাগ, জর্ডানে ৬৭ ভাগ, মধ্যএশিয়ার তাজিকিস্তানে ৫১ ভাগ, তুরস্কে ২৯ ভাগ এবং উত্তর-পূর্ব ইউরোপের রাশিয়াতে ২৬ ভাগ, কসভো ও আলবেনিয়াতে ২৫ ভাগ, বসনিয়া-হার্জেগোভিনাতে ২১ ভাগ মতামতদাতা রজমের শাস্তিকে সমর্থন করেছেন। বর্তমানে পরজীবী মানবাধিকার সংস্থাগুলোর অব্যাহত অপপ্রচারণা সত্ত্বেও রজমের শাস্তির পক্ষে এমন স্ফীত সমর্থন সত্যিই বেশ কৌতূহল সৃষ্টি করে।

৫. মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ড (হুদূদ) :

এক্ষেত্রেও ২০টি দেশের মধ্যে অন্ততঃ ৬টি দেশের অর্ধেকের বেশী জনগণ মুরতাদের শাস্তি মৃত্যুদণ্ডকে আবশ্যক মনে করেন। সর্বাধিক সমর্থন দেখা গেছে মিসরে ৮৬ ভাগ এবং জর্ডানে ৮২ ভাগ। দক্ষিণ এশিয়ায় পাকিস্তানে ৭৯ ভাগ, আফগানিস্তানে ৭৬ ভাগ মানুষ এই আইন সমর্থন করলেও বাংলাদেশে এই সংখ্যাটা একটু কম, শতকরা ৪৪ ভাগ। এছাড়া মালয়েশিয়ায় ৬২ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ায় ১৮ ভাগ, বসনিয়া-হার্জেগোভিনা ও রাশিয়ায় ১৫ ভাগ এবং আলবেনিয়ার ৮ ভাগ মানুষ এই আইন সমর্থন করেন। মধ্য এশিয়ার দেশগুলোতে কেবল তাজিকিস্তানেই এক-পঞ্চমাংশ মানুষ (২২%) এই আইনের সমর্থক। বাকি দেশগুলোতে এ সংখ্যা এক-দশমাংশেরও কম। স্বাভাবিকভাবেই এই ধর্মনিরপেক্ষতার জয়জয়কারের যুগে এমন একটি স্পর্শকাতর বিষয়ে এত সমর্থন থাকাটা বেশ বিস্ময়করই বটে।

৬. বহুবিবাহ :

আধুনিক বিশ্বে বহুবিবাহ মানুষের চোখে একটি গর্হিত অপরাধে পরিণত হয়েছে। বিশেষ করে আধুনিকতার দাবীদার পাশ্চাত্য সমাজব্যবস্থায় এটা একেবারেই অগ্রহণযোগ্য। কিন্তু পিউ সেন্টারের সমীক্ষায় দেখা গেছে, অধিকাংশ মুসলিম দেশের একটি বড় অংশ একে নৈতিকভাবে সমর্থন করেছেন। সাব-সাহারান আফ্রিকার দেশগুলোতে এই সমর্থনের ভাগটা সবচেয়ে বেশী। নাইজারে ৮৭ ভাগ, সেনেগালে ৮৬ ভাগ, মালি ৭৪ ভাগ, ক্যামেরুনে ৬৭ ভাগ এবং নাইজেরিয়া ও তাঞ্জানিয়াতে ৬৩ ভাগ মানুষ বহুবিবাহ গ্রহণযোগ্য মনে করেন। তবে জিবুতি, লাইবেরিয়া, ইথিওপিয়ার দেশগুলোতে সমর্থনের হারটা ৫০ ভাগের কম। মধ্যপ্রাচ্যের দেশগুলিতেও বহুবিবাহ প্রায় একচেটিয়া সমর্থিত। তবে তিউনিসিয়ায় এই সমর্থনের হার মাত্র ৩৩ ভাগ। দক্ষিণ এশিয়াতে সমর্থনের ভাগটা তুলনামূলক বেশ কম। বাংলাদেশে ৫৬ ভাগ মানুষ বহুবিবাহের প্রতি অনিচ্ছুক মনোভাব দেখিয়েছেন। এই সংখ্যাটা পাকিস্তানেও ৪২ ভাগ। তবে মজার ব্যাপার হ'ল দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার থাইল্যাণ্ডে ৬৬ ভাগ এবং মালয়েশিয়াতে ৪৯ ভাগ মানুষ বহুবিবাহের সমর্থক। আর পাশ্চাত্য সংস্কৃতির প্রভাবাধীন মধ্যএশিয়া এবং উত্তর-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতে স্বাভাবিকভাবে বহুবিবাহের প্রতি সমর্থন অনেক কম। তুরস্কে ৭৮ ভাগ মানুষই বহুবিবাহকে নাকচ করেছেন। তবে রাশিয়াতে বিস্ময়করভাবে ৩৭ ভাগ মানুষ এখনো বহুবিবাহ সমর্থন করেন। বলা বাহুল্য, যারা সমর্থন করেছেন তাদের বড় অংশই পুরুষ। নারীরা প্রায় একচেটিয়াভাবে নেতিবাচক মত পোষণ করেছেন। কেবল আফ্রিকার নারীরা এক্ষেত্রে বেশ সহনশীল।

৭. স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক :

পুরুষ ও নারীর সম্পর্কের প্রশ্নে প্রাকৃতিকভাবেই পুরুষের উপর অভিভাবকত্বের দায়দায়িত্ব বর্তায়। কিন্তু আধুনিক যুগে এই প্রাকৃতিক ব্যাপারটিকে কটাক্ষ করে 'পুরুষতান্ত্রিক সমাজব্যবস্থা' নামক নিন্দার্থে ব্যবহৃত একটি পরিভাষা আবিষ্কার করা হয়েছে। যার মূলে হ'ল নারীর উপর পুরুষের অভিভাবকত্ব ক্ষমতাকে রহিত বা খর্ব করা। মানবাধিকার সংস্থাগুলো 'নারীর ক্ষমতায়নে'র নামে এ ব্যাপারে খুব জোরেশোরে প্রচারণা চালিয়ে আসছে। এতদসত্ত্বেও এই সমীক্ষায় দেখা গেছে, মুসলিম দেশগুলোতে প্রায় শতভাগ মানুষই মনে করেন স্ত্রীকে অবশ্যই তার স্বামীর আনুগত্য করা উচিত। বাংলাদেশ ও পাকিস্তানে ৮৮ ভাগ মানুষই এই মতের সমর্থক। মালয়েশিয়ায় ৯৬ ভাগ, ইন্দোনেশিয়ায় ৯৩ ভাগ এবং থাইল্যাণ্ডে ৮৯ ভাগ মানুষ স্ত্রীর উপরে স্বামীর অভিভাবকত্বকে সমর্থন করেন। মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতেও পরিস্থিতি একই রকম। কেবল জর্ডানে এবং লেবাননে এই সমর্থনটা ৮০ ভাগের নীচে। অনুরূপভাবে মধ্যএশিয়ার দেশগুলোতে সমর্থনের হার ৭৫ ভাগের উপরে। কেবল তুরস্কে (৬৫%) এবং কাজাকিস্তানে (৫১%) সমর্থন খানিকটা কম। আর ইউরোপের নিকটবর্তী দেশ রাশিয়াতে ৬৯ ভাগ, বসনিয়াতে ৪৫ ভাগ এবং

মাসিক আত-তাহরীক অক্টোবর ২০১৪ ১৮তম বর্ষ ১ম সংখ্যা

আলবেনিয়াতে ৪০ ভাগ মানুষ স্ত্রীর উপর স্বামীর কর্তৃত্বকে আবশ্যক বলে মত প্রকাশ করেছেন।

৮. সম্পত্তিতে ছেলে-মেয়ের সমান ভাগ :

সম্পত্তিতে ছেলে-মেয়ের সমান ভাগ দেয়া উচিত কি-না এ প্রশ্নে অবশ্য মুসলিম সমাজে যথেষ্ট বিভক্তি দেখা গেছে। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপ এবং মধ্যএশিয়ার অধিকাংশেরই মত হ'ল সম্পত্তিতে ছেলে-মেয়ের সমবণ্টনই থাকা উচিত। এমনকি তুরস্কে ৮৮ ভাগ মানুষই এই নীতির পক্ষে। তবে কিছুটা ব্যতিক্রমীভাবে উজবেকিস্তানে ৫০ ভাগ এবং কিরগিজিস্তানে ৪৬ ভাগ মানুষ সমবণ্টনের পরিবর্তে শরী'আত অনুযায়ী প্রাপ্য হারে বণ্টন করার পক্ষপাতী। দক্ষিণ এশিয়ার ইন্দোনেশিয়া (৭৬%) এবং থাইল্যাণ্ডের (৬১%) অধিকাংশ মানুষ সমবণ্টনে বিশ্বাসী হ'লেও বেশ লক্ষণীয়ভাবে মালয়েশিয়ায় ৬৪ ভাগ মানুষ শরী'আত মোতাবেক বণ্টনেই বিশ্বাসী। আবার পাকিস্তানে ৫৩ ভাগ মানুষ সমবণ্টনের সমর্থক হ'লেও পার্শ্ববর্তী দেশ আফগানিস্তানে ৭০ ভাগ এবং বাংলাদেশে ৫৪ ভাগ মানুষ শরী'আহ মোতাবেক বণ্টনেই আস্থাশীল। মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার চিত্র অবশ্য ভিন্ন। সেখানকার সব দেশেরই অধিকাংশ মানুষ শরী'আহ মোতাবেক বণ্টনকে অগ্রাধিকার দিয়েছেন। তবে ফিলিস্তীনে ৪৩ ভাগ মানুষ, মিসরে ২৬ ভাগ এবং মরক্কো ও তিউনিসিয়ায় ১৫ ভাগ মানুষ এখনো নারী-পুরুষ সমবণ্টনের সমর্থক রয়েছেন।

৯. ব্যক্তিজীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের প্রভাব :

সমীক্ষায় প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, তাদের জীবনে নবী মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর শিক্ষা তথা সুন্নাতের প্রভাব কতটুকু আছে? এ প্রশ্নের জবাবে প্রায় সব দেশেরই অধিকাংশ মুসলমান বলেছেন, তাদের জীবনে কম-বেশী রাসূল (ছাঃ)-এর দেখানো পথ তথা সুন্নাতের প্রভাব আছে। বিশেষতঃ দক্ষিণ এশিয়ার মুসলমানরাই এ ব্যাপারে সবচেয়ে বেশী অগ্রসর। বাংলাদেশে ৮৪ ভাগ মানুষই তাদের জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের প্রভাব স্বীকার করেছেন। যাদের মধ্যে ৪৬ ভাগই মনে করেন এই প্রভাবটা তাদের জীবনে অনেক বেশী। অনুরূপভাবে পাকিস্তানে ৮৭ ভাগ এবং আফগানিস্তানে ৯৭ ভাগ মানুষ এ প্রভাবের কথা উল্লেখ করেছেন। পূর্বের দেশ থাইল্যাণ্ডে ৮৭ ভাগ মানুষ একই মত ব্যক্ত করেছেন। যাদের ৭০ ভাগই আবার উল্লেখ করেছেন এই প্রভাবটা তাদের উপর খুব জোরালো। ইন্দোনেশিয়ায় ৮৩ ভাগ এবং মালয়েশিয়ায় ৭৬ ভাগ মানুষ একই কথা বলেছেন। মধ্যপ্রাচ্যে বিস্ময়করভাবে এই সংখ্যাটা বেশ কম। সর্বাধিক ইরাকে (৮২%) ও মরক্কোতে (৮১%) এই সংখ্যাটি বেশী হ'লেও লেবানন (৫৬%), ফিলিস্তীন (৬১%), জর্ডান (৪৭%) এবং মিসরে (৫৬%) তা উল্লেখযোগ্য হারে কম। আবার মধ্যএশিয়ার মুসলমানরা এ ব্যাপারে বেশ অগ্রসর। কেবল কাজাখস্তান (৩৮%) বাদে সেখানকার বাকি দেশগুলোতে তা শতকরা ৫০ ভাগের উপরে। তবে তুরস্কে এই সংখ্যাটা ৭৬% হওয়াটা জরীপের অন্যান্য হিসাবের তুলনায় একটু অবিশ্বাস্যই মনে হয়। তবে দুঃখজনক হ'লেও সত্য যে, উত্তর-পূর্ব ইউরোপের মুসলিম দেশ কসোভো এবং আলবেনিয়ার মাত্র ২০ ভাগ মুসলমান মনে করে তাদের জীবনে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাতের কোন দৃশ্যমান প্রভাব রয়েছে।

১০. ইসলামই একমাত্র জান্নাতে প্রবেশের মাধ্যম :

৩৪টি মুসলিম দেশের মুসলমানদেরকে প্রশ্ন করা হয়েছিল যে, জান্নাতে প্রবেশের জন্য কেবল ইসলামই কি একমাত্র অনুসরণীয় ধর্ম, না-কি অন্যান্য ধর্মানুসারীরাও জান্নাতে যেতে পারে? তাতে দেখা গেছে, দক্ষিণ এশিয়া এবং মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় শতভাগ মানুষই বিশ্বাস করেন যে, জান্নাতে প্রবেশ করতে গেলে ইসলাম অনুসরণের কোন বিকল্প নেই। বাংলাদেশে ৮৮ ভাগ এবং পাকিস্তানে ৯২ মানুষ এই বিশ্বাস পোষণ করেন। অনুরূপভাবে মালয়েশিয়াতে ৯৩ ভাগ, ইন্দোনেশিয়া ও থাইল্যাণ্ডে ৮৭ ভাগ মুসলমান এই ধারণায় বিশ্বাসী। মধ্যপ্রাচ্যের প্রায় শতভাগ মানুষ ইসলামকে নিরংকুশ অনুসরণীয় ধর্ম বলে বিশ্বাস করে। কেবল তিউনিসিয়া ও লেবাননে যথাক্রমে ২৪ ও ২৭ ভাগ মানুষ মনে করে ইসলামের পরিবর্তে অন্য ধর্ম অনুসরণ করলেও জান্নাতে যাওয়া যাবে। সাব-সাহারান আফ্রিকার মুসলমানদের মধ্যেও এ ব্যাপারে তেমন কোন সন্দেহ নেই। কেবল ধারার বিপরীতে মোজাম্বিক ও চাদের মত কিছু দেশে যথাক্রমে ৪৪ ও ৪৯ ভাগ মানুষ ধারণা করে যে, অন্য ধর্মের অনুসারীরাও জান্নাতে যেতে পারে। মধ্যএশিয়া এবং উত্তর-পূর্ব ইউরোপের দেশগুলোতেও মুসলমানরা এ ব্যাপারে মোটামুটি সচেতন যে ইসলামই একমাত্র সত্য ধর্ম। কিন্তু কিরগিজিস্তানের ৪৯ ভাগ এবং বসনিয়ার ৩৬ ভাগ মুসলমানের ধারণায় এখনও এই গলদ রয়ে গেছে যে, অন্যান্য ধর্মানুসারীও জান্নাতে যাবে।

১১. ধর্ম ও বিজ্ঞানের সম্পর্ক :

ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যকার সম্পর্কের প্রশ্নেও অধিকাংশ মুসলিমের ধারণা মোটামুটি স্পষ্ট। জরিপ চালানো ২৩টি দেশের মাত্র দু'টি দেশ লেবানন ও তিউনিসিয়ায় শতকরা ৫০ ভাগের বেশী মানুষের ধারণা ধর্ম ও বিজ্ঞান সাংঘর্ষিক। বাকি দেশগুলোর অধিকাংশ মানুষই মনে করেন ধর্ম ও বিজ্ঞানের মধ্যে কোন বিভেদ নেই। তবে অনাকাংখিতভাবে বাংলাদেশে অন্ততঃ ৪৫ ভাগ মুসলমানের মতে ধর্ম ও বিজ্ঞানের অনেক বিষয়েই সংঘাত রয়েছে। এই হারটি তুলনামূলকভাবে অন্যান্য মুসলিম দেশ থেকে একটু বেশীই।

১২. বিবর্তনবাদে বিশ্বাস :

জরীপে অত্যন্ত হতাশাজনক চিত্র দেখা গেছে বিবর্তনবাদের প্রশ্নে। ২২টি মুসলিম দেশের ১৩টিতেই অধিকাংশ মুসলমান

বিশ্বাস করে যে, মানুষ এবং অন্যান্য প্রাণীসমূহ সময়ের ব্যবধানে বিবর্তিত হয়ে বর্তমান রূপ ধারণ করেছে। মাত্র চারটি দেশে এর বিপরীত ধারণা পোষণকারীদের সংখ্যা বেশী। আফগানিস্তান, তাজিকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া ও ইরাক)। এমনকি বাংলাদেশে শতকরা ৫৪ ভাগ মানুষ বিবর্তনবাদে বিশ্বাসী বলে জরীপে উঠে এসেছে। এটা সত্যিই উদ্বেগজনক।

১৩. নিজ দেশের চলমান আইন সম্পর্কে ধারণা :

অধিকাংশ মুসলমানই মনে করেন যে, তাদের দেশ ইসলামী আইন অনুসরণ করে না। দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপের দেশ বসনিয়ায় ৬৮ ভাগ, রাশিয়ায় ৬১ ভাগ এবং কসোভোয় ৫৯ ভাগ মানুষ তাদের দেশে ইসলামী আইনের অনুসরণ করা হয় না বলে মন্তব্য করেন। মধ্যএশিয়ার পরিস্থিতিও প্রায় একই রকম। কাজাখস্তানে ৭২ ভাগ, আজারবাইজানে ৬৯ ভাগ এবং কিরগিজিস্তানে ৫৪ ভাগ মানুষ মনে করেন তাদের দেশে ইসলামী আইনের প্রয়োগ নেই। তবে তাজিকিস্তানে ৫১ ভাগ মানুষ ধারণা করেন কিছুটা হ'লেও তাদের দেশ ইসলামী আইন অনুসরণ করে। মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকার দেশগুলোতে চিত্র কিছুটা ভিন্ন। যেমন ইরাকে ৫৬ ভাগ, মরক্কোতে ৫৪ ভাগ মানুষ তাদের দেশে ইসলামী আইনের যথেষ্ট প্রয়োগ আছে মনে করলেও জর্ডানে ৫৭ ভাগ, তিউনিসিয়ায় ৫৬ ভাগ, ফিলিস্তীনে ৫৯ ভাগ, মিসরে ৫৬ ভাগ এবং লেবাননে ৭৯ ভাগ মানুষ বলেছেন তাদের দেশ ইসলামী আইন অনুসরণ করছে না। দক্ষিণ ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়াতে ৫৮ ভাগ এবং ইন্দোনেশিয়ায় ৫৪ ভাগ মানুষ তাদের দেশ মোটামুটিভাবে ইসলামী আইন মোতাবেক পরিচালিত হচ্ছে মন্তব্য করলেও বাংলাদেশে ৪৯ ভাগ এবং পাকিস্তানে ৪৫ ভাগ মানুষ মনে করে তাদের দেশে ইসলামী আইন নেই। শুধুমাত্র আফগানিস্তানের তুলনামূলক ভিন্ন চিত্র দেখা গেছে। সেখানে ৮৮ ভাগ মানুষ মনে করে তাদের দেশ ইসলামী আইন মোতাবেক পরিচালিত।

১৪. বিচারব্যবস্থায় শরী'আহ আইনের অনুসরণ :

অধিকাংশ দেশের মুসলমানরাই তাদের দেশে শরী'আহ আইন না থাকা নিয়ে অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। বিশেষতঃ দক্ষিণ এশিয়াতে এই অনুভূতির প্রকাশটা বেশী দেখা গেছে। যেমন পাকিস্তানে ৯১ ভাগ, আফগানিস্তানে ৮৪ ভাগ এবং বাংলাদেশে ৮৩ ভাগ মানুষই এ ব্যাপারে তাদের ক্ষোভ ও অসন্তোষ প্রকাশ করেছেন। অনুরূপভাবে মধ্যপ্রাচ্য এবং উত্তর আফ্রিকারও অধিকাংশ মানুষ মনে করে তাদের দেশে শরী'আহ আইনের অনুসরণ না থাকাটা খুব খারাপ একটা দিক। ফিলিস্তীনে ৮৩ ভাগ, মরক্কোতে ৭৬ ভাগ, ইরাকে ৭১ ভাগ, জর্ডানে ৬৯ ভাগ, মিসরে ৬৭ ভাগ, তিউনিসিয়ায় ৫৪ ভাগ এবং লেবাননে ৩৮ ভাগ মানুষ এ ব্যাপারে অসন্তুষ্ট। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়া এবং ইন্দোনেশিয়ায় ৬৫ ভাগ মানুষ এ ব্যাপারে তাদের ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন। তবে মধ্যএশিয়ার অধিকাংশ মানুষ এ ব্যাপারে ভাল-মন্দ কোন মতামত ব্যক্ত করেননি। কেবল কিরগিজিস্তান (৪৭%) এবং তাজিকিস্তানে (৩২%) উল্লেখযোগ্য সংখ্যকের মতে শরী'আহ আইন অনুসরণ না করাটা মন্দ ব্যাপার। অনুরূপই অবস্থা উত্তর-পূর্ব ইউরোপেরও। এমনকি দুঃখজনকভাবে বসনিয়া-হার্জেগোভিনা এবং কসোভোয় ৫০ ভাগ মুসলমানই মনে করেন শরী'আহ আইন না থাকাতে বরং ভালই হয়েছে। খানিকটা ব্যতিক্রম রাশিয়ার মুসলমানরা। তাদের ৪২ ভাগ কোন মতামত প্রকাশ না করলেও ৪৭ ভাগ আবার মনে করেন শরী'আহ আইন না থাকাটা ভালো তো নয়ই, বরং মন্দের কারণ হয়েছে।

১৫. গণতন্ত্র :

গণতন্ত্রের প্রশ্নে অবশ্য ৩৭টি মুসলিম দেশের মধ্যে ৩১টিতেই অন্ততঃ অর্ধেক মানুষ ইতিবাচক অবস্থান গ্রহণ করেছে। এ সংখ্যাটা আবার সাব-সাহারান আফ্রিকা অঞ্চলেই বেশী। এ অঞ্চলের দুই-তৃতীয়াংশ মানুষই গণতন্ত্রের সমর্থক। যেমন ঘানায় ৮৭ ভাগ, জিবুতি, কেনিয়া ও সেনেগালে ৭৯ ভাগ এবং চাদে ৭৭ ভাগ মানুষ একজন শক্তিশালী একনায়কতান্ত্রিক রাষ্ট্রপ্রধানের চেয়ে গণতান্ত্রিক সরকারকেই বেশী গ্রহণযোগ্য মনে করেন। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়াতেও গণতন্ত্রের সমর্থন বেশ উল্লেখযোগ্য। মালয়েশিয়ায় ৬৭ ভাগ, থাইল্যাণ্ডে ৬৪ ভাগ এবং ইন্দোনেশিয়ায় ৬১ ভাগ মানুষ গণতন্ত্রকামী। অন্যদিকে দক্ষিণ এশিয়ার পরস্থিতি যথেষ্ট ভিন্ন। পাকিস্তানে ৫৬ ভাগ এবং আফগানিস্তানে ৫১ ভাগ মানুষ গণতান্ত্রিক সরকারের পরিবর্তে শক্তিশালী একনায়কতন্ত্রকেই বেশী পসন্দ করেন। কেবল বাংলাদেশই সেক্ষেত্রে ব্যতিক্রম। এখানকার প্রায় ৭০% মানুষ গণতান্ত্রিক সরকার ব্যবস্থার সমর্থক। মধ্যপ্রাচ্যেও গণতন্ত্রের প্রাধান্য যথেষ্ট লক্ষণীয়। লেবাননে ৭১%, তিউনিসিয়ায় ৭৫%, মিসর ও ফিলিস্তীনে ৫৫% এবং ইরাকে ৫৪% মানুষ গণতন্ত্রে আস্থাশীল। মধ্যএশিয়ায় তাজিকিস্তানে ৭৬%, তুরস্কে ৬৭% মানুষ গণতন্ত্র সমর্থন করলেও গণতন্ত্রবিরোধীদের সংখ্যাও নিতান্ত কম নয়। এমনকি কিরগিজিস্তানে ৬৪ ভাগ মানুষই গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্রের সমর্থক। অনুরূপভাবে উত্তর-পূর্ব ইউরোপের রাশিয়া এবং বসনিয়াতেও বেশীর ভাগ মুসলমান গণতন্ত্রের পরিবর্তে একনায়কতন্ত্রকামী।

১৬. রাজনীতিতে ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব :

গণতন্ত্রের প্রতি অধিকাংশ মুসলিম দেশে সমর্থন দেখা গেলেও ধারার বিপরীতে মতামতদাতাদের অধিকাংশই মনে করেন রাজনীতিতে ধর্মীয় নেতাদের প্রভাব কমবেশী থাকা উচিত। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মালয়েশিয়াতে ৮২ ভাগ এই মত পোষণ করেন। যাদের মধ্যে ৪১ ভাগই মনে করেন এই প্রভাবটা খুব জোরালোভাবেই থাকা উচিত। অনুরূপভাবে

ইন্দোনেশিয়াতেও ৭৫ ভাগ মানুষ তা-ই মনে করেন। দক্ষিণ এশিয়ার আফগানিস্তানে ৮২ ভাগ এবং বাংলাদেশে ৬৯ ভাগ মানুষ রাজনীতিতে ধর্মীয় নেতাদের প্রভাবকে গুরুত্বপূর্ণ মনে করলেও বিস্ময়করভাবে পাকিস্তানে এই সংখ্যাটা মাত্র ৫৪%। যার মধ্যে ২৭ ভাগই আবার মনে করেন এই প্রভাব কম থাকাই বরং ভাল। মধ্যপ্রাচ্যেও ধর্মীয় নেতাদের প্রতি যথেষ্ট আস্থা দেখা গেছে। জর্ডানে ৮০ ভাগ, মিসরে ৭৫ ভাগ, ফিলিস্তীনে ৭২ ভাগ, তিউনিসিয়ায় ৫৮ ভাগ এবং ইরাকে ৫৭ ভাগ মানুষ ধর্মীয় নেতাদের রাজনৈতিক ভূমিকা কামনা করেন। তবে যথারীতি মধ্যএশিয়া ও দক্ষিণ-পূর্ব ইউরোপে এই প্রবণতা কম। কেবল রাশিয়ায় (৫৮%) এবং কিরগিজিস্তানে (৪৬%) এর প্রতি সমর্থন জানিয়েছেন। তুরস্কে এই সংখ্যাটা ৩৬%।

এছাড়া উক্ত সমীক্ষায় আরো অনেক বিষয় এসেছে, তবে গুরুত্ব বিবেচনায় এ কয়টিই উল্লেখ করা হ'ল। উপরোক্ত ফলাফল থেকে সাধারণভাবে যে চিত্রটি ফুটে উঠেছে তা থেকে এতটুকু স্পষ্টভাবেই প্রতীয়মান হয় যে, মুসলিম সমাজ ও রাষ্ট্রব্যবস্থার এই চূড়ান্ত অধঃপতনের যুগেও বিশ্বের অধিকাংশ মুসলমানের অন্তরে ঈমানের প্রভাব রয়েছে। সাম্প্রতিক অতীতে এবং বর্তমান যুগে নিয়মিতভাবে ইসলাম বিরোধী নানা মতবাদ-মতাদর্শের আবির্ভাব ঘটা এবং কাফির-মুশরিক শক্তি কর্তৃক মুসলমানদেরকে ইসলাম থেকে দূরে সরানোর নানা কলা-কৌশল অবলম্বন করা সত্ত্বেও যে ইসলামকে মানুষের হৃদয় থেকে মুছে ফেলা যায়নি। এটা বেশ আশান্বিত হওয়ার মত ব্যাপার।

এটা সত্য যে, মুসলিম সমাজে আজ এমন হাযারো কর্মকাণ্ডের ভুরি ভুরি নযীর বিদ্যমান, যা বিশুদ্ধ আক্বীদা-আমলের মানদণ্ডে একেবারেই অগ্রহণযোগ্য এবং ঈমানবিধ্বংসী। কিন্তু তা সত্ত্বেও তাদের বিশ্বাসের গভীরতম প্রদেশে দ্বীনের প্রতি ভালবাসার স্থানটা এখনও পর্যন্ত অক্ষুণ্ণ রয়ে গেছে। আর সেটারই বহিঃপ্রকাশ ঘটেছে এই জরীপে। সেজন্য রিপোর্টটি বের হওয়ার পর অধিকাংশ সেক্যুলার মিডিয়ায় গভীর হতাশা ব্যক্ত করা হয়েছে। বিশেষ করে বেশীর ভাগ মুসলমান রাষ্ট্রব্যবস্থায় ইসলামী শরী'আহ আইন এবং বিচারিক আদালতে ব্যভিচারী ও মুরতাদের শাস্তি হিসাবে মৃত্যুদণ্ডকে সমর্থন করাটা তাদের জন্য ব্যাপক উদ্বেগের কারণ হয়েছে। বলা বাহুল্য, সাময়িক একটি জরীপের ফলাফল কোন বিষয়ে চূড়ান্ত ধারণা দেয় না। তবুও এটুকু নিশ্চয় করে বলা যেতে পারে যে, জরীপে প্রাপ্ত তথ্য মোতাবেক মৌলিক ইসলামী আইন-বিধানের প্রতি আমভাবে মুসলিম সমাজের বৃহত্তর অংশের সমর্থনটা খুব ইতিবাচক একটি বিষয়। বিশেষতঃ ইসলামী আদর্শ ও আইন-বিধানকে যারা সমাজ ও রাষ্ট্রীয় অঙ্গনে প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করছেন, তাদের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। এই মুহূর্তে ইসলামী আন্দোলনের নেতৃবৃন্দের জন্য উপরোক্ত বিষয়গুলিকে সামনে রেখে অগ্রাধিকার ভিত্তিতে আগামীর পরিকল্পনা সাজিয়ে নেয়া প্রয়োজন। প্রয়োজন সুনির্দিষ্ট একটি কর্মপরিকল্পনাকে সামনে রেখে সালাফে ছালেহীনের মানহাজ অনুসরণে বিশুদ্ধ দ্বীনের দাওয়াতকে সমাজের সর্বত্র ছড়িয়ে দেয়া। প্রয়োজন শিক্ষা, মিডিয়া, আর্থিক প্রতিষ্ঠান ইত্যাদি প্রভাবশালী প্রাইভেট সেক্টরগুলিতে দাওয়াতের ভিত্তিকে আরো মযবূত করা। প্রয়োজন সমাজ ও রাষ্ট্রনেতাদেরকে দ্বীনের বিশুদ্ধ দাওয়াতের সরাসরি আওতায় নিয়ে আসার জন্য অধিকতর প্রচেষ্টা গ্রহণ করা। সর্বোপরি একতাবদ্ধ হয়ে ইখলাছের সাথে প্রত্যেকেই যদি আমরা নিজ নিজ অবস্থান থেকে দ্বীনের জন্য সর্বোচ্চ ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত হই, তবে সেদিন খুব বেশী দূরে নয়, যেদিন আল্লাহ্‌র যমীনে আল্লাহ্‌র দ্বীন প্রতিষ্ঠা লাভের পথ সুগম হয়ে উঠবে ইনশাআল্লাহ। আল্লাহ আমাদের সেই তাওফীক দান করুন- আমীন!

মসজিদুল হারামে ওমরাহ ও ই'তিকাফ

*আহমাদ আব্দুল্লাহ নাজীব**

হজ্জ-ওমরাহ পালনের সুপ্ত বাসনা নেই এরূপ মুসলমান খুঁজে পাওয়া দুষ্কর। যথারীতি সেই আকাংখা সুপ্ত ছিল আমার মধ্যেও। তবে এই নবীন বয়সেই সেটা পূরণ হয়ে যাবে এমনটা কখনো ভাবতে পারিনি। ২০০০ সালে আমার আব্বু (প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব) শেষবারের মত হজ্জব্রত পালন করেছিলেন সঊদী রাজকীয় মেহমান হিসাবে। এরপর থেকে বিগত ১৪ বছর তিনি বিদেশ সফর করেননি। ২০১৩ সালের ২৩শে নভেম্বর সকল মিথ্যা মামলা থেকে বেকসুর খালাস পাওয়ার পর মাঝে-মধ্যেই সপরিবারে হজ্জ বা ওমরায় যাওয়ার আকাংখা প্রকাশ করতেন। কিন্তু তাঁর পাসপোর্টটি অজ্ঞাত কারণে প্রশাসনের হাতে দীর্ঘদিন আটকে থাকায় সেটা সম্ভব হয়নি। অবশেষে গত ১৫ এপ্রিল'১৪ মঙ্গলবার পাসপোর্ট হাতে আসল। আব্বুর ইচ্ছা রামাযানের শেষ দশকে ই'তিকাফ করবেন। কিন্তু এবারের রামাযানে ওমরাহ্‌র জন্য খুবই সীমিত ভিসা ইস্যু হওয়ায় শেষ দশকের জন্য ভিসা পাওয়া যাবে না বলে জানানো হ'ল। ফলে আশা ছেড়ে দিয়েছিলাম। হঠাৎ ১৫ই রামাযান সোমবার ইফতারের পূর্বে ঢাকা থেকে ফোন আসলো। আব্বুকে জানানো হ'ল, সঊদী এ্যাম্বাসীর বিশেষ ব্যবস্থায় আমাদের ভিসা ওকে হয়েছে এবং ১৭ই রামাযান বুধবার বিকেল ৫-টায় সাউদিয়া এয়ারলাইন্সে যাত্রা করতে হবে। ঘটনার আকস্মিকতায় স্তম্ভিত হয়ে গেলাম। এত অল্প সময়ে হাতে থাকা সমস্ত কাজ গুছিয়ে নেয়া কি সম্ভব!! যাহোক ঝড়ের বেগে কাজ শুরু হ'ল। সবকিছু গুছিয়ে ১৭ই রামাযান ভোর ৫-টার কোচে আব্বুর সাথে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম। গাড়ীতে সামান্য ঘুমের পর শুরু হ'ল সবাইকে জানানো। নেতা-কর্মী, আত্মীয়-স্বজন সকলেই বিস্মিত হ'লেন। বেলা সোয়া ১০-টায় ঢাকায় পৌঁছে লালমাটিয়া কলেজের শিক্ষক জনাব আশরাফ ভাইয়ের বাসায় সামান্য বিশ্রাম নিয়ে যোহর ও আছরের ছালাত জমা করে চললাম বিমানবন্দরের উদ্দেশ্যে। মাসিক আত-তাহরীক সম্পাদক ড. সাখাওয়াত হোসাইন ও ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলগণ আগে থেকেই এয়ারপোর্টে ছিলেন। তাঁদের নিকট থেকে বিদায় নিয়ে বেলা সাড়ে ৩-টায় এয়ারপোর্ট লাউঞ্জে ঢুকলাম। অতঃপর সেখানে কর্মরত পূর্ব পরিচিত আবুবকর, রওশন হাবীব ও হামীদুর রহমান ভাইদের সহযোগিতায় অল্প সময়েই ইমিগ্রেশনের ঝামেলা শেষ করে যথাসময়ে বিমানে চড়ে বসলাম। সাউদিয়া এয়ারলাইন্সের ঢাউস সাইজের বিমানে চড়া, দেশের বাইরে প্রথম যাওয়া, সব মিলিয়ে আমার কৌতূহলটা ছিল একটু বেশীই। সাড়ে ৫-টায় বিমান চলতে শুরু করল। উপরে উঠতে শুরু করার পর চিরচেনা কংক্রিটে মোড়া ইট-পাথরের ঢাকা শহর সম্পূর্ণ নতুনরূপে আবির্ভূত হ'ল। তারপর চারিদিকে শুধু পানি আর পানি। দেখতে দেখতে বিমানটি ৩৩ হাযার ফুট উচ্চতায় উঠে থিতু হ'ল। পশ্চিম মুখে ধাবমান বিমানটির গতি ছিল ঘণ্টায় গড়ে ৯৫০ কি.মি.। বাংলাদেশের হিসাবে মাগরিবের সময় পার হয়ে যাচ্ছে। কিন্তু বাইরে সূর্য তখনও স্পষ্ট দীপ্তিমান। অনেক অপেক্ষার পর সূর্য অস্ত গেল রাত্রি ৯-টার পরে। ফলে এদিন আমাদের ছিয়াম দু'ঘণ্টা বেশী দীর্ঘ হয়ে গেল। ইফতারের পর বাংলাদেশ সময় রাত ১০-টায় বিমানটি সঊদী আরবের দাম্মাম বিমানবন্দরে অবতরণ করল। এখানে ১ ঘণ্টা বিরতিকালে আমরা বিমানের মধ্যেই ছালাত আদায়ের স্থানে ওমরাহ্‌র জন্য ইহরামের কাপড় পরলাম ও দু'রাক'আত নফল ছালাত আদায় করলাম। আমাদের মত আরও অনেকে সেখানে ইহরামের কাপড় পরলেন। অতঃপর বিমান আবার উড়ল জেদ্দার উদ্দেশ্যে। উড্ডয়নের আধা ঘণ্টা পর এবং ইয়ালামলাম মীক্বাত থেকে আধা ঘণ্টার দূরত্বে থাকা অবস্থায় মাইকে ওমরাহ যাত্রীদের ইহরাম বাঁধার প্রস্তুতি নেওয়ার ঘোষণা আসল। তারপর সঊদী সময় রাত ৯.৪০ মিনিটে বিমান জেদ্দা বিমানবন্দরে ল্যাণ্ড করল। সাজানো-গোছানো হলুদ বাতিতে গোটা শহর যেন জ্বলছে। উপর থেকে বিমানবন্দরের বিশালতাও ভালোই টের পাওয়া গেল। এক জায়গায় একত্রে পার্কিং-য়ে থাকা এতগুলো বিমান দেখে আমার চক্ষু তো ছানাবড়া। জেদ্দায় মোট ৪টি বিমানবন্দর রয়েছে। শুনলাম সমন্বিতভাবে যার আয়তন আড়াই'শ বর্গকিলোমিটার। বিমান থেকে নেমে বাসযোগে হজ্জ টার্মিনালে পৌঁছলাম। শুরু হ'ল অপেক্ষার পালা। আমাদের পরে টার্মিনালে আসা শত শত ভিনদেশী যাত্রীর কার্যক্রম এগিয়ে চলেছে। কিন্তু বাংলাদেশীদের দিকে কেউ তাকায় না। প্রায় আড়াই ঘণ্টা পর বাংলাদেশীদের ইমিগ্রেশন কার্যক্রম শুরু হ'ল। ধাপে ধাপে এগিয়ে রাত প্রায় আড়াইটার সময় আমরা ইমিগ্রেশন পার হ'লাম। বিমানবন্দরের বাইরে এসে মোবাইল সিম কিনে যখন আমাদের জন্য রাত ১০-টা থেকে অপেক্ষমান শহীদুল ইসলাম চাচার কাছে ফোন দিলাম, তখন তিনি আকাশের চাঁদ হাতে পাওয়ার মত করে আল-হামদুলিল্লাহ পড়লেন। মোবাইলে যোগাযোগে ব্যর্থ হওয়ায় সবার মধ্যে উৎকণ্ঠা ছড়িয়ে পড়েছিল। বের হবার পর তিনি সবাইকে জানিয়ে দিলেন আমাদের পৌঁছনোর সংবাদ। সে রাতে সাহারী খেলাম জেদ্দার জনৈক বাংলাদেশী টিপু সুলতান ভাইয়ের বাসায়।

সাহারীর পর বেরিয়ে পড়লাম জেদ্দা থেকে ৮৫ কি.মি. দূরে মক্কার উদ্দেশ্যে। পথিমধ্যে জেদ্দার ক্বিছাছ মসজিদে ফজরের ছালাত আদায় করলাম। আযান দেওয়ার বড় মাইকে পুরো ছালাত আদায় করানো হয়, যাতে আশপাশের মানুষ ছালাত চলার বিষয়টি জানতে পারে। সঊদী আরবের অধিকাংশ মসজিদ খুবই জাঁকজমকপূর্ণ। ঢুকলে আর বের হ'তে মন চায় না। ক্বিছাছ মসজিদের সামনেই শারঈ আদালতের হুকুম মোতাবেক শিরশ্ছেদসহ বিভিন্ন শাস্তি বাস্তবায়ন করা হয়। শহীদুল চাচা সে স্থানটি দেখালেন। সাধারণত শুক্রবারে এখানে আদালতের রায় অনুযায়ী হুদূদ (দণ্ড) বাস্তবায়ন করা হয় এবং এর জন্য পৃথকভাবে জনগণের মধ্যে ঘোষণা দেওয়া হয়।

* *এম.ফিল গবেষক, আরবী বিভাগ, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়।*

Contents

সেখান থেকে বের হয়ে আমরা মক্কার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হ'লাম এবং সকাল ৬-টায় মক্কা মুকাররামায় পৌঁছলাম। শহীদুল চাচা আমাদেরকে সবকিছু চিনিয়ে দিয়ে আমাদের ব্যাগ-পত্র নিয়ে হোটেলে চলে গেলেন। এখন শুধু আমি আর আব্বু। বিপুল আগ্রহে এগিয়ে চললাম হারামের দিকে। সবকিছু ছবির মত মনে হচ্ছে। ছবিতে দেখা, ভিডিওতে দেখা মাসজিদুল হারাম আজ বাস্তবে ধরা দিয়েছে চোখের সামনে। অপরূপ নির্মাণশৈলী, সুউচ্চ মিনার, লাখো মানুষে ভরা হারামের বিশাল চত্বর। একপার্শ্বে দাঁড়িয়ে আছে ১৯৭২ ফুট উচ্চতার বিশালকায় যমযম ঘড়ি টাওয়ার, অপরপার্শ্বে হারামের নির্মীয়মাণ বিশালায়তন বর্ধিতাংশ। চোখের পলক যেন পড়তে চায় না। কিং ফাহদ গেট দিয়ে প্রবেশ করে এগিয়ে যেতে যেতে একসময় দৃষ্টিসীমায় এসে গেল কোটি মুসলিমের কাংখিত সেই পবিত্র গৃহ 'কা'বা'। সত্যিই এক অপার্থিব অনুভূতি। বারবার যেন মনে হচ্ছিল 'এটা কি ছবি, না বাস্তব'! হাঁটতে হাঁটতে সকাল সাড়ে ৬-টায় ত্বাওয়াফের স্থানে পৌঁছে গেলাম। শুরু হ'ল ত্বাওয়াফ। নারী-পুরুষ সবাই একত্রে ঘূর্ণায়মান। কিন্তু কারোর প্রতি কারু কোন মন্দ খেয়াল নেই। কা'বা গৃহের অপার্থিব আবেদন সবাইকে নিবিষ্ট করে রেখেছে কেবল দো'আ ও তাসবীহ-তাহলীলে। সাত ত্বাওয়াফ শেষে ছাফা-মারওয়া সাঈ শুরু করলাম। তিনতলা বিশিষ্ট শীতাতপ নিয়ন্ত্রিত সাঈস্থলটির উভয়পার্শ্বে ছাফা ও মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের সামান্য অংশই বর্তমানে দেখা যায়।

সাঈ শেষে চুল ছাটার পর সকাল সাড়ে ৯-টায় হারাম থেকে বের হয়ে হোটেলে ফিরে গেলাম। অতঃপর গোসল সেরে ফ্রেশ হয়ে ঘুমিয়ে গেলাম। বাদ আছর ছোটখাটো কেনাকাটা সেরে আমরা হারামের দিকে রওয়ানা হ'লাম। হারাম শরীফের আণ্ডারগ্রাউন্ডস্থ বেজমেন্টটি মূলতঃ ই'তিকাফকারীরাই ব্যবহার করেন। সেখানে পুরু গালিচা বিছানো রয়েছে। এর উপরে মুছাল্লা বা কোন কাপড় বিছিয়ে সবাই অবস্থান করে। ভিতরে প্রবেশ করে দেখি প্রচুর ভিড়। মনে হচ্ছে কোন জায়গা আর খালি নেই। অবশেষে সাথীদের প্রচেষ্টায় একটি জায়গা পেলাম এবং একদিন আগেই সেখানে আমাদের অবস্থান শুরু হ'ল। বিশাল বেজমেন্টে হাযার হাযার মানুষ একত্রে অবস্থান করছে। অধিকাংশ কুরআন পড়ছে, কেউ ছালাত আদায় করছে, আবার কেউ প্রয়োজনীয় কথা বলছে বা দো'আ-দরূদ পড়ছে। এখানে কেউ কেউ পুরো রামাযান মাসই অবস্থান করছেন। বিভিন্ন দেশের মানুষ হওয়ায় কারো চেহারার সাথে কারো মিল নেই। তবুও ই'তিকাফকারী হিসাবে সবার মধ্যে রয়েছে সুন্দর মিল।

ই'তিকাফ চলা সত্ত্বেও আব্বুর সাথে দেখা করার জন্য প্রতিদিনই নতুন ও পুরাতন প্রবাসী ভাইয়েরা এসে সাক্ষাৎ করতেন। ১৮ই জুলাই শুক্রবার বাদ আছর জেদ্দা শাখা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি সাঈদুল ইসলাম (বি-বাড়িয়া), সহ-সভাপতি ইসহাক (সোনারগাঁ, নারায়ণগঞ্জ), সাধারণ সম্পাদক বেলাল হোসাইন (কুমিল্লা) এবং আবু তাহের ভাই (সোনারগাঁ) সহ বেশ কয়েকজন আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করেন। মাগরিব পর রিয়াদ থেকে এসে সাক্ষাৎ করেন সঊদী আরব 'আন্দোলন'-এর সভাপতি শায়খ মুশফিকুর রহমান (রাজশাহী) ও সদস্য শামসুর রহমান (টিকাপাড়া, রাজশাহী), 'আন্দোলন'-এর মক্কা শাখা সভাপতি হাসানুল ইসলাম (মাগুরা, সিনিয়র সুপারভাইজর, মক্কা হিলটন হোটেল), মক্কার ভাই আব্দুর রাযযাক (বরিশাল সদর), জসীমুদ্দীন (চাটখিল, নোয়াখালী), সাইফুল ইসলাম (ফরিদগঞ্জ, চাঁদপুর), মোহাম্মাদ সেলীম (রায়পুর, লক্ষ্মীপুর), আব্দুর রহমান (পাঁচবিবি, জয়পুরহাট), মাহফুযুর রহমান (খালিশপুর, খুলনা), আবদুল হালীম (কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা), ইয়াসীন (বরুড়া, কুমিল্লা) প্রমুখ। এদিন রাতে হাসানুল ইসলাম ভাই মাছের বিরানী খাওয়ালেন সবাইকে। সঊদী স্টাইলে প্লেট বিহীন একই দস্তরখানের উপর পুরো খাবার রেখে দিয়ে সবাই একসাথে গোল হয়ে বসে খাওয়ার প্রথম অভিজ্ঞতাটা ভালই ছিল।

হাসান ভাইয়ের জোরাজুরিতে বাধ্য হয়ে আমাদের ব্যবস্থাপক শহীদুল ইসলাম চাচাকে সন্ধ্যা রাতের খাবার না দেওয়ার অনুরোধ জানালাম। হাসান ভাই প্রতিদিন বাদ মাগরিব প্রবেশদ্বারের নানা প্রতিকূলতা অতিক্রম করে আমাদের জন্য খাবার নিয়ে আসতেন। তার নিয়ে আসা প্রতিদিনের খাবারের মধ্যে বিশেষতঃ মুরগীর স্যুপ মিশ্রিত জাউ ভাতের স্বাদ এখনও জিহ্বায় লেগে আছে। ই'তিকাফে তাঁর আন্তরিক খেদমতের কথা ভোলার মত নয়।

ভোর রাতে সাহারী নিয়ে আসতেন শহীদুল চাচা ও তাঁর সাথীবৃন্দ। আব্বুর পসন্দমত করলা ভাজি, সবজি এবং গোশত প্রতিদিনই তিনি নিজ হাতে রান্না করে আনতেন। এছাড়া দেশী মাছের ঝোল, বড় বড় সামুদ্রিক ভাজা মাছ সহ আরো অনেক কিছুই খুব যত্নের সাথে ই'তিকাফের দিনগুলিতে তিনি আমাদেরকে খাইয়েছেন। নিরহংকার সাধাসিধে এই মানুষটির স্বহস্তে রান্না করা খাবারের অসাধারণ স্বাদ, সুরসিক ব্যবহার, সর্বোপরি আমাদের প্রতি তাঁর সুতীক্ষ্ণ দায়িত্ববোধ প্রতিনিয়তই আমাদেরকে মুগ্ধ করত।

১৯শে জুলাই শনিবার বিকালে ইফতারীর কিছু আগে শহীদুল চাচা আমাদের ডাকতে আসলেন। আব্বুকে বললেন, ডা. যাকির ভাই আপনাকে সালাম দিয়েছেন এবং মাত্বাফে আপনার সাথে একত্রে ইফতার করতে আসছেন। আগে থেকেই শুনেছিলাম তিনি যমযম টাওয়ারের ২১তম তলায় সপরিবারে অবস্থান করছেন। ই'তিকাফ শেষে তাঁর সাথে আব্বুর সাক্ষাতের কথা ছিল। যাইহোক মাত্বাফে এসে দু'এক মিনিট অপেক্ষা করতেই ডা. যাকির নায়েক তাঁর ছেলে ফারিক নায়েককে নিয়ে উপস্থিত হ'লেন। সোজা এসে আব্বুর সাথে কোলাকুলি করে দীর্ঘ কুশল বিনিময় করলেন। আমার সাথেও কোলাকুলি হ'ল। তাঁর ছেলে ফারিকের সাথেও পরিচয় ও অল্প কথাবার্তা হ'ল। ইফতারের সময় সমাগত। সবাই একত্রে বসে পড়লাম। আযান হ'লে ইফতার শুরু করলাম। কা'বাগৃহের সামনে বসে ইফতারীতে যেন একটা ভিন্ন আমেজ সৃষ্টি হ'ল। পরে ছালাত আদায়ের সময়ও কেমন যেন একটা অপরিচিত স্বাদ অনুভব করছিলাম। অথচ ছালাতের ক্ষেত্রে কা'বাগৃহ

কেবলমাত্র ক্বিবলা ছাড়া কিছুই নয়। দাসত্ব পাওয়ার হকদার কেবল আল্লাহ। মূর্তি সামনে রেখে তার প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করার ক্ষেত্রেও মনে হয় একই অনুভূতি হয়। সেখানে শয়তান ধোঁকা সৃষ্টি করে এবং মূর্তিকে আল্লাহ প্রাপ্তির অসীলা মনে করে। যেটা স্পষ্ট শিরক। অন্যান্য বিষয় ছাড়াও যখন ডা. যাকির নায়েক এবং আব্বুকে পাশাপাশি পায়ে পা মিলিয়ে, সুন্দরভাবে বুকে হাত বেঁধে ও রাফ'উল ইয়াদায়েন করে পূর্ণ মনোযোগের সাথে ছালাত আদায় করতে দেখলাম, তখন মনটা খুশীতে ভরে গেল। ছালাত শেষে তাঁদের মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে কথা হ'ল। ডা. যাকির নায়েক কথার ফাঁকে 'পীস টিভি আপনার জন্য অপেক্ষা করছে' বলতেই আব্বু বললেন, 'আমি তো ভাই টিভির লোক নই'। আব্বুর কথা শুনে তিনি হেসে ফেললেন। আব্বু এ বছর পীস টিভিতে দেওবন্দী ও ব্রেলভী বক্তাদের সুযোগ দেওয়ার কারণ জানতে চাইলে তিনি বললেন, তাদের সাথে আমাদের একটা সেতুবন্ধন তৈরী করার জন্যই এটা করা হয়েছে। তবে তাদের কোন বাতিল বা ছহীহ হাদীছ বিরোধী বক্তব্য রাখা হচ্ছে না, কেটে ফেলা হয়েছে। তিনি বিদায় নেয়ার সময় সিদ্ধান্ত হ'ল যে, পরের দিনগুলিতে এই স্থানেই আমরা একত্রে ইফতার করব। সে মোতাবেক পরের দুই দিনও তিনি আসলেন এবং আমরা একত্রে ইফতার করলাম। কিন্তু তারপর থেকে আব্বুর হাঁটুর ব্যথা বৃদ্ধি পাওয়ায় আমরা আর মাত্বাফে যেতে পারিনি।

২০শে জুলাই রবিবার দুপুরে মক্কা প্রবাসী আব্দুল হালীম (কেরাণীগঞ্জ, ঢাকা) ও বারাকাত ভাই (মানিকগঞ্জ) এসে সাক্ষাৎ করলেন। কথার ফাঁকে আব্বু 'হাজারে আসওয়াদ' চুমু খাওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করলে আব্দুল হালীম ভাই বললেন, আমি তো রাতে এবং ভোরে 'হাত্বীম'-এর ভিতরেই দায়িত্ব পালন করি। হাত্বীম পর্যন্ত পৌঁছতে পারলে বাকি দায়িত্ব আমার। শুনে খুব আনন্দিত হ'লাম। মাগরিবের পর খাওয়া-দাওয়া সেরে সাড়ে ৮-টায় যথাস্থানে পৌঁছে গেলাম। ততক্ষণে হাত্বীমের চারপাশ ঘিরে এশার ছালাতের কাতার দাঁড়ানো শুরু হয়ে গেছে। ছালাতের জন্য পুলিশ 'হাজারে আসওয়াদ' চুমু দেওয়ার সুযোগও বন্ধ করে দিয়েছে। আমাদেরকে দেখে আব্দুল হালীম ভাই এগিয়ে আসলেন এবং চুমু দেওয়ার জন্য সাথে করে নিয়ে গেলেন। হাজারে আসওয়াদের পাশে কেবল আমি, আব্বু এবং আব্দুল হালীম ভাই। কেমন যেন বিস্ময়কর ঠেকছিল। কারণ প্রথমদিন এসে আব্বুকে বলছিলাম, এই ভিড়ের মধ্যে পাথরে চুমু দেওয়ার স্বপ্ন দেখে লাভ নেই। যাইহোক প্রথমে আব্বু তারপর আমি চুমু খেলাম। হাত বুলিয়ে পরখ করে দেখলাম জান্নাতী এই পাথরটি। কষ্টসাধ্য একটি বিষয় এত সহজে সম্পন্ন হয়ে যাওয়ায় আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করলাম।

২১শে জুলাই সোমবার মাগরিবের পূর্বে মাত্বাফে যাওয়ার পথে নরসিংদীর মাধবদী বাজারের ব্যবসায়ী মুছাদ্দিক ছাহেবের সাথে আমাদের সাক্ষাত হয়। তিনিও ই'তিকাফে এসেছেন। ২২শে জুলাই আমাদের ঢাকা অফিসের বাড়ীওয়ালা হাসান ভাই (অর্থ সম্পাদক, ঢাকা যেলা 'যুবসংঘ') এসে আমাদের সাথে ইফতার করলেন। তিনি তাঁর মাকে নিয়ে রামাযানের শুরু থেকেই মক্কায় অবস্থান করছিলেন। সেদিন আরো দুই ভাই বারাকাত (মানিকগঞ্জ) ও রাসেল (রায়পুরা, নরসিংদী) দেখা করতে আসলেন। তারা মক্কায় ও হারামের অনেক অজানা তথ্য আমাদের জানালেন। ২৪ তারিখ বৃহস্পতিবার বাদ যোহর মক্কা থেকে ১৭০০ কি.মি. দূরে জর্ডান সীমান্তবর্তী 'ক্বারিয়াত' (القريات) দাওয়াহ সেন্টারের দাঈ জনাব আব্দুর রাযযাক (খয়েরসূতি, পাবনা) আমাদের সাথে সাক্ষাৎ করতে আসলেন। তিনি সপরিবারে ওমরাহ করতে এসেছেন। ২০০০ সালে মদীনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র থাকাবস্থায় তিনি আব্বুকে বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলাদেশী ছাত্রদের উদ্দেশ্যে বক্তৃতা করতে দেখেছিলেন। তারপর এই প্রথম দেখা। তাঁর সেন্টারে ১৫ কপি 'আত-তাহরীক' নিয়মিত যায় বলে তিনি জানালেন।

এর মধ্যে একদিন শায়খ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদের বাঙ্গালী ড্রাইভার বেলাল ভাই শায়খের পরিবারের সদস্যদের নিয়ে ওমরাহ করতে এসে আমাদের সাথে মিলিত হ'লেন। এদিন তার কাছে শায়খের কার্যক্রম সম্পর্কে অনেক কিছু জানলাম। তিনি শায়খের বড় ছেলের হত্যাকাণ্ড এবং এ ব্যাপারে সঊদী কোর্টের বিচার সম্পর্কে চমৎকার তথ্য দিলেন। ঘটনা ছিল যে, শায়খের ছেলের সাথে তার বন্ধুর কোন বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে একপর্যায়ে ঐ বন্ধুটি তাকে ছুরিকাঘাতে হত্যা করে। পরে পুলিশ ঘাতক বন্ধুকে গ্রেফতার করে কোর্টে হাযির করে। বেলাল ভাই তার শায়খ ও তাঁর অপর দুই ছেলেকে নিয়ে কোর্টে উপস্থিত হ'লেন। উকিল বিহীন আদালতে শায়খ কাঠগড়ায় দাঁড়িয়ে তাঁর ছেলের হত্যাকারীকে ক্ষমা করে দিলেন। ইসলামী আইন মোতাবেক বাদী ক্বিছাছের পরিবর্তে বিবাদীকে ক্ষমা করে দেওয়ার অধিকার রাখে। সুতরাং বিচারকের কিছুই করার ছিল না। কিন্তু বিচারক আসামীর সংশোধনের জন্য এক বিস্ময়কর শাস্তি দিলেন। তাকে কারাগারে কুরআন হেফয করতে হবে এবং যেদিন হেফয শেষ হবে সেদিন সে মুক্তি পাবে। সব মিলিয়ে ৪০ মিনিটে সেদেশের একজন বিখ্যাত ব্যক্তির সন্তানের হত্যা মামলার সমাপ্তি ঘটলো। অথচ আজ এই সুন্দর বিচারব্যবস্থাকেই বলা হচ্ছে সেকেলে (?)। আমাদের দেশে হয়ত এরূপ একটি মামলা একদিকে ম্যাজিস্ট্রেট কোর্ট, জজকোর্ট, হাইকোর্ট, সুপ্রীম কোর্ট, আপিলবিভাগ সবমিলিয়ে ন্যূনতম ১০-১৫ বছর দীর্ঘায়িত হ'ত। অপরদিকে বাদী-বিবাদীর পকেট ছাফ হয়ে তাদের পথে বসতে হ'ত। অথবা বাদী-বিবাদী মারা যেত, মামলা শেষ হ'ত না। যেমন আমার আব্বুর বিরুদ্ধে বিগত সরকারের দেওয়া মিথ্যা মামলা শেষ হ'তে ৮ বছর ৮ মাস ২৮ দিন লাগল। তিনি বিনা বিচারে অন্যায়ভাবে ৩ বছর ৬ মাস ৬দিন কারা যন্ত্রণা ভোগ করলেন। কিন্তু মিথ্যা মামলা দায়েরকারী তৎকালীন সরকারের কোন শাস্তি হ'ল না। এটা কি ন্যায়বিচার? এভাবেই আমরা বিগত বৃটিশদের রেখে যাওয়া আইন সগর্বে

লালন করছি। কিন্তু ইসলামের আইন আমাদের কাছে অপসন্দনীয়। কতই না নির্বোধ আমরা!

২৫শে জুলাই শুক্রবার আছরের ছালাতের পূর্বে আমরা টয়লেটে গিয়েছি। ফিরে এসে দেখি আমাদের ই'তিকাফের স্থানে কয়েকজন নতুন ব্যক্তি জামা'আতে দাঁড়াচ্ছেন। আমি গিয়ে একজনকে সামনের দিকে যাওয়ার ইঙ্গিত দিতেই দেখি পাশে আমাদের মেযবান তাঁদের সাথে। বুঝলাম না ঘটনা কী। তারপর কিছু না বলে আমরা সামনের কাতারে ফাঁকা জায়গায় দাঁড়িয়ে ছালাত আদায় করলাম। সালাম ফিরানোর পর দেখি আমাদের কাংখিত পাকিস্তানী মেহমান। যার নাম জানতাম। কিন্তু দেখিনি কখনো। সেদিন সকালেই তিনি পাকিস্তান থেকে সপরিবারে মক্কায় এসেছেন। তিনি হ'লেন ইসলামাবাদ আন্তর্জাতিক ইসলামিক ইউনিভার্সিটি'র সাবেক প্রফেসর ও বর্তমানে 'আল-হুদা ইন্টারন্যাশনাল'-এর ডাইরেক্টর ড. ইদরীস যুবায়ের। যাঁর স্ত্রী একই বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক প্রফেসর ও বর্তমানে একই সেন্টারের মহিলা বিভাগের পরিচালিকা এবং পাকিস্তানের বিভিন্ন টিভি চ্যানেলের ধর্মীয় আলোচক ড. ফারহাত হাশেমী। ছেলে হিশামসহ তাঁরা ৪ জন আমাদেরকে খুঁজতে খুঁজতে অজান্তেই আমাদের স্থানটি খালি পেয়ে সেখানেই জামা'আতে দাঁড়িয়ে গেছেন। ব্যাপারটি জেনে আমরা সবাই আল্লাহ্র শুকরিয়া আদায় করলাম। একই বিছানায় আমাদের মেযবানসহ তিন মুরব্বীর তিন ছেলে মোট ছয়জন একত্রে বসলাম। সেসময় পাকিস্তানের ইসলামাবাদে তাঁর সেন্টারেই আমার বড়ভাই আহমাদ আব্দুল্লাহ ছাকিব ই'তিকাফরত ছিল। ই'তিকাফে বসার দু'দিন আগে মটরসাইকেল এ্যাক্সিডেন্টে ভাইয়ার বাম হাতের বুড়ো আঙ্গুলে ফ্র্যাকচার হয়েছিল। ওমরায় আসার দিন তিনি ঐ প্লাস্টার বাঁধা হাতসহ ভাইয়ার সাথে মোবাইলে একটা ছবি তুলেছিলেন। সেটা তিনি আমাদের দেখালেন। কথার ফাঁকে দুই হারামে অনুষ্ঠিত শেষ দশকের রাতের প্রথমভাগ ও শেষভাগ মিলে মোট ৩৩ রাক'আত রাত্রির নফল ছালাত নিয়ে কথা উঠলো। তিনি বললেন, ৮ রাক'আতই যে রাসূল (ছাঃ)-এর সুন্নাত তাতে কোন সন্দেহ নেই। কিন্তু তারপরও আমাদের মেযবান প্রতি রাক'আতে ১ লক্ষ নেকী হিসাবে ২০ লাখ নেকী থেকে বঞ্চিত হওয়ার বেদনা প্রকাশ করলে আব্বু বললেন, দেখুন সুন্নাত বহির্ভূত কোন আমলে নেকীর আশা করা ঠিক নয়। বরং সুন্নাতের অনুসরণেই নেকী নিহিত। ড. ইদরীস যুবায়েরের ছেলে হিশাম এটি সবাইকে খুশী রাখার জন্য সঊদী সরকারের একটি রাজনীতি বলে আখ্যায়িত করলেন। আরো বিভিন্ন বিষয়ে কথা বলার পর তাঁরা বিদায় নিলেন।

এছাড়া আমভাবে অনেক প্রবাসী ভাই প্রতিদিন সাক্ষাৎ করতে আসতেন। যাদের অপরিসীম আন্তরিকতা, অকৃত্রিম ভালোবাসা কখনো ভুলবার নয়। অনেকের সাথেই আব্বুর এই প্রথম সাক্ষাৎ। কিন্তু আক্বীদা ও আমলের ঐক্যের কারণে সবাই যেন দেখামাত্রই আপনজন হয়ে যাচ্ছিলেন। আক্বীদার ঐক্য যে কত গুরুত্বপূর্ণ বিষয়, বিদেশ-বিভুঁইয়ে এসে তা আরেকবার টের পেলাম। আর সবার মধ্যে বিশেষতঃ যারা সঊদী আরবে এসে আহলেহাদীছ হয়েছেন তাদের সকলের একটিই বক্তব্য 'সঊদী আরবে এসে আমরা আর কি পেয়েছি জানি না, তবে সঠিক পথ খুঁজে পেয়েছি এটাই আমাদের জীবনের সবচেয়ে বড় পাওয়া'।

মক্কা-মদীনা মুসলিম উম্মাহ্র কেন্দ্রীয় মিলনস্থল। শেষ দশকে পৃথিবীর সকল দেশের মানুষই মনে হয় এখানে জমা হয়। বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন ভাষার এসব অপরিচিত মানুষদের সাথে কথা বলতে আমার ভালো লাগত। যদিও অভ্যাস না থাকায় আরবী-ইংরেজী বলতে বেশ অসুবিধায় পড়তাম। একদিন এক নাইজেরিয়ান সরকারী অফিসারের সাথে আলাপচারিতায় তিনি তাঁর দেশের চরমপন্থী গ্রুপ বোকো হারামের কার্যক্রম নিয়ে খুবই দুঃখ প্রকাশ করলেন। এরা সে দেশে 'সালাফী' হিসাবে পরিচিত কি-না জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, এদের কোন ধর্ম নেই। এদের ধর্ম একটাই যে, এরা তাদের স্বার্থ উদ্ধারের জন্য যাকে খুশী হত্যা করবে। তিনি বললেন, সেদেশের মুসলমানরা অধিকাংশই বিশুদ্ধ আক্বীদা ও আমল সম্পন্ন। এদের অধিকাংশ মালেকী হ'লেও তাদের সাথে সালাফীদের তেমন কোন পার্থক্য নেই। কারণ তারা মাযহাবপন্থী হ'লেও কোন বিষয়ে ছহীহ হাদীছ পেলে মাযহাবী সিদ্ধান্ত পরিত্যাগ করতে দ্বিধা করে না।

আমাদের পাশেই ই'তিকাফে বসেছিলেন সঊদী আরব প্রবাসী এক মিসরী ভাই মুহাম্মাদ। তিনি ইখওয়ানের দ্বিতীয় স্তরের কর্মী। জেনারেল সিসির সাথে ইখওয়ানের সংঘাতের সময় সঊদী থেকে দেশে ফিরে গিয়ে আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। সেখানে ৩-৪টি গুলি খেয়েও বেঁচে গিয়ে আবার সঊদীতে ফিরে এসেছেন। দেশের রাজনীতি নিয়ে সবসময় চিন্তাক্লিষ্ট। দলের প্রতি খুবই একনিষ্ঠ। তিনি বললেন, মিসরীদের পড়াশুনা শুরু হয় কুরআন হেফয করার মধ্য দিয়ে। বর্তমান জামে' আযহারের অবস্থা নিয়ে অনেক দুঃখ প্রকাশ করলেন। বললেন, আযহারসহ সারা মিসরে নৈতিক অবক্ষয় বর্তমানে চরমে উঠেছে। অসামাজিক কার্যকলাপ ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়েছে। মানুষ পাপকে পাপ বলে মনে করছে না। তার একটি কথা আমার সবসময় মনে থাকবে। তা হ'ল, আজকের মিসরের অবস্থা হ'ল, 'ইলমুন কাছীর ওয়া আমালুন ক্বালীল' অর্থাৎ 'জ্ঞান প্রচুর কিন্তু আমল অল্প'। মনে হয় কথাটি কেবল মিসর নয়, সকল দেশের জন্য প্রযোজ্য। তিনি বললেন, নীতিভ্রষ্টতার কারণে আমরা মিসরে 'হিযবুন নূর' নামে রাজনীতিতে নতুন যোগদানকারী সালাফী দলটিকে 'হিযবুয ঝুর' তথা 'মিথ্যার দল' হিসাবে আখ্যায়িত করে থাকি। তিনি গণতান্ত্রিক রাজনীতির বিরোধিতা করলেও এটা কেবল ক্ষমতায় যাওয়ার মাধ্যম বলে আখ্যায়িত করলেন এবং বললেন, ক্ষমতায় গিয়ে আমাদের দল এ পদ্ধতি বাতিল করে দেবে। উত্তরে আমি বললাম, 'অবৈধ পথে কোন বৈধ কাজ উদ্ধার হয় কি'? জবাবে তিনি চুপ থাকলেন।

হারাম শরীফে অবস্থানরত মুছল্লীদের দেখে একটা বিশেষ অনুভূতি হ'ল যে, এটা এমন একটা স্থান, যেখানে ধনী-গরীব, দেশী-বিদেশী সবাই সমান হয়ে যায়। সবাই একই পোষাকে

Contents

ত্বাওয়াফ-সাঈ করে। সবাই একইসাথে বসে ই'তিকাফরত। সবাই সবার জন্য ত্যাগ স্বীকারে ব্যস্ত। কে কাকে কত সাহায্য করতে পারে, কে কাকে কত খাওয়াতে পারে সেই প্রতিযোগিতা সর্বত্র। কেউ খেজুর দিচ্ছে, কেউ নির্দিষ্ট স্থান থেকে যমযম পানি এনে সকলের মাঝে বিতরণ করছে, কেউবা শরবত বিতরণ করছে। কেউ টিস্যু বক্স নিয়ে এগিয়ে আসছে। আর ইফতার ও সাহারী পরস্পরকে খাওয়ানোর জন্য রীতিমত প্রতিযোগিতা বৈ-কি! সবার মাঝে কেবল নেকী অর্জনের প্রচেষ্টা। প্রচুর ভিড় ঠেকাতে ও শৃংখলা রাখতে পুলিশের বিভিন্ন বাধা-নিষেধ সত্ত্বেও কেউ ক্ষিপ্ত হচ্ছে না। হারামে মাক্কীর পূত-পবিত্রতার প্রভাবে সবার রাগ যেন পানি হয়ে গেছে। ইলেকট্রনিক বিল-বোর্ডে বারবার ভেসে উঠছে রাসূল (ছাঃ)-এর হাদীছ لَا تَغْضَبْ 'ক্রুদ্ধ হয়ো না'। মুমিনের জন্য এই একটি হাদীছই যথেষ্ট। ভাবছিলাম, এরূপ নেকী অর্জনের প্রতিযোগিতা এবং গোনাহ থেকে বাঁচার ঐকান্তিক প্রচেষ্টা যদি আমরা সর্বদা ধরে রাখতে পারতাম!

হারামে সবচেয়ে বেশী ভীড় হয় রামাযানের ২৭ ও ২৯-এর রাত্রে। আর শেষ দশকের জুম'আর ছালাতগুলিতে। এই দুই ক্বদরের রাত্রিতে পুরো হারাম এলাকা সহ আশপাশে সব জায়গা ভর্তি হয়ে যায়। লাখো মানুষের জামা'আতবদ্ধ ইবাদত। সাথে শায়খ সুদাইসীর শ্রুতিমধুর হৃদয়গ্রাহী তেলাওয়াত। সব মিলিয়ে এক ভিন্ন আবহ সৃষ্টি হয়।

মক্কায় প্রথম দিন এসেই বুঝতে পেরেছিলাম যে এখানকার বাতাসে জলীয় বাষ্প কম থাকায় প্রচণ্ড গরমেও ঘাম হয় না। এছাড়া প্রতিদিন গোসল সেরে কাপড় শুকানোও ছিল খুবই সহজ। কোথায় ১০ মিনিট কাপড় মেলে রাখলেই মোটামুটি শুকিয়ে যেত। আকাশে মেঘের উপস্থিতি নেই বললেই চলে। তবে ২৮ রামাযান বিকালে দেখি কিছু মেঘ এসে ডাকাডাকি শুরু করেছে। তারপর ইফতারের ৫ মিনিট পূর্ব থেকে মাগরিবের ছালাত শেষ হওয়া পর্যন্ত বৃষ্টি হ'ল। মাগরিবের পর বাইরে গিয়ে দেখি মানুষের পায়ের ময়লায় কাদা কাদা ভাব হয়ে যাওয়া চত্বর পরিষ্কার করার জন্য হাযারো পরিচ্ছন্নতাকর্মীতে ভরে গেছে হারাম এলাকা। ৫-১০ মিনিটের মধ্যে পুরো এলাকা আবার ঝকঝকে হয়ে গেল।

হারামের নীচে এই বেজমেন্টে গত তিন বছর যাবৎ ই'তিকাফকারীদের জন্য পৃথক ব্যবস্থা করা হয়েছে। শীতাতপ নিয়ন্ত্রণ যন্ত্র সর্বদা চালু থাকায় ঠাণ্ডার আধিক্য আমাদের জন্য কিছুটা কষ্টকর মনে হচ্ছিল। প্রথম দিকে কিছুটা অসুস্থই হয়ে পড়েছিলাম। আব্বুর পায়ের ব্যথা বৃদ্ধি পেয়েছিল। বেজমেন্টে মোবাইল নেটওয়ার্ক নেই। এটা ভাল দিক। তাতে নিরিবিলি ইবাদতে সুবিধা হয়। যদিও দেশ-বিদেশের যোগাযোগকারীরা বিব্রত হন।

হারাম কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনা সত্যিই প্রশংসনীয়। পুরো হারামে শত শত স্থানে শীতল যমযম পানি খাওয়ার ব্যবস্থা আছে। ভাবতাম হায়! যে পানি দেশে এক ঢোক খাওয়ার জন্য বিশেষ প্রত্যাশী থাকতাম। আজ এত সহজে তা হাতের নাগালে পেয়ে যাচ্ছি!

সারাদিন হাযার হাযার পরিচ্ছন্নতাকর্মী নিরবচ্ছিন্ন কাজ করে যাচ্ছে। ফলে লাখো মানুষের পদচারণাতেও ময়লার কোন চিহ্ন খুঁজে পাওয়া যায় না। মুছল্লীদের জন্য হাযার হাযার টয়লেটের ব্যবস্থা থাকায় প্রাকৃতিক কর্ম সারতে তেমন কোন অসুবিধা হয় না। বিশালায়তন হারামের খোলা চত্বর প্রবল সূর্যতাপেও গরম হয় না। পরে জানলাম এখানে শ্বেত পাথরের দীর্ঘ টাইলসগুলি বিশেষ পদ্ধতিতে নিজস্ব কারখানায় অনেক মোটা করে নির্মিত। ফলে তা সহজে গরম হয় না।

পুরো হারামে হাযার হাযার তরুণ নিরাপত্তাকর্মী ব্যবস্থাপনার দায়িত্ব পালন করছে। বিশেষ প্রশিক্ষণপ্রাপ্ত হওয়ায় সুন্দর আচরণের মাধ্যমে আইন-শৃংখলা রক্ষায় তাদের প্রত্যুৎপন্নমতিত্ব চোখে পড়ার মত। যদিও ভিড় বেড়ে গেলে তাদের বিভিন্ন প্রতিবন্ধকতা মনোকষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়াতো। ২৭শে রামাযান তারাবীহ ছালাতের সময় ভিড় হওয়ায় মাত্বাফে একজন মহিলাকে দেখলাম অজ্ঞান হয়ে পড়ে যেতে। সর্বোচ্চ ৩০ সেকেণ্ডের মধ্যেই অক্সিজেন ও হুইল চেয়ার সমৃদ্ধ বিশেষ বাহিনীর সদস্যরা ঝড়ের বেগে ছুটে আসলো এবং তাকে নিয়ে হাসপাতালে চলে গেল।

অস্বস্তিকর লেগেছে তারাবীহ ও তাহাজ্জুদ একই রাতে পড়ানোটা। যা কখনো রাসূল (ছাঃ) পড়েননি। যদিও মুকাব্বিরের ঘোষণায় দু'রাতেই 'ক্বিয়ামুল লাইল' বলা হয়েছে। তারাবীহ শায়খ আব্দুল্লাহ আওয়াদ আল-জুহানী এবং অন্য একজন ইমাম ১০+১০ করে পড়াতেন। তাহাজ্জুদ প্রথম ৬ রাক'আত শায়খ সঊদ আশ-শুরাইম এবং শেষ চার ও তিন রাক'আত বিতর শায়খ আব্দুর রহমান আস-সুদাইস পড়াতেন। তিন রাক'আত বিতরের দু'রাক'আতে সালাম ফিরাতেন এবং এক রাক'আত পৃথকভাবে পড়তেন। এটাও একটা জায়েয পদ্ধতি। যদিও এক সালামে ও এক বৈঠকে তিন রাক'আত পড়াই উত্তম। বিতরের কুনূত বিশ মিনিট ধরে হ'ত। শেষ দিনে ২৫ মিনিট হ'ল। কান্নার স্বরে শায়খ সুদাইসের কুনূত পড়াটা অপূর্ব। যারা অর্থ বুঝেন তাদের নিকট অনন্য। বিশেষ করে গাযা, সিরিয়া, ইরাক, মিয়ানমার এবং অন্যান্য দেশের নির্যাতিত মুসলমানদের জন্য আল্লাহ্র নিকটে তাঁর প্রাণ উজাড় করা কণ্ঠের আকুল প্রার্থনা যে কোন কঠিন হৃদয়ের মানুষের চোখেও অশ্রুর বান ডেকে আনে। আমরা প্রথম দু'রাত তারাবীহ্র সময় শুয়ে শুয়ে কেবল ক্বিরাআত শুনেছি। পরের অধিকাংশ রাতে তারাবীহ্র সময় তাওয়াফ করেছি ও তেলাওয়াত শুনেছি। ফলে আমাদের দেখাদেখি অনেকে একই পন্থা অবলম্বন করেন। মদীনার হারামেও একই অবস্থা। অথচ হারামের বাইরে অন্যান্য সকল মসজিদে বিতর সহ ১১ রাক'আতই তারাবীহ পড়া হয়। এ বিষয়ে এখানকার শায়খদের কাছে প্রশ্ন করলে অনেকেই শৈথিল্য দেখান। এ ব্যাপারে 'সকলের মনরক্ষা নীতি' কাজ করছে বলে মনে হ'ল। মজার ব্যাপার হ'ল, ১১ রাক'আতই যে সর্বোত্তম এ বিষয়ে কোন শায়খেরই দ্বিমত নেই। প্রশ্ন হ'ল, উত্তমটি ছেড়ে তাহ'লে

Contents

কেন বছরের পর বছর ধরে 'অনুত্তম' আমলটি বহাল রাখা হয়েছে? এর ফলে বহু দ্বীনদার মুমিন ধোঁকায় পড়ে যাচ্ছেন এবং ছহীহ-শুদ্ধ আমল থেকে দূরে থাকছেন।

প্রতি ছালাতের শেষে মুকাব্বিরের কণ্ঠে ভেসে ওঠে আছছালাতু 'আলাল আমওয়াত (মৃতদের উপর জানাযার ছালাত)। এতে প্রতি ওয়াক্তেই মুছল্লীদের মধ্যে মৃত্যুর ভয় জাগ্রত হয়। একই নিয়ম পরে দেখলাম মদীনার হারাম সহ বিশেষ বিশেষ মসজিদে।

ইফতারের প্রাক্কালে অনেককে দাঁড়িয়ে বা বসে কা'বা গৃহের দিকে ফিরে হাত তুলে দো'আ করতে দেখলাম। অথচ ইফতারের সময় দো'আ কবুল হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি যঈফ। বরং ছায়েমের দো'আ সবসময় কবুল হয় মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। এছাড়া দো'আ হবে কেবল আল্লাহ্‌র সমীপে, কা'বা গৃহকে লক্ষ্য করে নয়। অনেকে বসা অবস্থায় দু'হাত দু'হাঁটুর উপরে ফেলে রেখে দো'আ করছেন। অথচ একাকী দো'আ করার পদ্ধতি হ'ল, খোলা দু'হস্ততালু একত্রিত করে চেহারা বরাবর সামনে রেখে দো'আ করা। দেখলাম কেউ বুকে হাত না বেঁধে হাতের আঙ্গুলের উপর আঙ্গুল রেখে বুকে হাত রেখে ছালাত আদায় করছেন, কেউবা হাত ছেড়ে আদায় করছেন। একজনকে দেখলাম সিজদা দেওয়ার সময় হাতে থাকা মাটির চাকতি মাটিতে রেখে তার উপর সিজদা দিচ্ছেন। শুনলাম এরা শী'আ। এরা কারবালার মাটিকেই কেবল পবিত্রজ্ঞান করে। সেকারণ যেখানেই ছালাত আদায় করে সেখানেই এই মাটির উপর তারা সিজদা করে। এরূপ বহু রকমের ছালাতের দৃশ্য চোখে পড়লো। আব্বু বলছিলেন, হারাম শরীফ একটা চিড়িয়াখানার মত। এখানে ৭৩ ফের্কার লোক ছালাত আদায় করে'। সারা বিশ্বের সকল মতের মুসলমানের মিলনস্থল হওয়ায় বিচিত্র সব আমল এখানে দেখা যায়।

২৭ তারিখ রবিবার। ই'তিকাফের শেষ দিন। বিদায়ের প্রস্তুতি মনে মনে শুরু হয়ে গেছে। আজ সন্ধ্যায় চাঁদ দেখা গেলে আগামী কাল ঈদ। হারামে ঈদের ছালাত আদায় করব। তাই ভিতরে চাপা উত্তেজনা বিরাজ করছে। যদিও ই'তিকাফে অবস্থানরত অন্যান্য ভাইদের মাঝে ঈদ নিয়ে কোন বিশেষ আনন্দ বা বিদায়ের প্রস্তুতি লক্ষ্য করা গেল না। জানতে পারলাম যে, চাঁদ উঠলো কি-না তা নিয়েও হারামে অবস্থানরত ভাইদের মাঝে কোন আগ্রহ থাকে না। এর কারণ সম্ভবতঃ এখান থেকে কেউ চলে যেতে চায় না। ফলে যেদিন বাদ এশা তারাবীহ্‌র ছালাত অনুষ্ঠিত হয় না, সেদিন সকলে বুঝতে পারেন আগামীকাল ঈদ। সারাদিন ২-৩ জন ভাইয়ের গমনাগমনের পর বাদ আছর আমাদের সাথে সফরসঙ্গী হওয়ার জন্য রিয়াদ থেকে আসলেন 'আন্দোলন'-এর সঊদী আরব শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক আব্দুল বারী (রাজশাহী) এবং রিয়াদের ছানা'আহ জাদীদাহ-ক শাখার সভাপতি ইমরান হোসায়েন মোল্লা (নবীনগর, বি-বাড়িয়া) ও শাহজাহান (চান্দনাইশ, চট্টগাম) কর্মপরিষদ সদস্য, হারা শাখা। একটু পরে আসলেন জেদ্দা সভাপতি সাঈদুল ইসলাম ভাই। ইফতারের কিছু পূর্বে আসলেন মক্কা থেকে প্রায় ১৬০০ কি.মি. দূরে অবস্থিত 'আন্দোলন' আল-খাফজী শাখার সাংগঠনিক সম্পাদক শামীম (শরীয়তপুর), অর্থ সম্পাদক শহীদুল ইসলাম (বরিশাল) সমাজ কল্যাণ সম্পাদক আল-আমীন (বি-বাড়িয়া), সদস্য হাফেয সায়ফুল্লাহ (ঐ), হাফেয আব্দুছ ছামাদ (ঐ) প্রমুখ। সবাই মিলে একত্রে শেষ ইফতার করলাম। এরপর এশা পর্যন্ত আরও এলেন দাম্মাম থেকে হাবীব (বি-বাড়িয়া), যিনি নওদাপাড়াস্থ কেন্দ্রীয় মারকাযের পাশে জমি কিনেছেন স্থায়ীভাবে বসবাসের জন্য। এছাড়া এলেন বারাকাত, আব্দুল আযীয (রাজবাড়ী) প্রমুখ ভাইয়েরা। মাগরিবের কিছু পরে মোবাইলে নতুন চন্দ্রোদয়ের সংবাদ জানতে পারলাম। বেশ আনন্দিত হলেও বিদায় সর্বদাই কষ্টদায়ক। এশা পর্যন্ত দীর্ঘ আলোচনার পর বাদ এশা বিদায়ের সময় মনটা যেন কেমন আনচান করছিল। দশদিন এক স্থানে একপরিবারের ন্যায় সবাই একত্রে কাটালে স্বভাবতঃই একটা মায়া পড়ে যায়। আশপাশের মিসরী, পাকিস্তানী, আফগানী, সঊদী সহ বিভিন্ন দেশী ভাইদের সাথে বিদায়ী মোলাকাতকালে সেটা হাড়ে হাড়ে টের পেলাম। গত ২০ বছর যাবৎ হারামে ই'তিকাফকারী লণ্ডনপ্রবাসী শামসুদ্দীন আহমাদ (৫০) (জুড়ী, মৌলভীবাজার) এদিন সকালে 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইটি আমাদের কাছ থেকে নিয়েছিলেন। বিদায়ের সময় সেটি নিয়ে যাওয়ার জোর দাবী জানালেন। আব্বু তাতে স্বহস্তে 'সৌজন্য কপি' লিখে স্বাক্ষর করে দিলেন। উনি খুব খুশী হ'লেন।

এদিন বাদ মাগরিব আমাদের জেদ্দায় শায়খ ছালেহ আল-মুনাজ্জিদের সাথে নির্ধারিত বৈঠক ছিল। কিন্তু হঠাৎ গাড়ী দুর্ঘটনায় তাঁর ভাতিজার মৃত্যু কারণে তিনি ঐদিনই রিয়াদ গমন করায় বৈঠকটি বাতিল হয়ে যায়। উনার ড্রাইভার বেলাল ভাই আমাদেরকে এ দুঃসংবাদটি জানালেন।

এশার পর ই'তিকাফস্থল ধীরে ধীরে ফাঁকা হয়ে যেতে লাগল। আমরাও একসময় বিদায়ের পথ ধরলাম। কর্মী ভাইদেরকে নিয়ে রাত সাড়ে ১০-টার দিকে শহীদুল চাচার হোটেলে গিয়ে উঠলাম। তিনি আমাদের দু'জনের জন্য সার্বিক ব্যবস্থা করে রাখলেও সাথে আরো ১১ জন দেখে তাৎক্ষণাৎ রান্না শুরু করলেন। বড় একটি রুমে সবাই একত্রে বসলাম। আব্বু সবাইকে লক্ষ্য করে দীর্ঘ আলোচনা পেশ করলেন। খাফজীর ভাইদের ভালোবাসা, আন্তরিকতা ও ত্যাগী মনোভাব আমাদেরকে অনুপ্রাণিত করল। রাত ১২টার পর শহীদুল চাচা খাবার নিয়ে হাযির হ'লেন। সঊদী আরবে এসে প্রথম আলুভর্তা ও ডাল দিয়ে ভাত খেলাম। প্রবাসী ভাইয়েরাও চমৎকার স্বাদের এই খাবার খেয়ে খুশী হ'লেন। এরপর সবাই নিজ নিজ হোটেলে ফিরে গেলেন। আব্বু, আমি এবং সাঈদুল ইসলাম ভাই একরুমে শুয়ে পড়লাম। ঘুম যেন আসতেই চায় না। কারণ পরের দিন পৃথিবীর সর্ববৃহৎ ঈদের জামা'আতে আগামীকাল ঈদের ছালাত আদায় করব। ভিতরে ভিন্ন ধরনের আমেজ কাজ করছিল। ঘণ্টাখানেক এসব চিন্তা-ভাবনা করতে করতে একসময় ঘুমের কোলে ঢলে পড়লাম। *(ক্রমশঃ)*

Contents

হকের পথে যত বাধা

(১৭) 'তোমাকে সঊদী আরবের ভূতে ধরেছে'

আমি নূরুল ইসলাম, পিতা- মৃত আবুল হোসেন। আমি রাজশাহী বিভাগের নাটোর যেলার গুরুদাসপুর থানাধীন ধাদুয়া গ্রামের সন্তান। ২০০৫ সালে আমি সঊদী আরবে এসেছিলাম। একদিন আমি দাম্মাম যেলার জুবাইলের অন্তর্ভুক্ত এক মসজিদে গেলাম ছালাত আদায় করতে। দেখলাম তারা ছালাত আদায় করে আমাদের দেশের চেয়ে ভিন্ন পদ্ধতিতে। তারা বুকের উপরে হাত বাঁধে। দুই হাত উত্তোলন করে। ইমাম ছাহেব সূরা ফাতিহা পড়ার পর জোরে আমীন বলে। আমি অবাক হ'লাম এই ভেবে যে, কুরআন এক, রাসূল এক, অথচ ছালাতের মধ্যে কেন এত পার্থক্য? এরপর থেকে ছালাত আদায় করতে গেলে মনে সন্দেহ জাগে। এরকম চলতে থাকে। একদিন ছালাত শেষে দেখলাম, কিছু লোক মসজিদের এক কোণে বসে আছে। তাদের মধ্যে একজন কুরআন ও হাদীছ থেকে আলোচনা করছে। এক পর্যায় সে বলছিল নবী করীম (ছাঃ) মাটির তৈরী। একথা আমি মানতে পারছিলাম না। কারণ সারা জীবন শুনেছি এবং কাছাছুল আম্বিয়া পড়েছি। তাতে লেখা ছিল নবী নূরের তৈরী। অথচ এরা বলছে, নবী মাটির তৈরী। তাদের নিকট গিয়ে জিজ্ঞেস করলাম, নবী যে মাটির তৈরী তার প্রমাণ কি? তারা আমাকে কুরআন খুলে সূরা কাহফের ১১০ নম্বর আয়াত দেখালেন। তা দেখে আমি একদম চুপ হয়ে গেলাম। মনে মনে ভাবতে লাগলাম, সারা জীবন কি তাহ'লে ভুলের মধ্যে ছিলাম? ঐ মুহূর্তে তারা সকলেই আমাকে মজলিসে আসার জন্য আহ্বান জানালেন। তখন থেকে আমি ঐ মজলিসে নিয়মিত বসি। কিছু দিন যাওয়ার পর আমি ছহীহ বুখারীর ১ম খণ্ড পড়তে লাগলাম এবং রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর ছালাতের পদ্ধতি লক্ষ্য করলাম। রাসূল (ছাঃ) বুকে হাত বাঁধতেন, রাফউল ইদায়েন করতেন, জোরে আমীন বলতেন। এগুলো দেখে আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর পদ্ধতিতে ছালাত আদায় করতে শুরু করি।

এর কিছু দিন পর আমি ছুটিতে দেশে আসার প্রস্তুতি নিলাম। তখন ঐ সকল ভাইয়েরা আমাকে ভাল করে নছীহত করলেন যে, দেশে যাওয়ার পর দাওয়াতী কাজ করবেন। যতটুকু হক জেনেছেন, ততটুকু প্রচার করবেন। আমি বাড়ীতে গিয়ে ছালাত আদায় করতে মসজিদে গেলাম। মসজিদে ছালাত আদায়ের জন্য দাঁড়ালাম, লোকেরা আমার দিকে তাকিয়ে থাকল। ছালাত শেষ হ'লে তারা বলতে লাগল, নূরুল তুমি এরকম ছালাত কেন পড়? আমি বললাম, মক্কা-মদীনার লোকেরা এভাবেই ছালাত আদায় করে। তারা বলল, আগে তারা মুশরিক ছিল। এজন্য রাসূল (ছাঃ) ছালাতে রাফউল ইদায়েন করতেন। কারণ তাদের বগলের নিচে পুতুল রাখত। আর রাফউল ইয়াদায়েন করলে তা পড়ে যেত।

এভাবে তারা আমাকে অনেক কিছু বলল। তাদের কথায় কান না দিয়ে আমি আমার মতে চলতে থাকি। কিন্তু এভাবে চলে আমি সন্তুষ্ট ছিলাম না। কারণ হক জানি, কিন্তু প্রচার করতে পারছি না। আমি সর্বপ্রথম আমার বন্ধু ইখলাছকে দাওয়াত দিলাম। সে দাওয়াত কবুল করল। সে বলল, আচ্ছা তুমি যেভাবে ছালাত আদায় কর, সেভাবে কি মক্কা-মদীনায় ছালাত আদায় করে। আমি বললাম, হ্যাঁ। তারপর আমরা দু'জনে মিলে ভাবতে থাকি, কিভাবে সঠিক দ্বীন প্রচার করা যায়। আমরা আব্দুল আউয়াল নামের এক জন লোককে দাওয়াত দিলাম, সে আমাদের কথা অতি সহজে মেনে নিল। কারণ তার শ্বশুররা ছিল আহলেহাদীছ। যখন আব্দুল আউয়াল আমাদের দাওয়াত কবুল করলেন তখন আমরা জোরেসোরে দাওয়াত দিতে লাগলাম। আমাদের দাওয়াতের কাজ অতি সহজ হয়ে গেল। মানুষ ধীরে ধীরে ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করতে লাগল। এভাবে অনেকে যখন ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করল তখন এলাকার মানুষ ঠাট্টা-বিদ্রূপ শুরু করে দিল। তারা বলতে লাগল, নূরুলের কথা যদি সঠিক হয়, তাহ'লে আমাদের হাফেয ছাহেব কেন বলে না? আমি হাফেয ছাহেবের কাছে গিয়ে বললাম, ভাই আমি তো আপনাকে অনেক কিতাব দিয়েছিলাম; ছহীহ বুখারী, কুরআনুল কারীম ও ফাতাওয়া আরকানুল ইসলাম। আপনি এগুলো পড়ে কি বুঝতে পারলেন? তিনি আমাকে বললেন, আমাকে কিছু দিন সময় দিন, আমার উস্তাদের কাছে জানতে হবে। তিনি উস্তাদের কাছে গেলেন। সেখান থেকে আসার পর দেখি, আছরের ছালাতে তিনি রাফউল ইয়াদায়েন করলেন। আমি জিজ্ঞেস করলাম, উস্তাদের কাছে গিয়ে কি বুঝতে পারলেন? তিনি বললেন, ছহীহ হাদীছ মতে আপনারাই সঠিক। আমি বললাম, যদি আমরাই সঠিক হই, তাহ'লে আপনি সকলের সামনে এই বিষয়টা উপস্থাপন করুন। উত্তরে তিনি আমাকে বললেন, আমার কথা কি জনগণ মানবে? আমি বললাম, কেউ মানবে না বলে কি হকের প্রচার করবেন না? এরপর তিনি আমার পরামর্শ অনুসারে রাসূল (ছাঃ)-এর আনুগত্য সম্পর্কে জুম'আর দিন খুৎবায় আলোচনা করলেন। শেষে বললেন, ছালাতের শুরুতে মুখে নিয়ত পড়বেন না, অন্তরে নিয়ত করতে হবে এবং বুকে হাত বাঁধতে হবে। রাফউল ইয়াদায়েন করতে হবে এবং জোরে আমীন বলতে হবে। ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে। পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাঁড়াতে হবে। একথা বলে বক্তব্য শেষ করলেন। মুছল্লীরা তখন ইমাম ছাহেবকে বলতে লাগল, আপনি একথা আগে বলেননি কেন? এগুলো সব সঊদী আরবের হাদীছ। এগুলো পড়লে ঈমান নষ্ট হয়ে যাবে। ইমাম ছাহেব বললেন, এগুলো ছহীহ হাদীছের কথা। জনগণ বলল, আগে কেন বলেননি? তিনি বললেন, আমার কাছে বড় কোন ছহীহ কিতাব ছিল না। এ সময় দাঁড়িয়ে গেল মসজিদের সেক্রেটারী, তিনি আমার বড় ভাই। তিনি বললেন, আমি পাঁচ বছর সঊদী আরবে ছিলাম। কিন্তু এই নূরুল যা বলে তা আমি কখনো শুনিনি বা দেখিনি। ঐ মুহূর্তে আমি চুপ হয়ে গেলাম। কারণ তখন আমি কিছু বললে ঝগড়া হওয়ার সমূহ সম্ভাবনা ছিল। এই ঘটনার পর ইমাম ছাহেব অনেকটা মনঃক্ষুণ্ণ হ'লেন। আমি তাকে বললাম, ইমাম ছাহেব! চলুন এলাকাবাসীদেরকে নিয়ে আমরা বড় আলেমের কাছে যাই। আমাদের এলাকা থেকে ইমাম ছাহেব সহ ৭ জন লোক নিয়ে বড় আলেমের কাছে গেলাম। আলেমের নাম ছিল ইছামুদ্দীন। তিনি জিজ্ঞেস করলেন, কেন এসেছেন? আমি বললাম, আমরা দ্বীনের ব্যাপারে কিছু জানতে এসেছি। তিনি বললেন, কোন বিষয়ে? আমি বললাম, ইমামের পিছনে সূরা ফাতিহা পড়া, রাফউল ইয়াদায়েন করা ও জোরে আমীন বলা যাবে কি-না? তিনি উত্তরে বললেন,

Contents

না, পড়তে হবে না। আমি বললাম, বুখারীর ৭৫৬নং হাদীছে রাসূলুল্লাহ বলেছেন, 'যে ব্যক্তি ছালাতে সূরা ফাতিহা পড়ল না, তার ছালাত হবে না'। তিনি বললেন, তোমরা কি শুধু বুখারীই বুঝ আর কিছু বুঝ না? আমি জিজ্ঞেস করলাম, শবেবরাত ও মীলাদ পড়া কি ঠিক? তিনি বললেন, এটা বিদ'আত। তারপর আমি মাযহাব সম্পর্কে একটি প্রশ্ন করলাম যে, মাযহাব মানা কি ফরয? এরপর আমি জিজ্ঞেস করলাম, মাযহাব মানা যে ফরয এর দলীল কি? তখন তিনি ক্ষেপে গিয়ে বললেন, এই ছেলে তুমি কি কর?

আমি বললাম, সঊদী আরবে থাকি। তখন তিনি বললেন, আচ্ছা তোমাকে সঊদী আরবের ভূতে ধরেছে। আর এ কারণেই গ্রামবাসীদের বিভ্রান্ত করছ? তখন আমার সাথে যারা গিয়েছিল তারা বলতে লাগল, বুঝতে পেরেছি মাওলানা ছাহেব, আর বলতে হবে না। এখন মাগরিবের ছালাত আদায় করে নেই। ছালাত শেষে অনেক মুছল্লী বলতে লাগল, কি ব্যাপার ইমাম ছাহেব এত মানুষ কেন? তিনি বললেন, এই ছেলেটাকে সঊদী আরবের ভূতে ধরেছে। তাই সে এলাকাবাসীকে বিভ্রান্ত করে নিয়ে এসেছে। ফলে ঐ গ্রামবাসী আমার উপর ক্ষিপ্ত হয়ে গেল। এ অবস্থা দেখে আমি কিছুটা ভীত হয়ে পড়লাম। তাই দ্রুত চলে আসলাম। লক্ষ্য করলাম, আমার গ্রামের অবস্থাও খুব ভাল না। আমার ছুটিও শেষ হয়ে গেল। আমার সাথীদেরকে বললাম যে, সবকিছুই তো দেখলে। কোন মানুষের কথা চলবে না। সর্বদা কুরআন ও ছহীহ হাদীছ মেনে চলবে। এ বলে চলে আসলাম সঊদী আরবের মক্কা নগরীতে। মনের মধ্যে একটি ব্যথা ছিল যে, আমি না হয় ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করেছি। কিন্তু এলাকার অন্য ছেলে-মেয়েদের কি হবে? এ ভেবে আমি ফোন করলাম আমার উস্তাদ আব্দুর রব আফফানের কাছে। জানতে চাইলাম ছহীহ আক্বীদার মাদরাসা কি কোথাও আছে? তিনি বললেন, ঢাকায় ও রাজশাহীতে আছে। তিনি বিস্তারিত জানার জন্য ফোন নম্বর দিলেন পাবনার সোহরাব ভাইয়ের। তার কাছে ফোন করে বিস্তারিত জানতে পারলাম। তখন আমার ছেলেকে নওদাপাড়া মাদরাসায় ভর্তি করে দিলাম।

আমিও মক্কা থেকে চলে আসলাম জেদ্দায়। আর এখানে এসে দেখি যে, মসজিদের এক কোণে আমাদের দ্বীনি ভাই প্রায় ৯০ থেকে ১০০ জনের মত। এর কিছু দিন পর আমরা কিছু দ্বীনি ভাই একটি বাস নিয়ে মদীনায় গেলাম। মদীনায় জুম'আর ছালাত আদায় করলাম। এখানেও হাযার হাযার মুছল্লীকে দেখলাম ছহীহ হাদীছ মোতাবেক ছালাত আদায় করতে। তারাও বুকের উপরে হাত বাঁধা, রাফঊল ইয়াদায়েন, সূরা ফাতিহা পাঠ এবং জোরে আমীন বলা ইত্যাদি আমল করছে। ঐ দিকে আমি বাড়িতে ফোন করে জানতে পারলাম যে, আমাদের এলাকার আরও কিছু লোক ছহীহ আক্বীদা গ্রহণ করেছে। আর তারা যখন ছালাতে জোরে আমীন বলে এলাকার মুছল্লীরা বিরক্তিবোধ করে। এমনকি তারা বলে যদি তোমরা রাফঊল ইয়াদায়েন কর, জোরে আমীন বল তাহ'লে হাত-পা ভেঙ্গে দিব। এই বলে মসজিদ থেকে বের করে দেয়। আমি ফোন করে বললাম, তোমরা ধৈর্য ধারণ কর।

আমি দ্বীনি ভাইদেরকে বিস্তারিত বিষয় জানালাম। তারা আমাকে বললেন, ধৈর্য ধারণ করুন। কারণ হকের প্রচার করতে গেলে অনেক বাধা আসে। এর কিছু দিন পর শায়েখ আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ ও মুযাফফর বিন মহসিন এবং আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈলকে দাওয়াত করা হ'ল। তারা মূল্যবান বক্তব্য রাখলেন। বক্তব্য শেষে আমি এলাকার সমস্যার কথা জানালাম। শুনে ওনারা আমাকে ধৈর্য ধারণ করার উপদেশ দিলেন। আর বললেন, যে কোন সমস্যা হ'লে আমাদেরকে বলবেন, আমরা সাহায্য-সহযোগিতা করব ইনশআল্লাহ।

পরবর্তীতে বাড়ীতে ফোন করে জানতে পারলাম যে, আমাদের দ্বীনি ভাইয়েরা বাড়ীতে ছালাত আদায় করে। আমরা একটি জায়গা কিনে সেখানে একটি মসজিদ করতে যাচ্ছি। আমরা মসজিদ বানানোর চেষ্টা করছি এলাকার মানুষ শুনে খুবই ক্ষিপ্ত হ'ল। একদিন আমাদের এক ভাইকে (ইখলাছকে) এলাকার লোকেরা রাতে বাড়ী থেকে ডেকে স্থানীয় মাদরাসার মাঠে নিয়ে গেল। সেখানে পূর্ব থেকে সমবেত বহু মানুষ তাকে মারতে উদ্যত হ'ল। বিভিন্ন জন বিভিন্ন রকমের কথা বলতে লাগল। কেউ বলতে লাগল, তুমি কি মুফতী না বড় মাওলানা? তুমি নাকি ফৎওয়া দাও যে, আমরা ভ্রান্ত তোমরা সঠিক? তুমি নাকি বল, আমরা মাযহাব মানি আর তোমরা মাযহাব মানো না? এসব বলে তাকে অনেক গালমন্দ করতে লাগল। এরপর তারা বলল, যা করছ তা ছেড়ে দিয়ে বাপ-দাদা যেভাবে ছালাত আদায় করেছে, সেভাবে ছালাত আদায় কর। কিন্তু সে সেভাবে ছালাত আদায় করতে অস্বীকার করল। ফলে জনগণ তাকে মারার জন্য এগিয়ে আসল। সে পরিস্থিতির শিকার হয়ে বলল, আমি আর কখনও জোরে আমীন বলব না, রাফঊল ইয়াদায়েন করব না, বুকে হাত বাঁধব না। এই বলে, সেখান থেকে চলে আসে। পরে রাত ১২-টায় আমাকে ফোন করে বিস্তারিত বলল। আমি তাকে বললাম, তারা হাত-পা ভাঙ্গার কথা বলেছে, এখনও ভাঙ্গেনি। এতেই হক থেকে কি তুমি সরে যাবে? তুমি ছাহাবীদের ইতিহাস পড়নি? তারা বুকের তাজা রক্ত ঢেলে দিয়েছে। কিন্তু সঠিক দ্বীন থেকে সরে দাঁড়ায়নি। আর তুমি সরে দাঁড়ালে? আমি সরে যাব না ইনশাআল্লাহ। আমার কথা শোনার পর সে বলল, আমি ওদেরকে ওয়াদা দিয়েছি। কিন্তু বাস্তবায়ন করব না এবং হক থেকে সরে যাব না ইনশাআল্লাহ। ইখলাছ ওয়াদা পূরণ না করায় কিছু লোক তার কাছে গিয়ে বলল, তুমি গতকাল আমাদের কাছে ওয়াদা করেছিলে, ফজরের ছালাত আমাদের সাথে আদায় করবে অথচ তা করনি। এ বলে তাকে গালাগালি করতে লাগল। এতে ইখলাছের ভাইয়েরা তাদের উপর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। তারা বলল, গতকাল অনেক কিছু করার পরেও আজ আবার বাড়ীতে এসেছ। তারা তাদের পরিস্থিতি বেগতিক দেখে চলে গেল। এর কিছুদিন পর আমি দেশে গিয়ে সকলকে নিয়ে আলোচনা করে মসজিদে এক সাথে ছালাত আদায় করার চিন্তা করলাম। কিন্তু তারা বলল, তোমরা যেভাবে ছালাত আদায় কর, সেভাবে ছালাত আদায় করতে দেওয়া হবে না। ফলে আমরা সবাই মিলে চাঁদা দিয়ে জায়গা কিনে একটি মসজিদ করেছি। নাম দিয়েছি 'ধাদুয়া-খাকড়াদা আহলেহাদীছ জামে মসজিদ'। আমরা বর্তমানে এখানেই ছালাত আদায় করছি। সবার নিকটে দো'আ চাই।

-নূরুল ইসলাম
ধাদুয়া, গুরুদাসপুর, নাটোর।

Contents

হাদীছের গল্প

ওযূবিহীন ছালাত আদায়ের শাস্তি

ইবনু মাসঊদ (রাঃ) নবী করীম (ছাঃ) হ'তে বর্ণনা করেন, তিনি বলেছেন, আল্লাহ্‌র জনৈক বান্দাকে কবরে একশত কশাঘাতের আদেশ দেওয়া হ'ল। তখন সে তা কমানোর জন্য বার বার আবেদন-নিবেদন করতে থাকল। শেষ পর্যন্ত একটি কশাঘাত অবশিষ্ট থাকল। তাকে একটি মাত্র কশাঘাতই করা হ'ল। তাতেই তার কবর আগুনে ভরে গেল। তারপর যখন আঘাতের প্রভাব দূর হ'ল এবং সে হুঁশ ফিরে পেল তখন বলল, তোমরা আমাকে কেন কশাঘাত করলে? তারা বলল, তুমি এক ওয়াক্ত ছালাত বিনা ওযূতে আদায় করেছিলে আর এক মযলূম বান্দার পাশ দিয়ে যাচ্ছিলে। কিন্তু তাকে তুমি সাহায্য করনি' *(শারহু মুশকিলিল আছার হা/৩১৮৫,২৬৯০; ছহীহ তারগীব ওয়া তারহীব হা/২২৩৪; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৭৪)*।

***শিক্ষা :** ওযূ ছাড়া ছালাত হয় না। তাছাড়া ওযূবিহীন ছালাত আদায় করলে পরকালে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।*

অহংকারের পরিণতি

(১) ছুহায়েব (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) যখন ছালাত আদায় করতেন তখন চুপিসারে (ফিসফিস করে) কিছু বলতেন। একদা তিনি ছালাত শেষে বললেন, (আমি যা বলেছি) তোমরা কি তা বুঝতে পেরেছ? আমি জনৈক নবী (আঃ)-কে স্মরণ করছিলাম। তাঁর সম্প্রদায় থেকে তাঁকে একটি সৈন্যবাহিনী দেওয়া হয়। তিনি বললেন, এমন কারা আছে যারা এদের সমকক্ষ হবে অথবা এমন কারা আছে যারা এদের সঙ্গে যুদ্ধ করবে? অথবা অনুরূপ একটি কথা তিনি বললেন। তখন আল্লাহ তা'আলা তাঁর নিকট এই মর্মে অহী প্রেরণ করেন যে, তোমার সম্প্রদায়ের জন্য তিনটি বিষয়ের যে কোন একটি তুমি গ্রহণ কর। ১. আমি তাদের উপর তাদের শত্রুদের প্রভুত্ব চাপিয়ে দেব ২. দুর্ভিক্ষ চাপিয়ে দেব ৩. মরণকে বরণ করতে হবে। এতদসম্পর্কে তিনি তাঁর কওমের লোকদের নিকটে পরামর্শ চাইলেন। তারা বলল, আপনি আল্লাহ্‌র নবী! বিষয়টি নির্বাচনের ক্ষমতা আমরা আপনার উপরই ন্যস্ত করছি। তিনি তখন ছালাতে দাঁড়িয়ে গেলেন। আর তাঁরা (নবীরা) যখন কোন ক্ষেত্রে সন্ত্রস্ত হ'তেন তখন তাঁরা ছালাতের আশ্রয় নিতেন। তিনি বললেন, হে প্রভু! দুর্ভিক্ষ অথবা শত্রুর কোনটাই নয়। তবে মৃত্যুকেই আমরা বরণ করতে রাযী আছি। তখন আল্লাহ তা'আলা তাদের উপর তিন দিন মৃত্যু চাপিয়ে দিলেন। ফলে তাদের মধ্যস্থিত সত্তর হাযার লোক মারা গেল। আমাকে তোমরা চুপি চুপি যে কথা বলতে শোন, তা এই- اَللَّهُمَّ بِكَ أُقَاتِلُ وَبِكَ أُصَاوِلُ وَلاَ حَوْلَ وَلاَ قُوَّةَ إِلاَّ بِكَ– 'হে আল্লাহ! তোমার সহায়তায় আমরা যুদ্ধ করি, তোমার সহায়তায় আমরা হামলা করি এবং তোমার সহায়তা ছাড়া পাপ থেকে বাঁচা ও পুণ্য করার কোন শক্তি নেই' *(আহমাদ হা/১৮৯৫৭; ইবনু হিব্বান হা/১৯৭৫; বায়হাকী, শু'আবুল ঈমান হা/৩১৮৪; ইবনু আবী শায়বা হা/৪৮০; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১০৪৫০; সিলসিলা ছহীহাহ হা/১০৬১)*।

(২) ইবনু আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) মাক্বামে ইবরাহীমে ছালাত আদায় করছিলেন। এ সময় আবু জাহল ইবনু হিশাম তাঁর নিকট দিয়ে যাচ্ছিল। সে বলল, হে মুহাম্মাদ! আমি কি তোমাকে এ কাজ করতে নিষেধ করিনি? সে তাঁকে ধমকাল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)ও তাকে কড়া ভাষায় কিছু কথা বললেন এবং তিরস্কার করলেন। তখন সে বলল, হে মুহাম্মাদ! কিসের জোরে তুমি আমাকে ভর্ৎসনা করছ? আল্লাহ্‌র কসম! শোন, এই উপত্যকায় আমার জনশক্তিই বেশি। তখন আল্লাহ তা'আলা অবতীর্ণ করলেন,– فَلْيَدْعُ نَادِيَهُ، سَنَدْعُ الزَّبَانِيَةَ 'সে তার জনশক্তিকে ডাকুক, আমরাও জাহান্নামের প্রহরী ফেরেশতাদের সত্বর ডাকব' *(আলাক্ব ১৭-১৮)*। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যদি সে তার জনশক্তিকে ডাকত, তাহ'লে তৎক্ষণাৎই তাকে আযাবের ফেরেশতারা পাকড়াও করত' *(তিরমিযী হা/৩৩৪৯; নাসাঈ, সুনানুল কুবরা হা/১১৬৮৪; বুখারী হা/৪৯৫৮ অনুরূপ অর্থে; সিলসিলা ছহীহাহ হা/২৭৫)*।

***শিক্ষা :** অহংকার সর্বাবস্থায় পরিত্যাজ্য।*

মদ পানের ভয়াবহ পরিণতি

ইবনু দায়লামী থেকে বর্ণিত, তিনি বায়তুল মুক্বাদ্দাসে বসবাস করতেন। একবার তিনি আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ইবনিল আছ (রাঃ)-এর সন্ধানে মদীনায় অবস্থান করলেন। তিনি তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তারা (ছাহাবীগণ) বললেন, তিনি মক্কা যাত্রা করেছেন। তাঁর পিছনে পিছনে যাত্রা করে তিনি জানতে পারলেন যে, সেখান থেকে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর ত্বায়েফ চলে গেছেন। এবার তার পিছনে পিছনে গিয়ে তিনি তাকে এক কৃষি খেতের মধ্যে কুরায়েশ বংশীয় এক ব্যক্তির কোমর ধরে হাঁটা অবস্থায় পেলেন। যে মদ্যপ হিসাবে পরিচিত ছিল। আমি তার সঙ্গে দেখা করে তাকে সালাম দিলাম, তিনি আমার সালামের জবাব দিলেন। তারপর বললেন, এদিনে কেন এসেছ? কোথা থেকেই বা এসেছ? আমি তাঁকে আমার খবরাদি জানালাম। তারপর তাঁকে জিজ্ঞেস করলাম, হে আব্দুল্লাহ ইবনু আমর! আপনি কি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে মদ পান সম্পর্কে কিছু বলতে শুনেছেন? তিনি বললেন, হ্যাঁ। এবারে কুরায়শী লোকটি তার হাত ছেড়ে দিয়ে চলে গেল। তিনি বললেন, আমি নবী করীম (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি, আমার উম্মতের যে ব্যক্তিই মদ পান করবে তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হবে না' *(ছহীহ ইবনু খুযায়মাহ হা/৯৩৯; মুসতাদরাকে হাকেম হা/৯৪৫; নাসাঈ হা/৫৬৬৪, ছহীহুল জামে' হা/৭৭১৭; মুসনাদুশ শামেয়ীন হা/৫৩১; সিলসিলা ছহীহাহ হা/৭০৯)*।

***শিক্ষা :** ইবাদত কবুল হওয়ার জন্য সকল প্রকার মাদকদ্রব্য হতে বিরত থাকা যরূরী।*

-আব্দুল মালেক, ঝিনাইদহ।

গল্পের মাধ্যমে জ্ঞান

দুনিয়ালোভীর উদাহরণ

দুনিয়াদারের অবস্থা হ'ল অতিথিসম! যেন তার জন্য দস্ত রখানা বিছানো হ'ল। এদিকে অতিথিপরায়ণ ব্যক্তির অভ্যাস হ'ল স্বীয় অতিথিবৃন্দের সামনে ঘর সাজানো, আগ্রহের সাথে অতিথিকে স্বাগত জানানো, এক দল সৈন্য বা গোত্রকে খাওয়ানোর পর আরেক দল সৈন্য বা গোত্রকে খাবারের প্রতি আহ্বান করা, তাদের সামনে ধূপসম্বলিত জহরতপূর্ণ সোনার পাত্র উপস্থাপন করা এবং ধূপ জ্বালানোর জন্য রূপার অংগার ধানিকা দান করা যেন অতিথিবৃন্দ তা থেকে সুগন্ধি লাভ করতে পারে। অতঃপর রীতি অনুযায়ী স্বর্ণ-রূপার পাত্র তার মালিককে ফিরিয়ে দিতে হয় যাতে পরবর্তী অতিথিবৃন্দকে তা দ্বারা আপ্যায়ন করতে পারে। এমতাবস্থায় আতিথেয়তার নিয়মাবলী সম্পর্কে জ্ঞানসম্পন্ন ব্যক্তি এগুলো ব্যবহার করতঃ সুগন্ধি লাভ করবে এবং বিদায়ের প্রাক্কালে পাত্রসমূহ মালিকের নিকট রেখে চলে যাবে এবং এর প্রতি কোন রকম লোভ-লালসা করবে না এবং তাদের হৃদয়ে এগুলোর প্রতি সামান্যতম চাহিদাও থাকবে না। বরং সে পরিবেশক ও মেযবানকে কৃতজ্ঞতা জানাবে। কিন্তু এই সম্পর্কে অজ্ঞ ব্যক্তি তথা দুনিয়া লোভী ধারণা করবে যে, এই পাত্রগুলোও তাকে দিয়ে দেওয়া হয়েছে। ফলে সে বিদায়ের প্রাক্কালে পাত্রগুলো সাথে করে নিয়ে যেতে চাইবে। কিন্তু সে এগুলো নিয়ে যেতে পারবে না। কারণ মালিক কর্তৃক তা ফেরত চাওয়া হবে। অতএব সে ভগ্ন প্রাণ ও মনমরা হয়ে পড়বে এবং নিজের কৃত ভুল কর্মের জন্য ক্ষমা প্রার্থী হবে। বলাবাহুল্য দুনিয়া হচ্ছে পথিকের রাস্তা এবং অতিথিশালার মত। এখান থেকে মানুষ যেন শুধুমাত্র খাদ্যদ্রব্য গ্রহণ করে। অতিথিশালা ও মেযবানের পাত্রের প্রতি কোন লোভ না করে।

দুনিয়ালোভী ইহকাল-পরকাল উভয়ই হারায়

দুনিয়াদার এবং আখেরাতের কথা ভুলে গিয়ে শুধু দুনিয়াবী কাজে লিপ্ত ব্যক্তি ও দুনিয়াকে অধিক গুরুত্ব প্রদান করে পরকালকে হেয়প্রতিপন্নকারী ব্যক্তিবর্গের দৃষ্টান্ত হ'ল ঐ দলের মত যারা নৌকাযোগে সমুদ্র ভ্রমনে বের হ'ল। অতঃপর মলমূত্র ত্যাগ করতঃ তা থেকে পবিত্রতা লাভের উদ্দেশ্যে কোন এক দ্বীপে অবতরণ করল। জলযান হ'তে অবতরণ কালে মাঝি তাদেরকে অন্য কোন কাজে লিপ্ত না হয়ে শুধু প্রয়োজনীয় কাজ সেরে পবিত্রতা লাভ করতঃ ছালাত আদায়ের পর যথাসময়ে নৌকায় ফিরে আসার আহ্বান জানাল। সাথে সাথে এ বলে সতর্ক করে দিল যে, দেরী করলে নৌকা ছেড়ে চলে যাবে। কিন্তু তারা দ্বীপের মধ্যস্থলে গিয়ে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়ে ভিন্ন ভিন্ন এলাকায় ছড়িয়ে পড়ল। তাদের মধ্যে যারা বুদ্ধিমান ছিল তারা বেশী দেরী না করে প্রাকৃতিক প্রয়োজন সেরে পবিত্রতা অর্জন করতঃ ছালাত আদায় করে তাড়াতাড়ি ফিরে আসল এবং জলযান খালি পেয়ে ইচ্ছামত আরামদায়ক ও উপযুক্ত উঁচু আসনে জায়গা করে নিল। কিন্তু তাদের মধ্যে একদল এমন ছিল যারা দ্বীপের মধ্যবর্তী অপূর্ব দৃশ্যাবলী অবলোকন করার জন্য বেড়াতে লাগল। সেখানকার ফল-ফুল দেখতে লাগল, সুশোভিত বৃক্ষরাজির প্রতি আসক্ত হয়ে পড়ল, পাখীদের কল-কাকলী ও সংগীত শুনতে লাগল এবং রং-বেরঙের পাথরের দিকে আকৃষ্ট হয়ে পড়ল। অতঃপর যখন জলযানের দিকে ফিরে আসল তখন আর তারা কোনরকম প্রশস্ত জায়গা পেল না। অগত্যা তাদেরকে সংকীর্ণ অন্ধকারাচ্ছন্ন জায়গায় আসন গ্রহণ করতে হ'ল। তাদের মধ্যে আরেক দল ছিল তারা শুধু দ্বীপের মধ্যে ভ্রমণ করল না। বরং সেখান হ'তে কিছু রঙিন পাথরও কুড়িয়ে নিয়ে আসল এবং তাদের ভাগ্যে এমন সংকীর্ণ জায়গা জুটল যে কোন রকমে শুধু নিজেরা বসতে পারল এবং পাথরে বোঝা স্ব স্ব কাঁধের উপরেই রাখতে হ'ল। দুই একদিন অতিবাহিত হওয়ার পর যখন পাথরের টুকরাগুলো কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল এবং দুর্গন্ধময় হয়ে দুর্গন্ধ ছড়াতে লাগল তখন জায়গার সংকীর্ণতার জন্য না নীচে নামিয়ে রাখতে পারল? না ফেলে দিতে পারল। অতএব স্ব স্ব কৃতকর্মের জন্য অনুতপ্ত হওয়া এবং পাথরের বোঝা বহন করার জন্য লজ্জিত হওয়া ছাড়া তাদের কোন গত্যন্তর থাকল না। তাদের মধ্যে অপর একটি দল ছিল যারা দ্বীপের আশ্চর্যজনক দৃশ্যাবলী দেখে এমনভাবে বিমোহিত হয়ে পড়ল যে জলযানে ফিরে আসার কথা পর্যন্ত একেবারে ভুলে গেল। এমতাবস্থায় নৌকা ছেড়ে চলে গেল। ফলে তারা তাদের সাথীদের নিকট হ'তে বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ল এবং তাদের পিছু ডাক আর কারো কর্ণগোচর হ'ল না। অবশেষে দ্বীপের হিংস্র জন্তুসমূহের আহারে পরিণত হ'য়ে তারা প্রাণ হারাল।

বলা বাহুল্য তাদের মধ্যে প্রথম দলটি হ'ল মুমিন সংযমী ও পরহেযগার ব্যক্তিবর্গের এবং শেষের ধ্বংসপ্রাপ্ত দলটি হ'ল কাফির ও মুশরিকদের যারা আল্লাহ ও পরকালকে ভুলে গিয়েছিল এবং দুনিয়ার প্রতি সর্বাত্মকভাবে নিজেদের সমর্পণ করেছিল। যেমন আল্লাহ তা'আলা এরশাদ করেছেন, 'এটা এজন্য যে তারা দুনিয়ার স্বার্থকে আখেরাতের উপর প্রাধান্য দিয়েছে' *(নাহল ১৬/১০৭)*।

এখন বাকী থাকল মধ্যবর্তী দু'টি দল- এরা সকলেই পাপী। তবে তারা তাদের মূল ঈমান ঠিক রেখেছে। কিন্তু দুনিয়া পূজা হ'তে তারা হস্ত সংবরণ করেনি। তাদের মধ্যে কিছু সংখ্যক দুনিয়ার আরাম-আয়েশ ভোগ করেছে এবং বাকী সংখ্যক দরিদ্রতার জন্য ভোগ করতে পারেনি। এমতাবস্তায় তাদের উপর কিংকর্তব্যবিমূঢ়তার বোঝা ভারী হয়ে যাওয়ায় তারা মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলেছে। এর ফলে তাদের পাপের সংখ্যা বেড়ে গেছে।

** আব্দুর রহীম*
আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহী।

চিকিৎসা জগৎ

আহার গ্রহণ পরবর্তী কতিপয় মারাত্মক ভুল

জীবনীশক্তির জন্য খাদ্য গ্রহণের বিকল্প নেই। তবে খাওয়ার পরে যে ভুলগুলো আমরা হরহামেশই করি, সেগুলো পরিত্যাগ করা যরূরী। ভুলগুলোর মধ্যে কতিপয় নিম্নে উল্লেখ করা হ'ল।-

১. ভরা পেটে ফল খাওয়া : 'খালি পেটে জল, ভরা পেটে ফল' এ পুরাতন প্রবাদ ঠিক। কিন্তু খাওয়ার পরই ফল খাওয়া অনুচিত। কারণ ফল খুব তাড়াতাড়ি হজম হয়। কিন্তু খাওয়ার পরেই খেলে সেই ফল দীর্ঘ ক্ষণ পেটে থেকে যায় এবং তা নষ্ট হয়ে গ্যাস ও ক্ষতিকারক টক্সিন তৈরী করে। তাই খাদ্য গ্রহণের অন্তত দুই ঘণ্টা পরে ফল খেতে হবে।

২. খেয়ে উঠেই চা পান করা : খেয়ে উঠে চা পান করার অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে। চায়ে ক্যাফেইন থাকে, যা শরীরে হজম প্রক্রিয়াকে বিলম্বিত করে। অ্যানিমিয়া রোগীদের পক্ষে এটা অতি মারাত্মক। খাওয়ার পর অন্তত এক ঘণ্টা পরে চা পান করতে হবে।

৩. গোসল করা বা সাঁতার কাটা : খাওয়ার পর গোসল করা বা সাঁতার কাটা ভীষণ খারাপ অভ্যাস। খাওয়ার পর শরীরের সমস্ত রক্ত পাকস্থলিমুখী হয়। কিন্তু গোসল করলে বা সাঁতার কাটলে শরীরে তাপমাত্রার হঠাৎ পরিবর্তন হয়। এতে করে রক্ত আবার শরীরের সব অংশে পৌঁছাতে চেষ্টা করে। ফলে হজমশক্তি ক্ষতিগ্রস্ত হয়। দীর্ঘ দিন এই অভ্যাস থাকলে হজমশক্তি নষ্ট হয়েও যেতে পারে।

৪. কোমর দোলানো : খেয়ে উঠেই অনেকে কোমরের ব্যায়াম শুরু করেন। তাদের ধারণা, এতে মেদ জমতে পারে না। এ ধারণা ঠিক নয়। কেননা খাওয়ার পর কোমরের ব্যায়ামে ওযন বাড়ে। উপরন্তু এতে বৃহদান্ত্র বেড়ে যেতে পারে, যাতে ভবিষ্যতে হজমশক্তি নিঃশেষ হয়ে যাবে।

৫. কসরত বন্ধ : রাতের খাবার গ্রহণের পর এক মাইল ধীরে হাঁটা যায়। তবে দৌড়ানো যাবে না। খাওয়ার পর দ্রুত হাঁটলে খাদ্যগুণ শরীরে ঢোকার আগেই বেরিয়ে যাবে। পক্ষান্তরে ধীর গতিতে হাঁটা উপকারে আসবে।

৬. খাদ্য গ্রহণের পরেই ঘুমানো : খাওয়ার পরই ঘুমানোর অভ্যাস অবিলম্বে ত্যাগ করা উচিত। ঘমানো তো দূরে থাক, খেয়ে উঠে শোয়াও খুব খারাপ। এতে ভবিষ্যতে পাকস্থলির সমস্যায় ভুগতে হ'তে পারে।

কোমল পানীয় হজমে বাধা সৃষ্টি করে

কোমল পানীয় সম্পর্কে আমরা যে ধারণা পোষণ করি, তা আদৌ ঠিক নয়। কোমল পানীয় মোটেই হজমে সহায়ক নয়। এটা সাময়িক কিছুটা শান্তি দিলেও মানবদেহের জন্য এটি অশান্তিরই বার্তা বয়ে আনে বলে মনে করছেন চিকিৎসা বিজ্ঞানীরা। চিকিৎসকদের মতে, কোমল পানীয় হজমে বাধা সৃষ্টি করে এবং শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ হ্রাস করে। যুক্তরাষ্ট্রের ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ ড. ফ্রান্সিসকো কন্টারাইজ এ সম্পর্কে জানান, ক্যান্সার একটি বৃক্ষের মতো এবং অক্সিজেনবিহীন টিস্যু কোষ হ'ল এর পৃষ্ঠপোষক। তাই অত্যধিক কোমল পানীয় সেবনের ফলে শরীরে অক্সিজেনের পরিমাণ কমে আসে। যা মানব দেহের জন্যে ক্যানসারের ঝুঁকি বাড়িয়ে তোলে। গবেষণায় দেখা গেছে যে, কোমলপানীয় ভর্তি ৫০০ গ্রামের একটি বোতলে কার্বন, ১৭০ ক্যালোরি সোডা এবং ১৫ চামচ চিনি ব্যবহার করা হয়। এটি মানবদেহের জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। ক্ষুধামন্দা, অবসাদ, ডায়াবেটিস, হার্ট অ্যাটাক, দাঁতের ক্ষয়, বন্ধ্যাত্বের মতো রোগের ঝুঁকিও এই কোমল পানীয়তে বিদ্যমান।

বাগান পরিচর্যায় কিডনীর পাথরের ঝুঁকি কমে

প্রতিদিন বাগানে একটু কাজেই কিডনীতে পাথর হওয়ার ঝুঁকি প্রায় এক-তৃতীয়াংশ কমে যায়। সম্প্রতি ওয়াশিংটন স্কুল অব মেডিসিনের বিজ্ঞানীরা এ তথ্য জানিয়েছেন। তাদের মতে, সপ্তাহে মাত্র ৪ ঘণ্টা হালকা বাগান পরিচর্যা করলে ঘণ্টায় দুই মাইল বেগে ৩ ঘণ্টা হাঁটা বা ১ ঘণ্টা মাঝারি মাত্রার জগিংয়ের সমান উপকারিতা পাওয়া যায়। একই সঙ্গে দৈনিক ২২০ ক্যালরির বেশি খাদ্য গ্রহণ কিডনীতে পাথরের ঝুঁকি ৪২ শতাংশ বাড়িয়ে দিতে পারে। এত দিন কিডনীতে পাথরের ঝুঁকি কমাতে পর্যাপ্ত পানি পান, ক্যালসিয়াম ও আমিষ গ্রহণে পরিমিতি এবং যথাসম্ভব সোডিয়াম ও অক্সালেট সমৃদ্ধ খাবার পরিহার করার কথা বলা হ'ত। কিন্তু এ গবেষণা প্রমাণ করে, স্বাভাবিক কায়িক শ্রমের মাধ্যমে ও পরিমিত খাদ্য গ্রহণের মাধ্যমে সঠিক ওযন বজায় রাখাও কিডনীতে পাথরের ঝুঁকি কমাতে সহায়ক।

ওযন কমাতে সুস্বাদু খাবার

ওযন কমাতে কিংবা নিয়ন্ত্রণে রাখতে রাতের খাবারের বদলে নিম্নের স্যুপটি বেশ কার্যকর। এতে ক্যালোরি খুব সামান্য, অথচ পেট ভরা রাখে বহুক্ষণ। নানান পুষ্টি উপাদান আছে বিধায় দেহও থাকবে সুন্দর।

উপকরণ : (ক) চিকেন/ভেজিটেবল স্টক ১ কাপ (খ) সিদ্ধ নুডুলস ১/২ কাপ (গ) সিদ্ধ সবজি পসন্দ মত (ঘ) রশুন কুচি (ঙ) লেবুর রস ২ টেবিল চামচ (চ) সিদ্ধ ডিম ১ টা (ছ) অল্প ধনিয়া পাতা কুচি (জ) লেমন গ্রাস স্টিক (থাই পাতা) কয়েকটা (ঝ) লবণ প্রয়োজন মত (ঞ) অল্প অলিভ অয়েল।

প্রস্তুত প্রণালী :

১. এই স্যুপের প্রধান উপকরণ হ'ল চিকেন/ভেজিটেবল স্টক। এজন্য ৩ কাপ পানিতে ২ কাপ পরিমাণ মুরগির গোশত সহ হাড্ডি (হাড্ডিগুলো একটু ছেঁচে দেওয়া ভাল), পেয়াজ টুকরো, রশুন কয়েক কোয়া, আদা টুকরা, আস্ত গোলমরিচ, অল্প লবণ দিয়ে কম আঁচে রান্না করতে হবে কমপক্ষে ১ ঘণ্টা।

২. পানিটা শুকিয়ে ১ কাপের একটু বেশি থাকা অবস্থায় নামিয়ে নিতে হবে এবং শুধু পানিটা ছেঁকে নিতে হবে। গোশতগুলো অন্য যেকোন খাবারে ব্যবহার করা যাবে। ভেজিটেবল স্টকও একইভাবে বানাতে হবে।

৩. এবার একটা হাড়িতে ১ কাপ স্টক দিয়ে সাথে সিদ্ধ সবজি, রশুন কুচি, লেবুর রস, ধনিয়া পাতা কুচি, লেমন গ্রাস স্টিক (থাই পাতা), লবণ দিয়ে ৫ মিনিট রান্না করতে হবে। এরপর সিদ্ধ নুডুলস দিয়ে রান্না করতে হবে আরও ২ মিনিট। এভাবে তৈরি হবে স্যুপ।

৪. নামিয়ে বাটিতে নিয়ে উপরে হাল্কা অলিভ অয়েল ছিটিয়ে দিতে হবে। (অলিভ ওয়েল হজম ক্ষমতা বৃদ্ধি করে) উপরে সিদ্ধ ডিম এবং টালা গোল মরিচ দিয়ে গরম গরম এই স্যুপ পরিবেশন করতে হবে।

॥ সংকলিত ॥

Contents

ক্ষেত-খামার

ক্যাসাভা চাষ লাভজনক

আফ্রিকাসহ পৃথিবীর প্রায় ৫০ কোটি মানুষের প্রধান খাদ্য হচ্ছে ক্যাসাভা। বাংলাদেশেও ক্যাসাভা বিকল্প প্রধান খাদ্য হ'তে পারে। এতে দেশের ১৬ কোটি মানুষের খাদ্যাভাসে পরিবর্তন আসবে। সেই সাথে চাপ কমবে চাল ও গমের উপরে। ক্যাসাভা সম্পর্কে বলা যায় যে, গমের আটা দ্বারা যত প্রকার খাবার তথা রুটি, বিস্কুট, পাউরুটি, কেক, মিষ্টি ইত্যাদি তৈরী হয়, তার সবই ক্যাসাভার আটা দ্বারা হয়ে থাকে। এক কথায় গমের আটা দ্বারা যা যা তৈরী হয় ক্যাসাভার আটা দ্বারা তার সব কিছুই তৈরী করা যায়। উপরন্তু ক্যাসাভার আলু থেকে উৎপাদন করা যায় গ্লুকোজ, লজেন্স তৈরির কাঁচা মাল, পেস্ট, প্রসাধনী, ভিনেগার, সিরাপ তৈরির গ্যার্নিউল ইত্যাদি। ক্যাসাভা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শর্করা উৎপাদনকারী ফসল। এ কারণে আফ্রিকায় খাদ্য হিসাবেও বেশ জনপ্রিয়।

ক্যাসাভা বহুবর্ষজীবী গুল্ম শ্রেণীর গাছ। কাণ্ড গিট যুক্ত, আগা ছড়ানো, পাতা যৌগিক, গড়ন শিমুল পাতার মতো, করতলাকৃতি, লালচে রঙের দীর্ঘ বৃন্তের মাথায় লম্বাটে ছয় থেকে সাতটি পাতা থাকে। ক্যাসাভা গাছের শিকড় জাত এক ধরনের আলু। জন্মে মাটির নিচে। নানাভাবে ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে এ আলু খাওয়া যায়।

স্থানভেদে ক্যাসাভার বিভিন্ন নাম রয়েছে। যেমন- Yoca, Mogo, Manioc, Mandioca ইত্যাদি। বাংলাদেশে বাণিজ্যিকভাবে ক্যাসাভার চাষ শুরু হয় সাম্প্রতিক কালে। জানা যায়, ক্যাসাভার আগমন ঘটেছে মূলত খ্রিস্টান মিশনারীর মাধ্যমে ১৯৪০ সালের দিকে। কিন্তু বৃহত্তর ময়মনসিংহ ও মধুপুরের আদিবাসীদের কেউ কেউ মনে করেন দেশীয় জাতের ক্যাসাভা অনেক পূর্ব থেকেই আমাদের দেশে পারিবারিকভাবে আবাদ হ'ত।

আমাদের দেশে গাছটি শিমুল আলু হিসাবে বেশ পরিচিত। ক্যাসাভা পৃথিবীর তৃতীয় বৃহত্তম শর্করা উৎপাদনকারী ফসল এবং আফ্রিকা সহ প্রায় ৫০ কোটি মানুষের প্রধান খাদ্য। এটি আফ্রিকায় বেশ জনপ্রিয় খাদ্য। বর্তমানে সারা পৃথিবীর উষ্ণ ও কম উষ্ণ অঞ্চলে ব্যাপকভাবে ক্যাসাভার চাষ হচ্ছে। ক্যাসাভা উৎপাদনে প্রথমস্থানে রয়েছে নাইজেরিয়া। এর পরেই রয়েছে আইভরিকোষ্ট।

আমাদের দেশে বিভিন্নভাবে এর চাষ হ'লেও বর্তমানে ময়মনসিংহের গারো পাহাড়, হালুয়াঘাট, ফুলবাড়িয়া, টাঙ্গাইলের সখিপুর মধুপুর, ঘাটাইল এবং নেত্রকোনা ও কুমিল্লার লালমাই পাহাড় ও পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসিরা স্থানীয়ভাবে ক্যাসাভা চাষ করে।

সাম্প্রতিককালে ঘাটাইল, মধুপুর, ময়মনসিংহ, চট্টগ্রামের ফটিকছড়ি, মানিকছড়ি, করের হাট এবং কুমিল্লায় ব্যাপকভাবে ক্যাসাভার চাষ হচ্ছে। পাশাপাশি এসব অঞ্চলে ফিলিপাইন হাইব্রীট জাতের ক্যাসাভা চাষ শুরু হয়েছে।

অনাবাদি পতিত অনুর্বর জমিগুলো সাধারণত এ আলু চাষের জন্য নির্বাচন করা হয়। এ আলু চাষে মাটির উর্বরতা হ্রাস পায় না। আমাদের দেশে ক্যাসাভা গাছের গিটযুক্ত কাণ্ডগুলো ৬ থেকে ৮ ইঞ্চি করে টুকরা টুকরা করে সারিবদ্ধভাবে জমিতে ফেব্রুয়ারী থেকে মার্চ মাসের মধ্যে রোপণ করা হয়। আলু তোলা হয় অক্টোবর হ'তে নভেম্বর মাসের মধ্যে। গাছ লাগানোর ৭ মাস পর আলু খাওয়ার উপযোগী হয়। এ আলু উৎপাদনে কোন খরচ নেই বললেই চলে। সার ও কীটনাশক লাগে না। গাছ ছোট অবস্থায় দু'এক বার নিড়ানি দিলেই চলে। এ আলুর পাতা বিষাক্ত বলে কোন প্রাণী এ গাছের পাতা খায় না।

দেশীয় জাতের ক্যাসাভার মূল বা শিকড় আগুনে পুড়িয়ে মিষ্টি আলুর মতো খাওয়া যায়। আলু সিদ্ধ করে বিভিন্ন তরকারির সাথেও রান্না করে খাওয়া যায়। তবে সব জাতের ক্যাসাভা খাওয়ার উপযেগী নয়। ক্যাসাভা আলু থেকে তৈরি আটা ১০ থেকে ৩০ ভাগ আটার সঙ্গে মিশিয়ে রুটি, কেক, বিস্কুট, স্যুপ ও রসগোল্লা তৈরি করা সম্ভব। ক্যাসাভা থেকে উৎপাদন হয়, গ্লুকোজ, লজেন্স তৈরির কাঁচামাল, পেস্ট, প্রসাধনী, ভিনেগার, সিরাপ তৈরির গ্যার্নিউল ইত্যাদি।

দেশের অনুর্বর পতিত জমিতে ক্যাসাভা চাষ করলে আমাদের খাদ্যের বাড়তি চাহিদা অনেকটা মেটানো সম্ভব হবে। তাছাড়া এ শস্যের বাণিজ্যিক মূল্যও নেহাত কম নয়।

মোদ্দাকথা গমের আটা থেকে যত প্রকার খাবার তৈরী হয় তার সবই হয়ে থাকে ক্যাসাভার আটা থেকে। আর ১ কেজি গমের আটার দাম ৩২/৩৬ টাকা। অথচ ক্যাসাভা আটার দাম পড়বে কেজি প্রতি ৫/৬ টাকা। কাজেই বাণিজ্যিকভাবে ক্যাসাভা চাষ বেশ লাভজনক। সবচেয়ে বড় কথা হচ্ছে দেশের অবহেলিত উত্তর জনপদের হতদরিদ্র মানুষের ভাগ্যের উন্নয়ন এবং দেশের অর্থনীতিতে ঈর্ষণীয় অবদান রাখতে পারে ক্যাসাভা চাষ।

॥ সংকলিত ॥

কবিতা

আসল দ্বীন

আতিয়ার রহমান
মাদরা, কলারোয়া, সাতক্ষীরা।

আজ মুসলমান খাচ্ছে দোলা
ঘূর্ণিপাকের ঘূর্ণিতে
তিহাত্তরটি নাও সাজানো
উঠবে কে বা কোনটাতে?
সব নায়ের ঐ মাঝি বলে
এটাই হ'ল আসল দ্বীন।
জান্নাতেরই এই ঠিকানা
সব পাতকীর ভাবনাহীন।
অবুঝ পথিক যে পথ পেল
সেই পথেতে ছুটল ঠিক,
বুঝল না সে জানল না আর
ভাবল না তো দিগ্বিদিক।
সঠিক সে তো সেই তরী যার
আল্লাহ্র রাসূল (ছাঃ) কাণ্ডারী
বোকা তার চিনতে পারে?
রঙ দেখে হয় ভীন দ্বারী।
চেষ্টাতে তোর মিলবে সঠিক
কুরআন-হাদীছ মন্থনে,
বুঝবি তখন ভুল নায়েতে
যাচ্ছিস বেয়ে কোনখানে?
আল্লাহ্র খুশী পাইতে হ'লে
কুরআন-হাদীছ পড়তে হয়
তবেই সঠিক বুঝবে তখন,
উঠতে হবে কোন সে নায়।

একটি শুধুই চাওয়া

মোল্লা আব্দুল মাজেদ
পাংশা, রাজবাড়ী।

আমার সকল চাওয়ার মাঝে একটি শুধু চাওয়া
সব সাধনা হোক যে প্রভু তোমারি গান গাওয়া।
যে গান দোলায় মরুর বুকে
হেরার গুহায় তীব্র সুখে
সে গান দোলাও আমার বুকে
এটাই পরম পাওয়া,
একটি শুধু চাওয়া প্রভু তোমারি গান গাওয়া।
আমার মাথা দাও লুটিয়ে তোমার পায়ের তলে
তোমার প্রেমের তীব্র অনল আমার ভেতর জ্বলে।
শক্তি জাগাও আমার মনে
আমার সকল কাজের ক্ষণে
দাও ঢুকে দাও সংগোপনে
সব চাওয়া সব পাওয়া,
একটি শুধু চাওয়া প্রভু তোমারি গান গাওয়া;
আমার সকল চাওয়ার মাঝে একটি শুধু চাওয়া।

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক

সাইফুল ইসলাম
শ্যামপুর, মতিহার, রাজশাহী।

লাব্বাইক আল্লাহুম্মা লাব্বাইক
উঠলো রঙিন আলোর কিরণ চারিদিক।
একটি কথা লক্ষ কণ্ঠে আসলো ভেসে ইথারে,
হাযির প্রভু, হাযির আমি তোমার ক্ষমার দুয়ারে।
লুটলো শির এই দেহমন বাঁধ ভেঙ্গে গেছে সব ভাষার,
অহি-র ধারায় স্নিগ্ধ মুমিন শুভ্র পোষাক এক বাহার।
সোনা রোদে পুড়লো দেহ শুদ্ধ হ'ল অসাম্য,
ইখলাছে নাই ছোট বড় ভেদ-দাশের জীবন অমান্য।
আল্লাহ প্রেমে বিভোর মানুষ নবীর গাঁয়ের পথ মাড়ায়,
সারা জাহানে নবীর শাসন দেখবো কবে দোর গোঁড়ায়?
সামনে আলোর বিপ্লবী দিন স্বপ্ন আঁকি দুই চোখে,
অহি-র বিধান কায়েম হবে জীবন হাসে সেই সুখে।

সন্ত্রাস

মুহাম্মাদ শহীদুল্লাহ
নলত্রী, গোদাগাড়ী, রাজশাহী।

সন্ত্রাসে ভরে গেছে
মোদের সোনার দেশটা,
সকাল-বিকাল রাত-দুপুরে
চলছে খুনের চেষ্টা।
দেশে যারা টাকা ওয়ালা
খুন হ'তে হয় তাদের ফের,
টাকার লোভে সন্ত্রাসীরা
যিম্মী করে সন্তানের।
সত্য কথা বলতে বাধা
একটু নাহি করে ভয়,
তাইতো তারা সন্ত্রাসীদের
নির্মমতার শিকার হয়।
শত শত খুন করিয়া
সন্ত্রাসীরা পায় ছাড়া,
দোষ না করেও জেল খাটে ভাই
নিরপরাধ ব্যক্তিরা।
ঘুষ দিলেই ফের সন্ত্রাসীদের
মাফ হয়ে যায় সকল খুন,
যার কারণে চলছে এত
হত্যা, ধর্ষণ, চুরি, গুম।
মশাদের ন্যায় এই দেশেতে
সন্ত্রাসীদের ঘাঁটি ভাই,
এমন হ'লে একটুকু সুখ
কি করিয়া পাওয়া যায়?

***

Contents

সোনামণিদের পাতা

গত সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)-এর সঠিক উত্তর

১. সূরা কাওছার। ২. সূরা কুরায়েশ, ফালাক্ব ও আছর।
৩. সূরা নামল। ৪. সূরা বারাআত বা তওবায়।
৫. ১১৪ বার। ৬. সূরা আছর। ৭. ২৫ জন।
৮. হিজরতের পূর্বে অবতীর্ণ সূরাকে মাক্কী এবং পরে অবতীর্ণ সূরাকে মাদানী সূরা বলে।
৯. চার স্থানে। সূরা আলে ইমরান ১৪৪, আহযাব ৪০, মুহাম্মাদ ২ এবং ফাতাহ ২৯নং আয়াতে।
১০. সূরা আলাক্বের ১ম পাঁচ আয়াত।

চলতি সংখ্যার সাধারণ জ্ঞান (কুরআন বিষয়ক)

১. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরাটি পাঠ করলে কবরের আযাব থেকে রক্ষা পাওয়া যাবে?
২. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরাটি কুরআনের এক-তৃতীয়াংশের সমান?
৩. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরার প্রতি ভালবাসা মানুষকে জান্নাতে নিয়ে যাবে?
৪. কোন্ সূরাটি পবিত্র কুরআনের এক-চর্তুথাংশের সমান?
৫. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরার প্রথমাংশ তেলাওয়াতকারীকে দাজ্জালের ফেৎনা থেকে রক্ষা করবে?
৬. পবিত্র কুরআনের কোন্ দু'টি সূরা জুম'আর দিন ফজরের ছালাতে তেলাওয়াত করা সুন্নাত?
৭. পবিত্র কুরআনের কোন্ দু'টি সূরা জুম'আর ছালাতে তেলাওয়াত করা সুন্নাত?
৮. পবিত্র কুরআনের কোন্ সূরাটি সর্বপ্রথম পূর্ণাঙ্গরূপে নাযিল হয়?
৯. পবিত্র কুরআন প্রথম যুগে কিভাবে সংরক্ষিত ছিল?
১০. সর্বপ্রথম কে কুরআন একত্রিত করেন?

সংগ্রহে : মুহাম্মাদ তরীকুল ইসলাম
সুরিটোলা, ঢাকা।

কেউ আসে নাই ফিরে

এফ.এম. নাছরুল্লাহ হায়দার
কাঠিগ্রাম, কোটালীপাড়া, গোপালগঞ্জ।

কত মানব-মানবীর পৃথিবীতে জন্ম
কালে কালে অবসান,
কেউ আসে নাই ফিরে পৃথিবীর নীড়ে
দেখতে তার প্রিয়জন।
পরপারের সোপানে যে দিয়েছে পাড়ি
আসে নাই আর সে পৃথিবীতে,
গুপ্তধন মানিক, হীরা-কাঞ্চন
একটি বার সে নিতে।
কত জনমের কত অজানা কথা
ইতিহাসের পাতা বলে,
আসা-যাওয়ার মাঝে এই পৃথিবী
বিধাতার ইশারায় চলে।
সৃষ্টির রহস্য স্রষ্টা জানে
চলতে হবে তাঁর বিধান মেনে,
মরার আগে মরে,
আমাদের সুখের প্রদীপ জ্বলছে
জান্নাতেরই ঘরে।

জান্নাত

আব্দুল্লাহ আল-মামুন
দৌলতপুর, কুষ্টিয়া।

কোন চক্ষু তারে
করেনি দর্শন
কোন কর্ণ বিবরণ
করেনি শ্রবণ
কোন অন্তর করেনি কল্পনা।
রয়েছে সেথায়
অসীম শান্তি-সুখ
যেথা নাই
কোন ব্যথা-দুখ
পূর্ণ হবে সকল বাসনা।

সোনামণি

তাসনীম
৯ম শ্রেণী
মহিলা সালাফিয়া মাদরাসা
নওদাপাড়া, রাজশাহী।

যে মোরে করেছে মহান
দিয়েছে সঠিক পথের সন্ধান।
যে মোরে গাইতে শিখিয়েছে,
সত্য-সুন্দর ও ন্যায়ের গান।
যে মোরে শিক্ষা দিয়েছে,
গড়তে ইসলামী জীবন।
যার প্রতিটি বাক্যে,
ঝরেছে অহি-র শিক্ষা অবিরাম
হেদায়াতের আলো রয়েছে যেথা
সোনামণি হ'ল তারই
একটি ক্ষুদ্রনাম।

স্বদেশ

পাবনায় বিপুল গ্যাস ও তেল মজুদের সম্ভাবনা

পাবনার একমাত্র মোবারকপুর গ্যাসফিল্ড প্রকল্পের খনন কাজ আবার শুরু হয়েছে জরিপের ৩৪ বছর পর। গত ২২শে আগস্ট গ্যাসফিল্ড প্রকল্পের খনন কাজ উদ্বোধন করা হয়। ১ হাযার বিলিয়ন ঘন ফুট গ্যাস এবং ২১ লাখ ব্যারেল তেল মজুদের অনেক বড় আশা নিয়ে এই কূপ খননের উদ্বোধন করেন পেট্রোবাংলার চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. হোসেন মনছুর। প্রাপ্ত গ্যাস দেশের উত্তরাঞ্চলের পুরো চাহিদার প্রায় অনেকটাই পূরণ হবে বলে 'বাপেক্স' সূত্রে জানা যায়।

বাংলাদেশে দিনে ২৮টি আত্মহত্যা

বাংলাদেশে গত চার বছরে প্রতিদিন গড়ে ২৮ জন আত্মহত্যা করেছে। শুধু গত বছর ফাঁসিতে ঝুলে ও বিষ খেয়ে আত্মহত্যা করেছে ১০ হাযার ১২৯ জন। এ তথ্য জাতীয় মানসিক স্বাস্থ্য ইনস্টিটিউট ও পুলিশ সদর দপ্তরের। যারা আত্মহত্যা করেছে বা চেষ্টা করেছে, তাদের বড় অংশের বয়স ২১ থেকে ৩০ বছরের মধ্যে। বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থার (ডব্লিউএইচও) হিসাবে ১৫-৪৪ বছর বয়সী জনগোষ্ঠীর মৃত্যুর প্রধান তিনটি কারণের একটি হ'ল আত্মহত্যা। চিকিৎসকেরা বলছেন, যারা আত্মহত্যা করে তাদের ৯৫ ভাগই কোন না-কোন গুরুতর মানসিক রোগে ধারাবাহিকভাবে ভোগে।

গর্ভবতী নারীদের রক্তে মাত্রাতিরিক্ত সীসার উপস্থিতি

বাংলাদেশের প্রত্যন্ত অঞ্চলের গ্রামীণ জনপদে গর্ভবতী নারীদের রক্তে মাত্রাতিরিক্ত সীসার পরিমাণ শনাক্ত করা গেছে। এই সীসার উৎস হচ্ছে ফসলী জমিতে ব্যবহৃত বালাইনাশক ও কীটনাশক পদার্থ। এছাড়া টিনজাত খাবার ও রাইস মিলের চাল ব্যবহারকারীদের রক্তে সীসার মাত্রা বেশী পাওয়া গেছে। সীসা শিশুদের মস্তিষ্কের বিকাশ রহিত করে, ফলে শিশুদের বুদ্ধি ও স্বাভাবিক জ্ঞান লাভের পথে প্রতিবন্ধকতা তৈরী হয়। তাছাড়া সীসা একজন পূর্ণবয়স্ক মানুষের হৃৎপিণ্ড ও মস্তিষ্কের ক্ষতি করে।

রাজধানীর মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর মিলনায়তনে গত ২১ আগস্ট 'বাংলাদেশের সীসা দূষণ পরিস্থিতি : একটি গবেষণা প্রতিবেদন' প্রকাশ উপলক্ষে আয়োজিত সংবাদ সম্মেলনে গবেষণা প্রতিবেদনটি উপস্থাপন করে এসব তথ্য জানান যুক্তরাষ্ট্রের স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটির অধ্যাপক ড. স্টিভ লুবি। অধ্যাপক ড. স্টিভ লুবি, আইসিডিডিআরবি ও স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি যৌথভাবে এই গবেষণাটি সম্পন্ন করেছে।

অধ্যাপক ড. স্টিভ লুবি আরও জানান, গবেষণায় দেখা গেছে ৪৬ ভাগ মহিলার রক্তে সীসার স্বাভাবিক মাত্রা অতিক্রম করেছে। যারা কীটনাশক ব্যবহার, টিনজাত খাবার ও রাইস মিলের চাল ব্যবহার করে তাদের রক্তে সীসার মাত্রা বেশী পাওয়া গেছে। আরেক গবেষণায় দেখা গেছে, ঢাকার বাজারে বিক্রি হওয়া চালেও সীসার পরিমাণ অনেক বেশী।

বিদেশ

৩০ বছর জেল খাটার পর নির্দোষ প্রমাণিত

মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ৩০ বছর কারাভোগের পর ডিএনএ পরীক্ষায় নির্দোষ প্রমাণিত হয়ে মুক্তি পেয়েছে দুই ভাই। নর্থ ক্যারোলাইনায় ১১ বছর বয়সী এক কিশোরীকে ধর্ষণ ও হত্যার দায়ে ১৯৮৪ সালে দণ্ডিত হয় হেনরী ম্যাককলাম (৫০) ও লিওন ব্রাউন (৪৬)। ঘটনাস্থল থেকে সংগৃহীত ডিএনএ নমুনার সাম্প্রতিক পরীক্ষায় দেখা যায়, ঘটনায় আরেক ব্যক্তি জড়িত। একই ধরনের অপরাধে সেও কারাগারে আছে। এ ঘটনার পর গত ২রা সেপ্টেম্বর নিরপরাধ দুই ভাইকে তাৎক্ষণিকভাবে মুক্তির নির্দেশ দেন আদালত।

ব্রাউনের আইনজীবী অ্যান কারবী বলেন, এটি একটি বিয়োগান্তক ঘটনা। এতে শুধু ঐ দু'ব্যক্তির জীবনের চরম ক্ষতিই হয়নি, বরং আমাদের নর্থ ক্যারোলাইনার বিচারব্যবস্থার উপরও চরমভাবে আঘাত হেনেছে। মামলার সংক্ষিপ্ত বিবরণ থেকে জানা যায়, কিশোরী ধর্ষণ ও হত্যার ঘটনার কয়েক সপ্তাহ পর গ্রেফতার হয়ে চাপের মুখে দু'ভাই পুলিশের কাছে স্বীকারোক্তিমূলক জবানবন্দী দেন। তবে পরে আদালতে তা প্রত্যাহার করে নেন। তারপরও তারা দোষী সাব্যস্ত হন। একজন যাবজ্জীবন অপরজন মৃত্যুদণ্ড প্রাপ্ত হন। কিন্তু তারা উভয়েই নিজেদের নির্দোষ দাবী করে আসছিলেন। ২০১০ সালে নর্থ ক্যারোলাইনার ইনোসেন্স ইনকোয়ারী কমিশন দু'ভাইয়ের মামলাটি তদন্তের জন্য গ্রহণ করে। অবশেষে প্রকৃত সত্য উদঘাটিত হয়।

'আইএস'-এর বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা ওবামার

অভিযানের ব্যাপারে ১০টি আরব দেশের সাথে চুক্তি

কথিত ইসলামিক স্টেট বা 'আইএস'-কে প্রতিহত করতে ইরাক ও সিরিয়াতে বিমান হামলার পরিকল্পনা ঘোষণা করেছেন মার্কিন প্রেসিডেন্ট বারাক ওবামা। জাতির উদ্দেশ্যে দেয়া এক টেলিভিশন ভাষণে তিনি এ কথা জানিয়েছেন।

ইরাক ও সিরিয়ার বিশাল এলাকা ইতিমধ্যেই দখল করে নিয়েছে ইসলামিক স্টেট। সিরিয়ার শহর রাকায় তারা এক ধরনের সরকারী শাসন প্রতিষ্ঠা করেছে বলে জানা যাচ্ছে। সেখানকার প্রশাসনিক কার্যক্রম চালানোসহ নতুন কর্মকর্তাও নিয়োগ দিচ্ছে সংগঠনটি। মার্কিন দুই সাংবাদিক ও বৃটিশ এক সাংবাদিকসহ বিরোধী পক্ষের মানুষজনকে শিরশ্ছেদ করে হত্যার মতো কার্যক্রমের জন্য ব্যাপক নিন্দিত হয়েছে ইসলামিক স্টেট।

এদিকে ইসলামিক স্টেট (আইএস)-এর বিরুদ্ধে নতুন সামরিক অভিযানে সমর্থন দেয়ার জন্য আরব মিত্রদের সঙ্গে সমন্বিত সামরিক অভিযান সংক্রান্ত একটি চুক্তিতে সই করেছে মার্কিন যুক্তরাষ্ট্র। সঊদী আরবের জেদ্দায় আলোচনা শেষে মার্কিন পররাষ্ট্রমন্ত্রী জন কেরি ১০ আরব রাষ্ট্রের সমর্থন আদায় করতে সক্ষম হন। মিসর, ইরাক, জর্দান, লেবানন, সঊদী আরব ও কাতারসহ ছয় উপসাগরীয় রাষ্ট্রের সমর্থন

পায় যুক্তরাষ্ট্র। এই ১০ আরব রাষ্ট্র যুক্তরাষ্ট্রের সঙ্গে সমন্বিত সামরিক অভিযানের মাধ্যমে আইএস-এর কাছ থেকে ইরাক ও সিরিয়ার বিশাল অঞ্চল পুনরুদ্ধার করার ব্যাপারে সম্মত হয়। অনারব সুন্নী মতাবলম্বী শক্তিশালী দেশ তুরস্কও এই আলোচনায় অংশ নিয়েছে। তবে তুরস্কের প্রতিনিধি জেদ্দায় কোন বিবৃতিতে স্বাক্ষর করেনি।

ভারতের পরমাণু কেন্দ্রের ৭০ ভাগ কর্মীর মৃত্যুর জন্য দায়ী ক্যান্সার

বিশ্বে পরমাণু বোমার চেয়েও এখন ভয়ঙ্কর হয়ে উঠেছে পরমাণু গবেষণাকেন্দ্রে কাজ করার ঝুঁকি। এতে প্রতি বছর বিশ্বব্যাপী কত লোক মারা যাচ্ছে তার কোন সঠিক পরিসংখ্যান নেই। আর থাকলেও তা প্রকাশ করা হয় না। কিন্তু এক্ষেত্রে ভারতে মৃত্যুর সংখ্যা নিয়ে একটি লোমহর্ষক খবর পাওয়া গেছে। ভারতের ১৯টি পরমাণু গবেষণা কেন্দ্রে কর্মরত ব্যক্তিদের মধ্যে গত ২০ বছরে স্বাস্থ্যগত কারণে ৩,৮৮৭ ব্যক্তি মারা গেছেন। এদের মধ্যে ২,৬০০ জন অর্থাৎ ৭০ শতাংশই মারা গেছেন ক্যান্সারে। ভারতের তথ্য অধিকার আইন বা আরটিআইয়ের আওতায় এ তথ্য সংগ্রহ করেছেন ভারতের মানবাধিকার কর্মী চেতন কোঠারী। দেশটিতে বার্ষিক মৃত্যুর ৭ শতাংশ তথা ৯৫ লাখ মানুষ মারা যায় ক্যান্সারে। নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক ভারতের এক ক্যান্সার বিশেষজ্ঞ বলেন, সাধারণভাবে ক্যান্সারকে বৃদ্ধ বয়সের অসুখ হিসাবে মনে করা হয়। কিন্তু চাকরিরত অবস্থায় তথা ৬০ বছরের নীচে এত বেশী মানুষ ক্যান্সারে মারা গেলে বিষয়টি উদ্বেগজনক হিসাবেই নিতে হবে।

[পাবনার রূপপুরে পরমাণু গবেষণাকেন্দ্র স্থাপনের ব্যাপারে বাংলাদেশ রাশিয়ার সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হয়েছে। যে রাশিয়া নিজেই ভূপালের চেরনোবিল পরমাণু গবেষণাকেন্দ্রের নিরাপত্তা সামলাতে না পারায় হাযার হাযার মানুষের মৃত্যুর জন্য দায়ী। অতএব ঐরূপ আত্মঘাতি গবেষণা কেন্দ্র স্থাপনের বিষয়টি পুনর্বিবেচনা করুন (স.স.)]

দুনিয়া জুড়ে লড়াই যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের খণ্ডচিত্র

-পোপ ফ্রান্সিস

ক্যাথলিক প্রধান পোপ ফ্রান্সিস গত ১৩ই সেপ্টেম্বর ইতালীর উত্তরে রেদিপাগলিয়ায় প্রথম বিশ্বযুদ্ধে নিহত লক্ষাধিক সেনার জন্য তৈরী স্মৃতিসৌধে প্রদত্ত বক্তব্যে বলেন, দুনিয়া জুড়ে লড়াই চলছে। মনে হয় যেন তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধের খণ্ডচিত্র। তাই তার আর্জি, এবার লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিক সব পক্ষই। তিনি বলেন, যুদ্ধ জিনিসটাই পাগলামী ও অযৌক্তিক। এতে রীতিমতো পরিকল্পনা করে ধ্বংস ডেকে আনা হয়। পোপের অনুরোধ, এবার থামা দরকার। তিনি বলেন, অনেকে শান্তির কথা বলে যুদ্ধ করছে, ধ্বংস ও গণহত্যা চালাচ্ছে। যা কোনভাবেই কাম্য নয়। যুদ্ধকে অমানবিক উল্লেখ করে তিনি আরো বলেন, 'যুদ্ধ শুধু ধ্বংস ডেকে আনে। লোভ, অসহিঞ্চুতা এবং ক্ষমতার লোভ যুদ্ধের ইন্ধন জোগায়'। তবে অভিজ্ঞমহলের ধারণা, পোপের আবেদনে কোন পক্ষই মত পাল্টাবে না। ফলে অদূর ভবিষ্যতে রক্তক্ষয় থামার সম্ভাবনা যে খুব কম, তা বেশ স্পষ্ট।

মুসলিম জাহান

ফিলিপাইনে মুসলমানেরা স্বায়ত্তশাসন পেতে যাচ্ছে

ফিলিপাইনে মুসলমানদের জন্য আলাদা একটি স্বায়ত্তশাসিত এলাকা ঘোষিত হ'তে যাচ্ছে। প্রেসিডেন্ট বেনিগনো অ্যাকুইনো দেশটির কংগ্রেসকে মুসলমানদের জন্য স্বায়ত্তশাসিত একটি এলাকা ঘোষণার জন্য দ্রুত একটি আইন প্রণয়নের নির্দেশ দিয়েছেন। পাঁচ দশকের সহিংসতার অবসান ঘটাতে এই উদ্যোগ নেয়া হচ্ছে। দু'পক্ষের সম্মতিতে গত মার্চে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। দীর্ঘদিনের সহিংসতায় দেশটির এক লাখ ২০ হাযারের বেশী মানুষ নিহত ও ২০ লাখ লোক শরণার্থীতে পরিণত এবং উন্নয়ন কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। অ্যাকুইনো চান, যে কোনভাবে হোক ২০১৬ সালের মধ্যে এটি সম্পন্ন হোক।

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ক্যাথলিক যাজকের ইসলাম গ্রহণ

যুক্তরাষ্ট্রের প্রভাবশালী ক্যাথলিক ধর্মযাজক কার্ডিনাল থিওডোর ম্যাককারিক ইসলাম গ্রহণ করেছেন। তিনি ২০০১ থেকে ২০০৬ সাল পর্যন্ত ওয়াশিংটনের আর্চবিশপ হিসাবে দায়িত্ব পালন করেছেন। ২০০১ সালে তিনি ক্যাথলিকদের শীর্ষস্থানীয় ধর্মযাজক বা কার্ডিনাল পদে উন্নীত হন। গত ১০ই সেপ্টেম্বর ওয়াশিংটনে এক সংবাদ সম্মেলনে পরোক্ষভাবে তিনি ইসলাম গ্রহণের ঘোষণা দেন। 'মুসলিম পাবলিক অ্যাফেয়ার্স কাউন্সিল' আয়োজিত এক অনুষ্ঠান তিনি শুরু করেন 'বিসমিল্লাহির রহমানির রহীম' পাঠ করে।

ম্যাককারিক বলেন, ক্যাথলিক ধর্মের সামাজিক শিক্ষা হচ্ছে মানবিক মর্যাদা। আপনি যদি কুরআন অধ্যয়ন করেন অথবা ইসলাম নিয়ে পড়াশোনা করেন তবে দেখবেন যে, মুহাম্মাদ (ছাঃ) এটাই শিক্ষা দিয়েছেন। তিনি বলেন, 'আমরা সবাই খারাপের বিরুদ্ধে, হত্যাযজ্ঞের বিরুদ্ধে এবং ধ্বংসের বিরুদ্ধে। আল্লাহ এই কাজে আপনাদের সহায়তা করুন।' তিনি আরো বলেন, 'আমরা বিশ্বাস করি ইসলাম এমন একটা ধর্ম যা সকল মানুষকে সাহায্য করে, তাদেরকে হত্যার নির্দেশ দেয় না'।

ইসলাম গ্রহণ সঊদী আরবে আমার সবচেয়ে বড় প্রাপ্তি

-মার্কিন পাইলট

সঊদী আরবে মাত্র এক মাস ধর্মীয় পরিবেশে হৃদ্যতাপূর্ণ আচরণে মুগ্ধ হয়ে ইসলাম গ্রহণ করেছেন মার্কিন ব্যবসায়ী ও বিমানচালক রিচার্ড প্যাটারসন। এখন তার নাম আব্দুল আযীয। যরূরী রোগী সেবার একটি অভিজাত কোম্পানীর মালিক তিনি। আব্দুল আযীয বলেন, 'আমি সঊদী আরবে এসেছিলাম ব্যবসায়িক কারণে। কিন্তু আমি ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে সর্বশক্তিমান আল্লাহ্‌র সাথে আমার জীবনের সেরা ব্যবসাটি করেছি। তিনি যখন নিজ দেশে ছিলেন, তখন টিভি

চ্যানেলগুলোতে ইসলাম সম্পর্কে অনেক নেতিবাচক কথা শুনতেন। এগুলোর উদ্দেশ্য ছিল ইসলামের আসল চিত্র বিকৃত করা। অথচ সঊদী আরবের ধর্মীয় সমাজই তাকে সবচেয়ে বেশী আকর্ষণ করেছে বলে জানান তিনি।

বিমানে যরূরী রোগী বহনে ছাত্রদের প্রশিক্ষণ দিতে সঊদী রেড ক্রিসেন্টের সাথে এক মাসের চুক্তিতে সঊদী আরব আসেন তিনি এবং এক পর্যায়ে ইসলাম গ্রহণ করেন।

আব্দুল আযীয তার ইসলাম গ্রহণ অনুষ্ঠানে আরো বলেন, 'ইসলাম সম্পর্কে বোঝার জন্য শুধু পড়াশুনা করা যথেষ্ট নয়। যারা প্রতিনিধিত্ব করে (ইসলাম সম্পর্কে ভাল জ্ঞান রাখে) তাদের সাথে সাক্ষাতের মাধ্যমে এর অন্তর্নিহিত চেতনা সত্যিকারভাবে প্রতিফলিত হয়'। তিনি নিজেকে ভাগ্যবান বিবেচনা করে বলেন যে, তিনি সঊদী আরবে তার মুসলিম বন্ধুদের সাথে সাক্ষাৎ ও সাথী হওয়ার মাধ্যমে আবিষ্কার করতে পেরেছিলেন ইসলাম ন্যায় ও সহনশীলতার ধর্ম। 'মুসলমানরা বিশেষতঃ সঊদীদেরকে তিনি বিনয়ী ও মুক্ত মনের' উল্লেখ করে বলেন, তিনি তাদের একটি পরিবারের মত অনুভব করেন। তাদের সাথে থাকা অবস্থায় তাদের কাছ থেকে বিছিন্নতা বা নিষ্ঠুরতার কোন অভিজ্ঞতা তিনি পাননি। সঊদী সমাজের ধার্মিকতা তাকে সবচেয়ে বেশী আকৃষ্ট করেছে। ধর্ম তাদের প্রাত্যহিক জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে সম্পর্কযুক্ত থাকতে সাহায্য করে।

তিনি বলেন, 'আমি আশা করি আমার অভিজ্ঞতা থেকে আমার সব অমুসলিম সহকর্মীদের মাঝে ইসলাম সম্পর্কে দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন আনতে পারব'। তিনি সমালোচনা করে বলেন যে, মুসলিম ব্যবসায়ীরা তাদের অমুসলিম সাথীদের এই মহামান্বিত ধর্মের প্রবেশ করানোর ব্যাপারে মোটেও অগ্রগামী নয়। তিনি বলেন, 'আমরা অন্ততঃ আমাদের ব্যবসায়ী সভায় অমুসলিম সহকর্মীদের ইসলামী বই দিতে পারি, যা তাদের মাঝে ইসলামের প্রকৃত চিত্র তুলে ধরতে সাহায্য করবে'।

দুর্নীতির কারণে প্রতি বছর মারা যায় ৩৬ লাখ মানুষ

দুর্নীতি ডেকে আনছে দারিদ্র্য। আর দরিদ্র দেশগুলোতে প্রতিবছর দারিদ্র্যের কারণে মারা যাচ্ছে প্রায় ৩৬ লাখ মানুষ। যুক্তরাষ্ট্র ভিত্তিক একটি দারিদ্র্য দূরীকরণ সংস্থার হিসাব দিয়েছে, দরিদ্র দেশগুলো থেকে প্রতিবছর প্রায় ১ লাখ কোটি ডলার দুর্নীতির মাধ্যমে তুলে নেয়া হয় এবং দুর্নীতির কারণে এই বিপুলসংখ্যক হতভাগ্য মানুষ মৃত্যুর শিকার হয়। সংস্থাটি তাদের প্রতিবেদনে জানায়, দুর্নীতি ও অপরাধ চরম পর্যায়ের দারিদ্র্য মোকাবেলায় দুই দশকের অগ্রগতিকে হুমকির মুখে ফেলেছে। নামসর্বস্ব প্রতিষ্ঠানের নামে অর্থ লুট ও মুদ্রা পাচারও এসব দুর্নীতির মধ্যে রয়েছে। কোন পদক্ষেপ না নিয়ে গোপনীয়তা রক্ষা করায় এসব দুর্নীতি আরো শক্তিশালী হয়েছে।

বিজ্ঞান ও বিস্ময়

কিডনী বিকল করতে পারে কোমল পানীয়

কোল্ড ড্রিংকস পান করলে কিডনী বিকল হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। জাপানের ওসাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা তাদের গবেষণা প্রতিবেদনে জানিয়েছেন, কোল্ডড্রিংকস কিংবা যে কোন সফট ড্রিংকস মানুষের কিডনীর জন্য অত্যন্ত ক্ষতিকর। খাবারে প্রয়োজনের অতিরিক্ত চিনিও কিডনীর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা হ্রাস করে। তারা দেখিয়েছেন, দিনে দু'বোতল কোল্ডড্রিংকস প্রোটিনিউরিয়া বা মূত্রের মাধ্যমে অতিরিক্ত প্রোটিনের নির্গমনের কারণ হয়।

প্রোটিনিউরিয়া কিডনীর স্বাভাবিক কার্যক্ষমতা নষ্ট হওয়ার নির্দেশক। মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রের একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা পরীক্ষা করে দেখেছেন, কোল্ডড্রিংকসে মিষ্টি স্বাদ তৈরী করার জন্য যে পরিমাণ ফরুকটোস সিরাপ ব্যবহার করা হয় তা কিডনী বিকল করতে যথেষ্ট। কিডনীর কোষগুলো অতিরিক্ত লবণ পুনঃশোষণ করে। এছাড়া এর ফলে, ডায়াবেটিস, স্থূলতা, হাইপার টেনশনও ব্যাপকহারে বৃদ্ধি পায়।

স্মার্টফোনে নিয়ন্ত্রিত হবে রোবট ভ্যাকুয়াম ক্লিনার

প্রযুক্তি নির্মাতাপ্রতিষ্ঠান ডাইসন ১৬ বছর গবেষণার ভিত্তিতে প্রথমবারের মতো নিয়ে এসেছে স্মার্টফোনের সাহায্যে নিয়ন্ত্রণের উপযোগী স্বয়ংক্রিয় বা রোবটচালিত একটি ভ্যাকুয়াম ক্লিনার। ঘরবাড়ি পরিষ্কার করার কাজে এই রোবটচালিত ভ্যাকুয়াম ক্লিনার 'বৈপ্লবিক পরিবর্তন' আনবে বলে ধারণা করা হচ্ছে। বাড়ির লোকজন ঘরের বাইরে থাকা অবস্থায়ও যন্ত্রটি স্মার্টফোনের নির্দেশনা অনুযায়ী নির্দিষ্ট স্থান বা আসবাব পরিষ্কার করে রাখতে পারবে। উচ্চক্ষমতার প্রযুক্তি ব্যবহার করে তৈরী যন্ত্রটি কার্যকরভাবে ময়লা পরিষ্কার করে সত্যি সত্যিই মানুষের শ্রম অনেক বাঁচিয়ে দিতে পারবে বলে নির্মাতারা দাবী করছেন।

জাপানে আগামী বছর এটি বিক্রি শুরু করা হবে। ডাইসন ৩৬০ আই তৈরীর গবেষণায় মোট দু'কোটি ৮০ লাখ ব্রিটিশ পাউন্ড খরচ হয়েছে। এ প্রকল্পে ডাইসনের দুই শতাধিক প্রকৌশলী কাজ করেছেন। যন্ত্রটির চোখ তৈরীতে বীজগণিত, সম্ভাব্যতার তত্ত্ব, জ্যামিতি ও ত্রিকোণমিতি সমন্বিতভাবে প্রয়োগ করা হয়েছে। ঘূর্ণনের প্রযুক্তিটি তৈরীর কাজে ৩১ জন সফটওয়্যার প্রকৌশলী এক লাখ ঘণ্টারও বেশী সময় ব্যয় করেছেন।

ভারতে আঁটি ছাড়া আম উদ্ভাবন

আঁটি ছাড়া আম উদ্ভাবন করেছেন ভারতের বিহার রাজ্যের ভাগলপুর কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ের গবেষকরা। তারা উৎপাদন করেছেন প্রায় আঁটি ছাড়া এই আম। ছয় মিলিমিটার আকারের বরইয়ের আঁটির মতো বা তার চেয়ে ছোট আঁটি আছে এই আমে। গবেষকরা জানিয়েছেন, নতুন উৎপাদন করা এই আমের ৯৫ শতাংশই খাওয়া যাবে।

Contents

সংগঠন সংবাদ

আন্দোলন

কর্মী সম্মেলন ২০১৪
তাওহীদভিত্তিক সমাজ প্রতিষ্ঠায় আত্মনিয়োগ করুন

-বার্ষিক কর্মী সম্মেলনে আমীরে জামা'আত

রাজশাহী ২৮ ও ২৯শে আগস্ট বৃহস্পতি ও শুক্রবার : অদ্য বৃহস্পতিবার বিকাল সাড়ে ৪-টায় **'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'**-এর ২ দিনব্যাপী বার্ষিক কর্মী সম্মেলন ২০১৪ রাজশাহীর নওদাপাড়াস্থ প্রস্তাবিত দারুলহাদীছ বিশ্ববিদ্যালয় (প্রাঃ) জামে মসজিদে শুরু হয়। সম্মেলনে উদ্বোধনী ভাষণে মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব** উপরোক্ত কথা বলেন। তিনি বলেন, ধর্মীয়, রাজনৈতিক ও সামাজিক জীবনের সর্বত্র মানুষের দাসত্বের স্থলে আল্লাহর দাসত্ব বরণের মাধ্যমেই কেবল জাতীয় উন্নতি ও অগ্রগতি নিশ্চিত হওয়া সম্ভব। উক্ত বিষয়ে সমাজকে সচেতন করে তোলার জন্য তিনি কর্মীদের প্রতি আহ্বান জানান।

দু'দিন ব্যাপী এই কর্মী সম্মেলনে স্বাগত ভাষণ পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম। সম্মেলনে পূর্ব নির্ধারিত বিষয়ে বক্তব্য রাখেন কেন্দ্রীয় সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, যুববিষয়ক সম্পাদক অধ্যাপক আমীনুল ইসলাম, গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক অধ্যাপক আব্দুল লতীফ, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম, আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী'র ভারপ্রাপ্ত অধ্যক্ষ মাওলানা আব্দুল খালেক সালাফী, শিক্ষক মাওলানা আব্দুর রাযযাক বিন ইউসুফ, ঢাকা যেলা 'আন্দোলন'-এর সাবেক সভাপতি মাওলানা আমানুল্লাহ বিন ইসমাঈল, খুলনা যেলা সভাপতি মাওলানা জাহাঙ্গীর আলম, সাতক্ষীরা যেলা সভাপতি মাওলানা আব্দুল মান্নান, 'সোনামণি' পরিচালক আব্দুল হালীম বিন ইলয়াস প্রমুখ। 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় মজলিসে শূরা সদস্যদের পক্ষ থেকে বক্তব্য পেশ করেন অধ্যাপক শেখ রফীকুল ইসলাম।

সম্মেলনে যেলা সভাপতি ও প্রতিনিধিগণের মধ্যে বক্তব্য রাখেন 'আন্দোলন'-এর কুমিল্লা যেলা সভাপতি মাওলানা ছফিউল্লাহ, জামালপুর-দক্ষিণ যেলা সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান, বগুড়া যেলা সভাপতি মুহাম্মাদ আব্দুর রহীম, জয়পুরহাট যেলা সভাপতি মাহফূযুর রহমান, ঢাকা যেলার সাংগঠনিক সম্পাদক মাওলানা সাইফুল ইসলাম বিন হাবীব, কক্সবাজার যেলা সভাপতি এডভোকেট শফীউল আলম প্রমুখ। উক্ত অনুষ্ঠানে ৪০টি যেলা থেকে সহস্রাধিক কর্মী অংশগ্রহণ করেন।

দু'দিন ব্যাপী কর্মী সম্মেলনের বিভিন্ন অধিবেশনে পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম, সাংগঠনিক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম, প্রচার সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ সাখাওয়াত হোসাইন, জামালপুর-দক্ষিণ যেলা সভাপতি অধ্যাপক বযলুর রহমান ও রাজশাহীর মোহনপুর উপযেলা সভাপতি মাওলানা দুর্রুল হুদা।

সম্মেলনের পক্ষ থেকে নিম্নোক্ত দাবী সমূহ বাস্তবায়নের জন্য সরকারের নিকট পেশ করা হয়। সেগুলি পাঠ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

১। পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছের আলোকে দেশের আইন ও শাসন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

২। দল ও প্রার্থীবিহীন নেতৃত্ব নির্বাচন ব্যবস্থা চালু করতে হবে।

৩। মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের সিলেবাসে 'হাদীছ ফাউণ্ডেশন বাংলাদেশ' কর্তৃক প্রকাশিত/অনুমোদিত বই সমূহ অন্তর্ভুক্ত করতে হবে।

৪। মাদরাসার সিলেবাসে আরবী ও ইসলামী বিষয় সমূহের বাইরে অতিরিক্ত সিলেবাসের বোঝা হ্রাস করতে হবে। বিশেষ করে ২০০ নম্বরের সৃজনশীল ইংরেজী বিষয় বাধ্যতামূলক করার বিধান বাতিল করতে হবে।

৫। অত্র সম্মেলন মধ্যপ্রাচ্যের বিষফোঁড়া অবৈধ ইহুদী রাষ্ট্র ইসরাঈল কর্তৃক অবরুদ্ধ গাযায় মুসলিম নর-নারীর উপর বর্বরোচিত হামলা ও নৃশংস হত্যাযজ্ঞ বন্ধে কার্যকর ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য জাতিসংঘ, আরব লীগ ও ওআইসির প্রতি জোর দাবী জানাচ্ছে।

৬। অত্র সম্মেলন স্কুলে ভর্তি না হলে ইয়াতীম মাদরাসা ছাত্রদের কেপিটেশন গ্র্যান্ট বাতিলের সরকারী সিদ্ধান্ত প্রত্যাহারের জোর দাবী জানাচ্ছে।

কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন

রাজশাহী ২৯শে আগস্ট শুক্রবার : অদ্য সকাল ৮-টায় আল-মারকাযুল ইসলামী আস-সালাফী, নওদাপাড়া, রাজশাহীর পূর্ব পার্শ্বস্থ মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ'-এর কেন্দ্রীয় পরিষদ সদস্য সম্মেলন মুহতারাম আমীরে জামা'আত **প্রফেসর ড. মুহাম্মাদ আসাদুল্লাহ আল-গালিব**-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হয়। সম্মেলনে বিগত এক বছরের অডিট রিপোর্ট, ও বার্ষিক পরিকল্পনা (২০১৪-২০১৫) পেশ করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় অর্থ সম্পাদক বাহারুল ইসলাম ও সাংগঠনিক সম্পাদক অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম। সম্মেলন পরিচালনা করেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় সেক্রেটারী জেনারেল অধ্যাপক মাওলানা নূরুল ইসলাম।

সুধী সমাবেশ

সরজগঞ্জ, চুয়াডাঙ্গা ৯ সেপ্টেম্বর মঙ্গলবার : অদ্য বাদ মাগরিব চুয়াডাঙ্গা সদর থানাধীন সরজগঞ্জ বাজার জামে মসজিদে 'আহলেহাদীছ আন্দোলন বাংলাদেশ' চুয়াডাঙ্গা যেলার উদ্যোগে এক সুধী সমাবেশ অনুষ্ঠিত হয়। যেলা 'আন্দোলন'-এর সভাপতি মুহাম্মাদ সাঈদুর রহমানের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত উক্ত সুধী সমাবেশে প্রধান অতিথি হিসাবে উপস্থিত ছিলেন 'আন্দোলন'-এর কেন্দ্রীয় প্রশিক্ষণ সম্পাদক ড. মুহাম্মাদ কাবীরুল ইসলাম। অন্যান্যের মধ্যে বক্তব্য পেশ করেন ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর মুবাল্লিগ মুহাম্মাদ রবীউল ইসলাম, চুয়াডাঙ্গা যেলার কর্মী হাফেয কামারুযযামান প্রমুখ। অনুষ্ঠানে চুয়াডাঙ্গা ও ঝিনাইদহ যেলা 'আন্দোলন'-এর দায়িত্বশীলবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন। সমাবেশে চুয়াডাঙ্গা ও পার্শ্ববর্তী যেলা ঝিনাইদহ থেকে বিপুল সংখ্যক কর্মী ও সুধী যোগদান করেন। অনুষ্ঠানে সঞ্চালক ছিলেন যেলা 'আন্দোলন'-এর সহ-সভাপতি একেএম গোলাম সাকলাইন রোকন।

প্রশ্নোত্তর

দারুল ইফতা
হাদীছ ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ

প্রশ্ন (১/১) : ইসলাম গ্রহণ করায় জনৈকা মহিলা স্বীয় খৃষ্টান পিতা-মাতাসহ গোটা পরিবার কর্তৃক পরিত্যক্ত। খৃষ্টান রাষ্ট্র হওয়ায় সরকারী অলীও নেই। এক্ষণে অভিভাবকবিহীন উক্ত মহিলাকে বিবাহ করতে চাইলে করণীয় কি?

-রোকনুযযামান, চারঘাট, রাজশাহী।

উত্তর : অমুসলিম পিতা-মাতা, কিংবা ভাই ও চাচারা অভিভাবক হওয়ার যোগ্য নয়। এমতাবস্থায় স্থানীয় মুসলিম নেতা বা মসজিদের ইমাম তার অভিভাবক হবেন। শরী'আতে মুসলিম অভিভাবকের অবর্তমানে মুসলিম শাসকের কথা এসেছে *(ইবনু মাজাহ হা/১৮৮০, মিশকাত হা/৩১৩১)*। এর মধ্যে সকল পর্যায়ের মুসলিম নেতৃবৃন্দ অন্তর্ভুক্ত। ইবনে কুদামা (রহঃ) বলেন, কোন কাফের কোন মুসলিম নারীর অলী হতে পারবে না। এক্ষণে যদি কোন মুসলিম শাসক বা নেতা পাওয়া না যায়, তবে কোন ন্যায়পরায়ণ মুমিন ব্যক্তি উক্ত মহিলার সম্মতিক্রমে তাকে বিবাহ দিবে *(মুগনী ৭/২৭, ১৮)*।

প্রশ্ন (২/২) : জনৈক আলেম বলেন, সূরা ফাতিহা কুরআনের অংশ নয়। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-হাসনাহেনা, নরসিংদী।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য ভিত্তিহীন। রাসূল (ছাঃ) সূরা ফাতিহাকে পবিত্র কুরআনের সর্বাপেক্ষা মর্যাদা সম্পন্ন সূরা হিসাবে উল্লেখ করেছেন *(বুখারী হা/৪৪৭৪, মিশকাত হা/২১১৮)*।

প্রশ্ন (৩/৩) : জ্যোতিষশাস্ত্র সম্পর্কে শরী'আতের নির্দেশনা কি? জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আলমগীর প্রামাণিক, ব্রাক ব্যাংক, রংপুর।

উত্তর : জ্যোতিষশাস্ত্র হ'ল কিছু পদ্ধতি, প্রথা এবং বিশ্বাসের সমষ্টি, যাতে মহাকাশে নক্ষত্রসমূহের আপেক্ষিক অবস্থান এবং তৎসংশ্লিষ্ট তথ্যাদির মাধ্যমে মানব জীবন, মানুষের ব্যক্তিত্ব এবং মানবীয় ও বহির্জাগতিক ঘটনাবলী সম্পর্কে ভবিষ্যদ্বাণী করা হয়। এখানে জ্যোতিষ্কসমূহের আপেক্ষিক অবস্থান পৃথিবীতে বসবাসকারী মানুষের জীবনধারায় প্রভাব বিস্তার করে বলে বিশ্বাস করা হয়। আর জ্যোতির্বিজ্ঞান জ্যোতিষশাস্ত্র থেকে পৃথক একটি বিষয়, যেখানে মহাকাশের বস্তু সমূহ নিয়ে গবেষণা করা হয়। জ্যোতিষশাস্ত্র দ্বারা ভবিষ্যদ্বাণী করা এবং তাতে বিশ্বাস স্থাপন করা শিরক। কেননা নক্ষত্রের কোন ক্ষমতা নেই মানুষের ভাল-মন্দ করার আল্লাহর হুকুম ব্যতীত। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, 'যে ব্যক্তি গণকের কাছে গেল এবং সে যা বলে তা বিশ্বাস করল, ঐ ব্যক্তি মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে, তার সাথে কুফরী করল' *(আহমাদ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪৫৯৯ সনদ ছহীহ)*। তিনি বলেন, যে ব্যক্তি গণৎকারের কাছে যায় এবং (সত্য ভেবে) তার কাছে কোন কথা জিজ্ঞেস করে, তার চল্লিশ দিনের ছালাত কবুল হয় না' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৯৫)*। একদিন কিছু লোক রাসূল (ছাঃ)-কে গণৎকারদের সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন, ওরা কিছুই নয়। লোকেরা বলল, এদের কথা যে অনেক সময় সত্য হয়?'। রাসূল (ছাঃ) বললেন, ওরা আকাশে ফেরেশতাদের আলোচনা থেকে কিছু কথা চুরি করে এনে দুনিয়ায় তার বন্ধুর কানে ভরে দেয়। তারপর ঐ জ্যোতিষী বন্ধু তাতে শত মিথ্যা যোগ করে মানুষকে শুনায় *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৫৯২-৯৩, 'জ্যোতিষীর গণনা' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৪/৪) : ঠিকাদারী পেশা শরী'আতসম্মত হবে কি?

-আব্দুল জলীল, জলঢাকা, নীলফামারী।

উত্তর : নিম্নোক্ত শর্তাবলী মেনে চললে ঠিকাদারী পেশা শরী'আতসম্মত হবে। (১) মালিকের সাথে কৃত শর্তমাফিক কাজ শেষ করতে হবে *(মায়েদাহ ৫/১)*। (২) কোনরূপ অন্যায় ও ধোঁকার আশ্রয় নেওয়া যাবে না *(মুসলিম হা/১০২, ২৯৪; মিশকাত হা/২৮৬০, ৩৫২০)*। আল্লাহ বলেন, 'হে ঈমানদারগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে অন্যের সম্পদ ভক্ষণ করো না, উভয়ের সন্তুষ্টিতে ব্যবসার মাধ্যমে উপার্জিত সম্পদ ব্যতীত' *(নিসা ২৯)*।

প্রশ্ন (৫/৫) : পৃথিবীতে সবসময়ই কোন না কোন স্থানে রাতের তৃতীয় প্রহর থাকে। ছহীহ হাদীছ অনুযায়ী আল্লাহ এ সময় দুনিয়ার আসমানে নামেন। এক্ষণে তিনি কি তাহ'লে সর্বদাই নিম্ন আকাশে থাকেন?

-ইশফাক তামীম, লালপুর, নাটোর।

উত্তর : আল্লাহ আরশে সমুন্নীত এবং তিনি অবশ্যই অবতরণ করেন, যেভাবে অবতরণ করা তাঁর মর্যাদার উপযোগী হয়। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, আল্লাহ প্রতি রাতের তৃতীয় প্রহরে নিম্ন আকাশে অবতরণ করেন এবং ফজর পর্যন্ত বান্দাদের প্রতি আহ্বান জানিয়ে বলেন, কে আছ আমাকে আহ্বানকারী, আমি তার আহ্বানে সাড়া দেব। কে আছ আমার কাছে চাইবে, আমি তাকে দান করব। কে আছ আমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করবে, আমি তাকে ক্ষমা করব'। এভাবে বলতে থাকেন যতক্ষণ না ফজরের আলো স্পষ্ট হয়' *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/১২২৩; মুসলিম হা/৭৫৮)*। হাদীছটি মুতাশাবিহ। যার অর্থ স্পষ্ট। কিন্তু ধরণ অস্পষ্ট। অতএব আয়াতের প্রকাশ্য অর্থের উপর ঈমান রাখা আবশ্যক। অস্পষ্ট বিষয়ের পিছনে ছুটতে আল্লাহ নিষেধ করেছেন *(আলে ইমরান ৭, ইসরা ৩৬)*। আল্লাহ্র কুরসী আকাশ ও পৃথিবীকে পরিবেষ্টন করে আছে *(বাক্বারাহ ২৫৫)*। তাঁর তুলনীয় কিছুই নেই। তিনি সবকিছু শোনেন ও দেখেন' *(শূরা ১১)*। তাঁর গুণাবলী সম্পর্কে পবিত্র কুরআন ও ছহীহ হাদীছ সমূহে যা কিছু বর্ণিত হয়েছে, সবকিছু প্রকাশ্য অর্থে বিশ্বাস করতে হবে কোনরূপ পরিবর্তন, প্রকৃতি নির্ধারণ, শূন্যকরণ, তুলনাকরণ বা ন্যস্তকরণ ছাড়াই *(আলোচনা দ্রঃ 'আহলেহাদীছ আন্দোলন' থিসিস, পৃঃ ১১৭)*। মানবজাতিকে আল্লাহ তাঁর অসীম জ্ঞানের খুব সীমিত অংশই দান করেছেন। তাছাড়া পঞ্চ ইন্দ্রিয় দ্বারা প্রভাবিত

Contents

মানুষের জ্ঞান ত্রুটিহীন নয়। সুতরাং গায়েবের বিষয় নিয়ে চিন্তা-গবেষণা করা নিতান্তই নির্বুদ্ধিতার পরিচায়ক। বরং ছহীহ হাদীছটির প্রতি পূর্ণ বিশ্বাস রেখে আল্লাহ্র ইবাদতে রত হ'তে হবে।

প্রশ্ন (৬/৬) : বর্তমানে প্রচলিত আউটসোর্সিং পেশা গ্রহণে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-কাওছার আহমাদ, ভেলাবাড়ী, রাজশাহী।

উত্তর : এটি ইন্টারনেটের মাধ্যমে করা একটি ব্যবসার নাম, যা ঘরে বসে করা যায়। অনলাইনে এরূপ অনেক ফ্রিল্যান্সিং কোম্পানী রয়েছে যেমন ওডেস্ক, এলান্স, ল্যান্সটেক, ফ্রিল্যান্সার ইত্যাদি। এ কোম্পানীগুলিতে কোনরূপ ফি ছাড়াই রেজিস্ট্রেশন করে স্বীয় যোগ্যতা অনুযায়ী ওয়েব ডিজাইন, গ্রাফিক্স, ডাটাএন্ট্রি ইত্যাদি কাজ পাওয়ার জন্য আবেদন করতে হয়। বিশ্বের বিভিন্ন স্থান থেকে বিভিন্ন কোম্পানী পসন্দ অনুযায়ী অনলাইনে এসব কোম্পানীর মাধ্যমে কাজ দেয় এবং নির্ধারিত হারে পারিশ্রমিক প্রদান করে। স্বীয় কর্মদক্ষতা ও পরিশ্রমের বিনিময়ে এখানে উপার্জন করতে হয়। এরূপ আউটসোর্সিং-এর মাধ্যমে আয় করায় শরী'আতে কোন বাধা নেই। তবে সর্বদা 'নেকী ও আল্লাহভীরুতার কাজে সহযোগিতা কর এবং পাপ ও সীমালংঘনের কাজে সহযোগিতা করো না' *(মায়েদাহ ২)* এ নির্দেশ মেনে চলতে হবে। যেমন এ্যালকোহল, নষ্ট সিনেমা, অন্যায় ও অশ্লীল কোন কাজ বা কোন সূদী প্রতিষ্ঠানের কাজে অংশগ্রহণ ইত্যাদি।

প্রশ্ন (৭/৭) : হযরত ওমর (রাঃ) সম্পর্কে শোনা যায় তিনি রাতে প্রজাদের অবস্থা দেখার সময় জনৈক মাকে শুন্য হাড়ি চড়িয়ে ক্ষুধার্ত শিশুদের সান্ত্বনা দেওয়ার দৃশ্য দেখে স্বয়ং বায়তুল মাল থেকে পিঠে খাদ্যদ্রব্য বহন করে তাদের খাবারের ব্যবস্থা করেছিলেন। এ ঘটনার কোন সত্যতা আছে কি?

-দেলোয়ার হোসাইন
কুঠিবাড়ী, কমলাপুর, ফরিদপুর।

উত্তর : এ ঘটনা বিভিন্ন ইতিহাস গ্রন্থে বিভিন্ন সূত্রে বর্ণিত হয়েছে। যেমন ইবনু জারীর ত্বাবারী, তারীখুর রুসুল ওয়াল মুলূক ৪/২০৫; আহমাদ দীনাওয়ারী, আল-মুজালাসাহ ২/৮; খাত্ত্বাবী, গারীবুল হাদীছ ২/৫২; ইবনু আসাকির, তারীখু দিমাশক ৪৪/৩৫২-৩৫৩ ইত্যাদি। ত্বাবারী সংকলিত বর্ণনাটির সনদ জাইয়িদ। অতএব ঘটনাটি গ্রহণযোগ্য।

প্রশ্ন (৮/৮) : ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া কিভাবে মৃত্যুবরণ করেছিলেন? তার মৃত্যুর ব্যাপারে যেসব কাহিনী প্রচলিত আছে, তার কোন ভিত্তি আছে কি?

-আব্দুল ওয়ারেছ, নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়া ৬৪ হিজরীর ১৪ই রবীউল আউয়াল ৩৫ বা ৩৮ বছর বয়সে মৃত্যুবরণ করেন *(ইবনু কাছীর, আল-বিদায়াহ ওয়ান নিহায়াহ ৮/২৪৭)*। মৃত্যুকালে ইয়াযীদের শেষ কথা ছিল, 'হে আল্লাহ! আমাকে পাকড়াও করো না ঐ বিষয়ে যা আমি চাইনি এবং আমি প্রতিরোধও করিনি এবং আপনি আমার ও ওবায়দুল্লাহ বিন যিয়াদের মধ্যে ফায়ছালা করুন' *(আল-বিদায়াহ ৮/২৩৯ পৃঃ)*।

তার মৃত্যু সম্পর্কে যে বলা হয়ে থাকে যে, তিনি শিকারে বের হলে হিংস্র পশুর হামলায় তাকে নির্যাতিত হয়ে মৃত্যু বরণ করতে হয়। এসব কথা বিশুদ্ধ সূত্রে প্রমাণিত নয়। বরং এগুলি শী'আদের অতিরঞ্জন মাত্র। ইবনু আসাকির স্বীয় 'তারীখে' ইয়াযীদকে মদখোর, ছালাত ত্যাগকারী, ফাসেক ইত্যাদি মন্দ স্বভাবের বর্ণনায় যে সব উদ্ধৃতি পেশ করেছেন, সে সম্পর্কে ইবনু কাছীর বলেন, وَقَدْ أَوْرَدَ ابْنُ عَسَاكِرَ أَحَادِيثَ فِي ذَمِّ يَزِيدَ بْنِ مُعَاوِيَةَ كُلُّهَا مَوْضُوعَةٌ لَا يَصِحُّ شَيْءٌ مِنْهَا 'ইয়াযীদের মন্দ স্বভাব সম্পর্কে ইবনু আসাকির বর্ণিত উক্তি সমূহের সবগুলিই জাল। যার একটিও বিশুদ্ধ নয় *(আল-বিদায়াহ ৮/২৩৪ পৃঃ)*।

ইয়াযীদ বিন মু'আবিয়াহ-র চরিত্র সম্পর্কে হুসায়েন (রাঃ)-এর অন্যতম বৈমাত্রেয় ছোট ভাই ও শী'আদের খ্যাতনামা ইমাম মুহাম্মাদ ইবনুল হানাফিইয়াহ (রাঃ) বলেন, 'আমি তাঁর মধ্যে ঐ সব বিষয় দেখিনি, যেসবের কথা তোমরা বলছ। অথচ আমি তাঁর নিকটে হাযির থেকেছি ও অবস্থান করেছি এবং তাঁকে নিয়মিতভাবে ছালাতে অভ্যস্ত ও কল্যাণের আকাংখী দেখেছি। তিনি 'ফিক্বহ' বিষয়ে আলোচনা করেন এবং তিনি সুন্নাতের পাবন্দ ছিলেন' *(আল-বিদায়াহ ৮/২৩৬)*।

এছাড়া সমুদ্র অভিযান এবং রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ে অংশগ্রহণকারীদেরকে রাসূল (ছাঃ) ক্ষমাপ্রাপ্ত ও তাদের জন্য জান্নাত ওয়াজিব বলে ঘোষণা করেছেন *(বুখারী হা/২৯২৪, 'জিহাদ' অধ্যায় 'রোমকদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ' অনুচ্ছেদ)*। মুহাল্লাব বলেন, এই হাদীছের মধ্যে হযরত মু'আবিয়া (রাঃ) ও তাঁর পুত্র ইয়াযীদ-এর মর্যাদার প্রতি ইঙ্গিত রয়েছে। কেননা হযরত ওছমান (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (২৩-৩৫ হিঃ) সিরিয়ার গভর্ণর থাকাকালীন সময়ে মু'আবিয়া (রাঃ) ২৭ হিজরী সনে রোমকদের বিরুদ্ধে ১ম সমুদ্র অভিযান করেন। অতঃপর মু'আবিয়া (রাঃ)-এর খেলাফতকালে (৪১-৬০হিঃ) ৫১ হিজরী মতান্তরে ৪৯ হিজরী সনে ইয়াযীদের নেতৃত্বে রোমকদের রাজধানী কনস্টান্টিনোপল বিজয়ের উদ্দেশ্যে যুদ্ধাভিযান প্রেরিত হয় *(ইবনু হাজার, ফৎহুল বারী ৬/১২০-২১)*।

ইবনু কাছীর বলেন, ইয়াযীদের সেনাপতিত্বে পরিচালিত উক্ত অভিযানে স্বয়ং হুসায়েন (রাঃ) অংশ গ্রহণ করেন *(আল-বিদায়াহ ৮/১৫৩ পৃঃ)*। এতদ্ব্যতীত যোগদান করেছিলেন আব্দুল্লাহ বিন ওমর, আব্দুল্লাহ বিন আব্বাস, আব্দুল্লাহ বিন যুবায়ের, আবু আইয়ূব আনছারী প্রমুখ খ্যাতনামা ছাহাবীগণ *(ইবনুল আছীর, 'আল-কামেল ফিত-তারীখ' ৩/৫৭; দ্রষ্টব্যঃ আশূরায়ে মুহাররম ও আমাদের করণীয়' বই)*।

প্রশ্ন (৯/৯) : আমাদের এলাকায় প্রতিযোগিতামূলক খেলা হয়, যেখানে সকল দলের নিকট থেকে ১০০ টাকা করে চাঁদা নেওয়া হয়। সে টাকা দিয়ে আয়োজনের খরচ এবং পুরস্কার ক্রয় করা হয়। এরূপ আয়োজনে অংশগ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-মশিউর রহমান
গোমস্তাপুর, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : এটাতে কোন দোষ নেই। স্রেফ স্বাস্থ্যরক্ষা ও বিনোদনের জন্য জুয়া ও অপচয়মুক্ত খেলাধূলার আয়োজনে

ও তাতে অংশগ্রহণে শরী'আতে কোন বাধা নেই। কিন্তু কোন খেলা যদি সাময়িক শরীর চর্চার বদলে কেবল সময়ের অপচয়, স্বাস্থ্যের জন্য ক্ষতিকর এবং ঐ ব্যক্তি যদি দ্বীন থেকে গাফেল বা দায়িত্ব থেকে বিস্মৃত হয় কিংবা তাতে জুয়া মিশ্রিত হয়, তখন ঐ খেলা হারামে পরিণত হয়। যেমন একদিন দু'জন আনছার ছাহাবী তীর নিক্ষেপ প্রতিযোগিতা করছিলেন। হঠাৎ একজন বসে পড়লেন। তখন অপরজন বিস্মিত হয়ে বললেন, কি ব্যাপার। কষ্ট হয়ে গেল নাকি? জবাবে তিনি বললেন, 'না। আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে বলতে শুনেছি যে, প্রত্যেক বস্তু যা আল্লাহ্র স্মরণকে ভুলিয়ে দেয়, সেটাই অনর্থক কাজ (لَهْو) ... *(নাসাঈ, ছহীহাহ হা/৩১৫)*। এতে বুঝা যায় যে, বৈধ খেলাও যদি আল্লাহ্র স্মরণকে ভুলিয়ে দেয়, তবে সেটাও জায়েয হবে না। ইমাম বুখারী (রহঃ) অনুচ্ছেদ রচনা করেছেন, 'প্রত্যেক খেলাধূলা (لَهْو) বাতিল, যদি তা আল্লাহ্র আনুগত্য থেকে উদাসীন করে দেয়' *(ফাৎহুলবারী 'অনুমতি গ্রহণ' অধ্যায় ৭৯, অনুচ্ছেদ ৫২; ১১/৯৪ পৃঃ)*।

প্রশ্ন (১০/১০) : গোপন শিরক বলতে কি বুঝায় এবং তা কি কি? এথেকে বাঁচার উপায় কি?

-আফযাল, মাটিয়ানী, পীরগঞ্জ, রংপুর।

উত্তর : গোপন শিরক হ'ল যা বাহ্যিকভাবে দেখা যায় না। ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, যা অন্ধকার রাতে কালো পাথরের উপর কালো পিঁপড়ার বিচরণের চেয়েও গোপন' *(ইবনু কাছীর)*। উক্ত শিরক সাধারণতঃ নিয়ত বা সংকল্পের মাধ্যমে হয়ে থাকে। আর তা হ'ল, রিয়া বা লোক দেখানো আমল করা। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূল (ছাঃ) বের হয়ে আমাদের নিকটে আসলেন। এমতাবস্থায় আমরা দাজ্জাল সম্পর্কে আলোচনা করছিলাম। তখন রাসূল (ছাঃ) আমাদেরকে বললেন, আমি কি তোমাদেরকে দাজ্জালের চেয়েও অধিক ভয়ংকর কিছুর সংবাদ দিব? আমরা বললাম, হ্যাঁ। তিনি বললেন, তা হ'ল, الشِّرْكُ الْخَفِىُّ 'গোপন শিরক'। কোন ব্যক্তি ছালাতে দাঁড়ালে যখন অন্য ব্যক্তি তার ছালাতের দিকে লক্ষ্য করে, তখন সে আরও সুন্দরভাবে ছালাত আদায় করে' *(মুসনাদে আহমাদ হা/১১২৭০; ইবনু মাজাহ হা/৪২০৪; মিশকাত হা/৫৩৩৩)*। অতএব লোক দেখানো প্রত্যেকটি আমলই গোপন শিরক, যা থেকে বেঁচে থাকা আমাদের জন্য অবশ্য কর্তব্য।

এছাড়া কথার মাধ্যমে উক্ত শিরক হয়ে থাকে। যা ব্যক্তির অগোচরে তার নিয়তের মধ্যে ঢুকে পড়ে। যেমন ইবনু আব্বাস (রাঃ) উদাহরণ দিয়ে বলেন, যেমন কেউ বলল, আল্লাহ্র কসম এবং হে অমুক! তোমার ও আমার জীবনের কসম। অথবা বলল, যদি এই কুকুরটা না থাক, তাহ'লে আমাদের কাছে চোর আসত। অথবা কেউ কাউকে বলল, যা আল্লাহ চান ও আপনি চান। অথবা যদি আল্লাহ না থাকতেন ও অমুক না থাকত। তিনি বলেন, তুমি তোমার কথায় 'অমুক'-কে যোগ করো না। কেননা এগুলি সবই শিরক। হাদীছে এসেছে, একদিন জনৈক ব্যক্তি এসে রাসূল (ছাঃ)-কে বলল, যদি আল্লাহ চান ও আপনি চান। উত্তরে রাসূল (ছাঃ) বললেন, 'তুমি কি আমাকে আল্লাহ্র সাথে শরীক করছ? *(আহমাদ, আদাবুল মুফরাদ হা/৭৮৩; ইবনু কাছীর, তাফসীর বাক্বারাহ ২২)*। উছায়মীন বলেন, ব্যক্তির বিশ্বাস অনুযায়ী এগুলি বড় অথবা ছোট শিরকে পরিণত হয় *(আল-ক্বাওলুল মুফীদ ২/৩২৩)*। অতএব এগুলি থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

নিম্নোক্ত দো'আটি পাঠ করলে ছোট-বড় সকল প্রকার শিরক থেকে বাঁচা যায়।- اللَّهُمَّ إِنِّي أَعُوذُ بِكَ أَنْ أُشْرِكَ بِكَ وَأَنَا أَعْلَمُ وَأَسْتَغْفِرُكَ لِمَا لاَ أَعْلَمُ ('হে আল্লাহ! জেনেশুনে তোমার সাথে শিরক করা থেকে আমি তোমার আশ্রয় প্রার্থনা করছি এবং অজ্ঞতাবশে শিরক করা থেকে আমি তোমার নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি' *(আল-আদাবুল মুফরাদ হা/৭১৬; ছহীহুল জামে' হা/৩৭৩১,)*।

প্রশ্ন (১১/১১) : ব্রাক, আশা, প্রশিকা, কারিতাস, ওয়ার্ল্ড ভিশন ইত্যাদি এনজিও প্রদত্ত বাথরুম নির্মাণের উপকরণ সমূহ গ্রহণ করা জায়েয হবে কি?

-শহীদুল ইসলাম
মোগলাহাট, লালমণিরহাট।

উত্তর : সাধারণভাবে এগুলি গ্রহণ করা জায়েয। কেননা রাসূল (ছাঃ) অমুসলিমদের নিকট থেকে উপহার গ্রহণ করেছেন। আবু হুমায়েদ বর্ণনা করেন যে, আয়লার শাসক নবী করীম (ছাঃ)-কে একটি সাদা খচ্চর উপহার দিয়েছিলেন এবং তিনি তা গ্রহণ করেছিলেন *(বুখারী ২/১৯৫ পৃঃ, 'মুশরিকদের হাদিয়া গ্রহণ করা' অনুচ্ছেদ)*। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, নবী করীম (ছাঃ)-কে (জনৈক মুশরিক-এর পক্ষ থেকে) একটা রেশমী জুব্বা উপহার দেওয়া হয়েছিল *(বুখারী ১/৩৫৬ পৃঃ, 'মুশরিকদের উপঢৌকন গ্রহণ' অধ্যায়)*।

কিন্তু ঐসব এনজিও-র উদ্দেশ্য মন্দ। কেননা এরা সমাজে কিছু কিছু ভাল কাজের আড়ালে ধর্মান্তরকরণ, নারীর পর্দাহীনতা, একসন্তান নীতি গ্রহণ প্রভৃতি ইসলাম বিরোধী কর্মকাণ্ডে ব্যাপক ভূমিকা রাখছে। অতএব ঐসব প্রতিষ্ঠান প্রদত্ত অনুদান গ্রহণ করলেও এদের অনৈসলামী কার্যক্রম হ'তে দূরে থাকতে হবে।

প্রশ্ন (১২/১২) : সূরা হূদের ১০৭-১০৮ নং আয়াতের ব্যাখ্যা জানিয়ে বাধিত করবেন।

-সাজ্জাদ চৌধুরী, রাজবাড়ী।

উত্তর : অত্র আয়াতদ্বয়ে আল্লাহ বলেন, সেখানে (জাহান্নামে) তারা চিরকাল থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু চান। নিশ্চয়ই তোমার প্রতিপালক যা চান তা করে থাকেন। পক্ষান্তরে যারা ভাগ্যবান, তারা চিরকাল জান্নাতে থাকবে, যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে। তবে তোমার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু চান। আর এ দান হবে অবিচ্ছিন্ন'।

প্রথম আয়াতে 'তবে তোমার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু চান' দ্বারা তাওহীদপন্থী কবীরা গোনাহগারদের সম্পর্কে বলা হয়েছে বলে প্রাচীন ও আধুনিক বহু মুফাসসির মত প্রকাশ করেছেন। যাদেরকে আল্লাহ ফেরেশতা, নবী ও মুমিনদের সুফারিশক্রমে জাহান্নাম থেকে পর্যায়ক্রমে বের করে নিবেন।

যারা বুঝে-শুনে খালেছ অন্তরে অন্ততঃ একবার কালেমা ত্বাইয়েবা লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পাঠ করেছে'।

দ্বিতীয় আয়াতে 'যতদিন আসমান ও যমীন বর্তমান থাকবে' কথাটি আরবদের একটি প্রসিদ্ধ বাকরীতি। যা দ্বারা কোন বস্তুর চিরস্থায়ীত্ব বুঝানো হয় (কুরতুবী)। অত্র আয়াতে 'তবে তোমার প্রতিপালক যদি অন্য কিছু চান' বলে জান্নাতীদের চিরকাল শান্তিতে রাখার বিষয়টি আল্লাহ্র উপর অপরিহার্য নয় সেটা বুঝানো হয়েছে। বরং এটা তাঁর ইচ্ছার উপর নির্ভরশীল। তবে তাদের উপর তাঁর অনুগ্রহ সর্বদা থাকবে। সেকথা আয়াতের শেষে বলে দেয়া হয়েছে যে, 'এ দান হবে অবিচ্ছিন্ন' *(ইবনু কাছীর, হূদ ১০৭-১০৮ আয়াতের ব্যাখ্যা দ্রষ্টব্য)*।

প্রশ্ন (১৩/১৩) : সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় মাতা তাকে হেফযখানায় পড়ানোর নিয়ত করেন। পরবর্তীতে শত চেষ্টা করেও তাতে সফল হননি। এক্ষণে উক্ত মায়ের করণীয় কি?

-তামীমা, কালিহাতি, টাঙ্গাইল।

উত্তর : সন্তান গর্ভে থাকা অবস্থায় তাকে কুরআনের হাফেয বানানোর নিয়ত করার জন্য উক্ত মা পূর্ণ নেকী পেয়ে যাবেন। ইবনে আব্বাস (রাঃ) বলেন, আল্লাহ তা'আলা নেকী ও পাপ লিখেন। অতএব যে ব্যক্তি কোন নেকী করার সংকল্প করে, কিন্তু তা বাস্তবায়ন করতে পারে না, আল্লাহ তার জন্য পূর্ণ নেকী লিখে থাকেন। আর যে ব্যক্তি তা বাস্তবায়ন করতে সক্ষম হয়, তার আমলানামায় ১০ থেকে ৭শ'র অধিক নেকী লেখা হয়। পক্ষান্তরে যে ব্যক্তি পাপের সংকল্প করে, কিন্তু তা কাজে পরিণত করে না, তার জন্য একটি নেকী লেখা হয়। আর যদি তা কাজে পরিণত করে তবে তার জন্য মাত্র একটি পাপ লেখা হয় *(মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/২৩৭৪ 'আল্লাহ্র রহমত প্রশস্ত' অনুচ্ছেদ 'দো'আ' অধ্যায়)*। শত চেষ্টা করেও সফল না হওয়ার কারণে আল্লাহ্র নিকট সন্তানের হেদায়াতের জন্য দো'আ করা ব্যতীত অন্য কিছুই করণীয় নেই।

প্রশ্ন (১৪/১৪) : একটি মিথ্যা বললে সাত হাযার বছর জাহান্নামের আগুনে জ্বলতে হবে'- এ কথার কোন ভিত্তি আছে কি?

শাহরিয়ার, রাজশাহী।

উত্তর : এ মর্মে কোন হাদীছ পাওয়া যায় না। তবে মিথ্যা কথা বলা নিঃসন্দেহে কবীরা গুনাহ *(হজ্জ ৩০; মুত্তাফাক্ব আলাইহ, মিশকাত হা/৫০, 'মুনাফিকের আলামত ও কবীরা গোনাহ সমূহ' অনুচ্ছেদ; মুসলিম, মিশকাত হা/৫০৩১, ৪৮২৪)*। আল্লাহ মিথ্যুকের জন্য কঠোর শাস্তি নির্ধারণ করেছেন। যেমন রাসূল (ছাঃ)-কে স্বপ্নে মিথ্যুকের শাস্তি দেখানো হয়েছে যে, মিথ্যুকের এক চোয়াল থেকে আরেক চোয়াল পর্যন্ত মাথা বাঁকা লোহার অস্ত্র দিয়ে চিরে ফেলা হবে। অতঃপর তা ভাল হয়ে যাবে। আবার চেরা হবে। এভাবে কিয়ামত পর্যন্ত তার শাস্তি চলতে থাকবে *(বুখারী হা/১৩৮৬; মিশকাত হা/৪৬২১)*। অতএব মিথ্যা কথা থেকে বেঁচে থাকা আবশ্যক।

প্রশ্ন (১৫/১৫) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, রাসূল (ছাঃ) ৬ কিলোমিটার দূরত্বে গমন করেও ক্বছর ছালাত আদায় করেছেন। উক্ত বক্তব্যের সত্যতা আছে কি?

-আল-আমীন
নবাবগঞ্জ, দিনাজপুর।

উত্তর : সফরের উদ্দেশ্যে বেরিয়ে ৬ কিঃমিঃ নয়, বরং রাসূল (ছাঃ) ৬ মাইল দূরত্বে গিয়ে ছালাত ক্বছর করেছেন। যেমন আনাস (রাঃ) বলেন, আমি রাসূল (ছাঃ)-এর সাথে মদীনায় যোহরের ছালাত চার রাক'আত পড়েছি। অতঃপর (৬ মাইল দূরে) যুলহুলায়ফা গিয়ে আছরের ছালাত দুই রাক'আত পড়েছি *(বুখারী হা/১০৮৯; মুসলিম হা/৬৯০, আবুদাঊদ হা/১২০২)*। অন্য হাদীছে এসেছে, রাসূল (ছাঃ) তিন মাইল কিংবা তিন ফারসাখ (৯ মাইল) যাওয়ার পর দুই রাক'আত পড়তেন *(মুসলিম হা/৬৯১; আবুদাউদ হা/১২০১)*।

প্রশ্ন (১৬/১৬) : জনৈক লোকের শরীরে তাবীয থাকায় রাসূল (ছাঃ) তার বায়'আত গ্রহণ করেননি। এর কোন সত্যতা আছে কি?

-রায়হান, তেরিচোক, রাণীনগর, দিনাজপুর।

উত্তর : তাবীয থাকায় রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বায়'আত গ্রহণ করেননি মর্মে বর্ণিত হাদীছটি ছহীহ। উক্ববা বিন 'আমের (রাঃ) বলেন, একদিন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর খিদমতে একদল লোক আসল। অতঃপর দলটির ৯ জনের বায়'আত নিলেন এবং একজনকে বাকী রাখলেন। তারা বলল, হে আল্লাহ্র রাসূল! আপনি ৮ জনকে বায়'আত করালেন আর একজনকে ছেড়ে দিলেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বললেন, তার সাথে একটি তাবীয আছে। তখন লোকটি হাত ভিতরে ঢুকিয়ে তাবীয ছিঁড়ে ফেলল। তখন রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) তার বায়'আত গ্রহণ করলেন *(আহমাদ হা/১৭৪৫৮; ছহীহাহ হা/৪৯২)*।

প্রশ্ন (১৭/১৭) : আমি জীবনে বহু মানুষের কাছে দুধ বিক্রয়ের সময় ২ লিটারকে আড়াই লিটার বলে বিক্রয় করেছি। এক্ষণে সবার নিকট থেকে পৃথকভাবে ক্ষমা না নিলে এ পাপ থেকে মুক্তি পাওয়ার কোন উপায় আছে কি?

-আশিক, জয়পুরহাট।

উত্তর : এটা খুব বড় পাপ। এটা মানুষের হক বিনষ্টকারী পাপ। এর জন্য প্রত্যেক ক্রেতার নিকটেই ফাঁকি দেওয়া অংশ পৌঁছাতে হবে। সম্ভব না হলে তাদের উত্তরাধিকারীদের নিকট পৌঁছাতে হবে। তাদের কাউকে না পেলে তাদের নামে পরিমাণমত টাকা আল্লাহ্র রাস্তায় দান করতে হবে। আবু হুরায়রা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, কোন ব্যক্তি যদি তার কোন ভাইয়ের সম্মান বা অন্য কোন বিষয়ে যুলুম করে থাকে, তাহ'লে সে যেন আজই তার সমাধা করে নেয়। সেদিন আসার আগে যেদিন তার কাছে কোন দিনার ও দিরহাম থাকবে না। সেদিন তার কোন সৎকর্ম থাকলে তা থেকে যুলুম পরিমাণ নিয়ে নেয়া হবে। আর সৎকর্ম না থাকলে মযলূমের পাপসমূহ থেকে নিয়ে উক্ত যালেমের উপর চাপিয়ে দেয়া হবে' *(বুখারী, মিশকাত হা/৫১২৬)*।

প্রশ্ন (১৮/১৮) : 'আদম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত পূর্ণ হবে না' মর্মে হাদীছটির ব্যাখ্যা কি?

-ওমর ফারূক, কামারখন্দ, সিরাজগঞ্জ।

উত্তর : হযরত আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) বলেন, নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, আদম সন্তানকে ধন-সম্পদে পরিপূর্ণ দু'টি উপত্যকাও যদি দেওয়া হয়, সে তৃতীয়টির আকাংখা

করবে। আদম সন্তানের পেট মাটি ব্যতীত অন্য কিছু পূর্ণ করতে পারবে না' *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫২৭৩)*। অত্র হাদীছে মৃত্যুর আগ পর্যন্ত মানুষ যে দুনিয়ার প্রতি আসক্ত থাকবে তার প্রতি ইঙ্গিত করা হয়েছে। মৃত্যুর পর কবরের মাটি তার পেট তথা আকাংখা পূর্ণ করবে *(নববী, শরহ মুসলিম)*। খাদ্য গ্রহণে মাধ্যমে উদরপূর্তি হলে যেমন মানুষের ক্ষুধা মিটে যায়, তেমনি মৃত্যু মানুষের সকল আশা-আকাংখার পরিসমাপ্তি ঘটায়। অতএব 'মাটি ব্যতীত' অর্থ কবরের মাটি ব্যতীত।

প্রশ্ন (১৯/১৯) : কুরবানীর গোশত বণ্টনের সঠিক পদ্ধতি জানিয়ে বাধিত করবেন।

-আব্দুল কাদের, ঝাড়খণ্ড, পশ্চিমবঙ্গ, ভারত।

উত্তর : উক্ত বিষয়ে আল্লাহ তা'আলা বলেন, 'তোমরা খাও এবং অভাবগ্রস্ত দরিদ্র লোকদের খাওয়াও' *(হজ্জ ২৮)*। তিনি আরও বলেন, 'তোমরা নিজেরা খাও, যারা চায় না তাদের খাওয়াও এবং যারা নিজেদের প্রয়োজন পেশ করে তাদের খাওয়াও' *(হজ্জ ৩৬)*। ইবনু মাসঊদ (রাঃ) কুরবানীর গোশত তিনভাগ করে একভাগ নিজেরা খেতেন, একভাগ যাকে চাইতেন তাকে খাওয়াতেন এবং একভাগ ফকীর-মিসকীনকে দিতেন। আবদুল্লাহ ইবনু আব্বাস (রাঃ) রাসূল (ছাঃ)-এর কুরবানীর গোশত বন্টন সম্পর্কে বলেন যে, তিনি একভাগ নিজের পরিবারকে খাওয়াতেন, একভাগ গরীব প্রতিবেশীদের দিতেন এবং একভাগ সায়েল-ফকীরদের দিতেন। হাফেয আবু মূসা বলেন, হাদীছটি 'হাসান'। তবে আলবানী বলেন, আমি এটির সনদ জানতে পারিনি। জানি না তিনি অর্থের দিক দিয়ে 'হাসান' বলেছেন, না সনদের দিক দিয়ে *(ইরওয়া হা/১১৬০; আলোচনা দ্রষ্টব্য: মির'আত হা/১৪৯৩-এর ব্যাখ্যা, ৫/১২০ পৃঃ)*। এছাড়া ইমাম আহমাদ, শাফেঈ (রহঃ) সহ বহু বিদ্বান কুরবানীর গোশত তিনভাগ করাকে মুস্তাহাব বলেছেন *(সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮ পৃঃ)*।

অতএব কুরবানীর গোশত তিন ভাগ করা যায়। একভাগ নিজেদের ও একভাগ প্রতিবেশীদের যারা কুরবানী করেনি এবং এক ভাগ ফকীর-মিসকীনদের। প্রয়োজনে বণ্টনে কমবেশী করাতে কোন দোষ নেই *(সুবুলুস সালাম শরহ বুলূগুল মারাম ৪/১৮৮; আল-মুগনী ১১/১০৮; মির'আত ২/৩৬৯; ঐ, ৫/১২০ পৃঃ)*। উল্লেখ্য যে, কুরবানীর গোশত যতদিন খুশী রেখে খাওয়া যায় *(তিরমিযী হা/১৫১০, মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/২৭৪৪)*।

অতএব মহল্লার স্ব স্ব কুরবানীর গোশতের এক-তৃতীয়াংশ একস্থানে জমা করে মহল্লায় যারা কুরবানী করতে পারেনি তাদের তালিকা করে সুশৃংখলভাবে তাদের মধ্যে বিতরণ করা ও প্রয়োজনে তাদের বাড়ীতে পৌঁছে দেওয়া উত্তম। বাকী এক-তৃতীয়াংশ ফকীর-মিসকীনদের মধ্যে বিতরণ করবেন *(দ্রঃ মাসায়েলে কুরবানী ও আক্বীক্বা' বই, পৃঃ ২৩)*। এর ফলে কুরবানীদাতা রিয়া ও শ্রুতি থেকে নিরাপদ থাকবেন এবং তার অন্তর পরিশুদ্ধ হবে। আর এটাই হ'ল কুরবানীর মূল প্রেরণা। আজকাল অনেকে গোশত জমা করে সেখান থেকে প্রতিবেশী ও ফকীর-মিসকীনদের কিছু কিছু দিয়ে বাকী গোশত পুনরায় নিজেদের মধ্যে বন্টন করে নেন। এটি একটি কুপ্রথা। এর মাধ্যমে কৃপণতা প্রকাশ পায়। যা অবশ্যই পরিত্যাজ্য।

প্রশ্ন (২০/২০) : ছালাতে দ্বিতীয় রাক'আতে শামিল মুক্তাদীর জন্য তা প্রথম রাক'আত হিসাবে গণ্য হয়। এক্ষণে এ রাক'আতে যে তাশাহহুদ পাওয়া যাবে সেখানে দো'আ-দরূদ পড়া যরূরী কি?

-খোমেনী, উত্তরা, ঢাকা।

উত্তর : এ সময় ইমামের সালাম ফেরানো পর্যন্ত দো'আ-দরূদ পড়া যায়। কারণ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন ইমাম নির্ধারণ করা হয় তাকে অনুসরণের জন্য *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/১১৩৯)*।

প্রশ্ন (২১/২১) : দু'টি অংশ বিশিষ্ট প্রচলিত কালেমায়ে ত্বাইয়েবার প্রচলন কবে থেকে শুরু হয়?

-ইঞ্জিনিয়ার শিহাব, পাংশা, রাজবাড়ী।

উত্তর : এ কালেমার প্রচলন কখন থেকে হয়েছে, তা জানা যায় না। আব্দুল্লাহ ইবনু আব্বাস বলেন, কালেমা ত্বাইয়েবাহ হ'ল 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' (لا الـــه الا الله) *(তাফসীর ইবনে আব্বাস, কুরতুবী, ইবনু কাছীর, সূরা ইবরাহীম ২৪ আয়াতের তাফসীর দ্রষ্টব্য)*। দুই অংশ বিশিষ্ট কালেমাটি কালেমা শাহাদাতের সংক্ষিপ্ত রূপ। এটাকে কালেমা ত্বাইয়েবাহ বলা ঠিক নয়। সূরা ফাৎহ-এর ২৬ আয়াতে কালেমাতুৎ তাক্বওয়া-এর ব্যাখ্যায় আতা আল-খোরাসানী বলেন, لا اله الا الله محمـــد رســـول الله *(দুররে মানছূর ৭/৪৬৬ পৃঃ, বর্ণনাটি সনদবিহীন)*। এ কালেমাটি আরশের গায়ে লিখা ছিল মর্মে হাদীছটিও জাল *(হাকেম হা/৪২২৭, সিলসিলা যঈফাহ হা/২৮০)*।

প্রশ্ন (২২/২২) : ছালাতে সালাম ফিরানোর পূর্বে বা পরে আল্লাহ্‌র কাছে কিছু চাইতে বাংলা ভাষায় দো'আ করা যাবে কি?

-আব্দুল আউয়াল, বাগাতীপাড়া, নাটোর।

উত্তর : হাদীছে বর্ণিত ছহীহ দো'আ সমূহ ব্যতীত অন্য কোন ভাষায় সালামের পূর্বে দো'আ করা যাবে না। কেননা নবী করীম (ছাঃ) বলেছেন, 'আমাদের এ ছালাতে মানুষের কথাবার্তা সিদ্ধ নয়। এটা হ'ল তাসবীহ, তাকবীর এবং তেলাওয়াতে কুরআন *(মুসলিম, মিশকাত হা/৯৭৮)*। তবে কুনূতে নাযেলায় আরবীতে বলা যেতে পারে।

প্রশ্ন (২৩/২৩) : হাদীছ গ্রন্থগুলি আগে সংকলিত হয়েছে না প্রচলিত চার মাযহাব আগে তৈরী হয়েছে? বিস্তারিত জানতে চাই।

-মুজীবুর রহমান
পিরিজপুর, কিশোরগঞ্জ।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগেই হাদীছ লেখা শুরু হয়। মক্কা বিজয়ের পর তাঁর ভাষণের কিছু অংশ তিনি জনৈক আবু শাহকে লিখে দিতে বলেন *(বুখারী হা/২৪৩৪)*। এছাড়া অন্যান্য প্রমাণও রয়েছে। তবে রাষ্ট্রীয়ভাবে হাদীছের সংকলনকার্য শুরু হয় খলীফা ওমর ইবনু আব্দিল আযীয (৯৯-১০১ হিঃ)-এর সময়ে। তাঁর নির্দেশে হাদীছ সংকলনের কাজ শুরু হয় *(বিস্তারিত দ্রঃ মুছতফা আল-আ'যমী, দিরাসাত ফিল হাদীছিন নববী ওয়া তারীখু তাদভীনিহি)*। তৃতীয় শতাব্দী ছিল হাদীছ সংকলনের স্বর্ণযুগ। প্রচলিত মাযহাবের জন্ম হয়েছে ৪র্থ শতাব্দীতে। যেমন শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিছ দেহলভী (রহঃ) বলেন, 'জেনে রাখ যে, ৪র্থ শতাব্দী হিজরীর পূর্বে কোন মুসলমান

Contents

কোন একজন নির্দিষ্ট বিদ্বানের মাযহাবের তাক্বলীদের উপরে সংঘবদ্ধ ছিল না' *{হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগাহ (কায়রো : ১৩৫৫/১৯৩৬), ১/১৫২ পৃঃ}*। সুতরাং প্রচলিত মাযহাব সমূহ সৃষ্টি হয়েছে হাদীছ সংকলন যুগের পরে।

প্রশ্ন (২৪/২৪) : মুহাম্মাদ আবুল কাসেম নাম রাখা যাবে কি? জনৈক আলেম বলেন, এ নাম রাখার ব্যাপারে রাসূল (ছাঃ)-এর নিষেধাজ্ঞা আছে?

-শাহরিয়ার, হারুপুর, রাজশাহী।

উত্তর : 'মুহাম্মাদ আবুল কাসেম' একত্রে রাখা যাবে না *(তিরমিযী হা/২৮৪১, মিশকাত হা/৪৭৬৯)*। উক্ত নাম রাখা যাবে বিষয়ে হযরত আলী (রাঃ) কর্তৃক বর্ণিত হাদীছটি ছিল তাঁর জন্য 'খাছ' *(তিরমিযী হা/২৮৪৩)*। শুধু 'মুহাম্মাদ' রাখা যাবে। কিন্তু শুধু 'আবুল কাসেম' রাখা যাবে না। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, তোমরা আমার নামে নাম রাখো। কিন্তু আমার উপনামে নাম রেখো না' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মিশকাত হা/৪৭৫০)*। উক্ত হাদীছটি জানার পর উমাইয়া খলীফা মারওয়ান ইবনুল হাকাম (৬৪-৬৫ হিঃ) তাঁর পুত্রের 'কাসেম' নাম পরিবর্তন করে 'আব্দুল মালেক' রাখেন। যিনি তাঁর পরে বিখ্যাত খলীফা হন *(নববী, শরহ মুসলিম হা/২১৩১-এর আলোচনা দ্রঃ, 'শিষ্টাচারসমূহ' অধ্যায়)*। ইমাম শাফেঈ (রহঃ) বলেন, কারো উপনাম আবুল কাসেম রাখা বৈধ নয়, তার নাম 'মুহাম্মাদ' হৌক বা অন্য কিছু হৌক' *(বায়হাক্বী হা/১৯১১০)*। শায়খ আলবানী বিস্তারিত আলোচনার পর বলেন, উক্ত উপনাম না রাখার ব্যাপারে স্পষ্ট এবং ছহীহ হাদীছ সমূহের আলোকে আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ যে, সঠিক কথা হ'ল 'আবুল কাসেম' উপনামটি না রাখা (المنع مطلقاً)। তার নাম 'মুহাম্মাদ' হৌক বা না হৌক *(ছহীহাহ হা/২৯৪৬-এর আলোচনা দ্রষ্টব্য)*।

[সংশোধনী : আত-তাহরীক ১২ বর্ষ সেপ্টেম্বর ২০০৯ ১০/৪৫০ নং প্রশ্নোত্তরে 'শুধু আবুল কাসেম রাখা যাবে' বলা হয়েছিল। এক্ষণে উক্ত নাম রাখা হ'তে বিরত থাকা কর্তব্য হবে]

প্রশ্ন (২৫/২৫) : শুটকি মাছ খাওয়া কি জায়েয? যদি জায়েয হয় তবে হিদলের শুটকি খাওয়া যাবে কি?

-মাযহারুল ইসলাম, যাত্রাবাড়ী, ঢাকা।

উত্তর : জীবিত বা মৃত যেকোন মাছ খাওয়ার ব্যাপারে শরী'আত অনুমতি দিয়েছে। পদ্ধতিগতভাবে কেউ রান্না করে খায়, কেউ শুটকি বানিয়ে খায় তাতে কোন বাধা নেই। আল্লাহ বলেন, 'সমুদ্রের শিকার তোমাদের জন্য হালাল করা হয়েছে' *(মায়েদা ৯৬)*। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেন, সমুদ্রের পানি পবিত্র এবং এর মৃত হালাল *(আবুদাউদ হা/৮৩; তিরমিযী হা/৬৯)*। হিদল বা চ্যাপা শুটকি মূলতঃ পুটি, টাকি, টেংরা ইত্যাদি মাছ থেকে নির্দিষ্ট প্রক্রিয়ায় তৈরী একধরনের দেশী খাবার। সুতরাং তা ভক্ষণে কোন বাধা নেই।

প্রশ্ন (২৬/২৬) : ঈদুল আযহার দিন ছিয়াম পালনে শরী'আতে কোন বাধা আছে কি?

-মেহেদী, শিবগঞ্জ, চাঁপাই নবাবগঞ্জ।

উত্তর : উভয় ঈদের দিন ছিয়াম পালন করা নিষিদ্ধ। আবু সাঈদ খুদরী (রাঃ) হ'তে বর্ণিত রাসূল (ছাঃ) ঈদুল ফিৎর ও ঈদুল আযহার দিন ছিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন *(বুখারী হা/১৯৯১, মুসলিম হা/১১৩৭, মিশকাত হা/২০৪৮)*। এছাড়া আইয়ামে তাশরীক্ব তথা ঈদুল আযহার পরবর্তী তিনদিনও ছিয়াম পালন নিষিদ্ধ *(মুসলিম হা/১১৪১, মিশকাত হা/২০৫০; আবুদাঊদ হা/২৪১৯)*। তবে কুরবানীদাতার জন্য ঈদের দিন কুরবানীর গোশত খাওয়ার পূর্ব পর্যন্ত না খেয়ে থাকা সুন্নাত *(তিরমিযী হা/৫৪২, মিশকাত হা/১৪৪০)*।

প্রশ্ন (২৭/২৭) : ইমামের সূরা ফাতিহা পাঠের শেষের দিকে ছালাতে যোগদান করলে প্রথমে সূরা ফাতিহা পড়তে হবে, না ইমামের সাথে আমীন বলতে হবে?

-জামীলুর রহমান, মালয়েশিয়া।

উত্তর : এমন ব্যক্তি প্রথমে ইমামের আমীনের সাথে আমীন বলবে। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'যখন ইমাম আমীন বলবে, তখন তোমরা আমীন বল' *(তিরমিযী হা/২৫০)*। তারপর সূরা ফাতেহা নীরবে পাঠ করবে। কেননা সূরা ফাতেহা ব্যতীত ছালাত সিদ্ধ হয় না' *(মুত্তাফাক্ব 'আলাইহ, মুসলিম, মিশকাত হা/৮২২-২৩)*।

প্রশ্ন (২৮/২৮) : 'ছালাতুর রাসূল (ছাঃ)' বইয়ে বড় চাদর, লুঙ্গি ও জামা দ্বারা কাফন করতে বলা হয়েছে। অথচ আয়েশা (রাঃ)-এর বর্ণনা অনুযায়ী, রাসূল (ছাঃ)-এর কাফনের তিনটি কাপড়ের মধ্যে জামা ও পাগড়ী ছিল না। এক্ষণে এর সমাধান কি?

-মুহিব বিন জালালুদ্দীন, সাঘাটা, গাইবান্ধা।

উত্তর : তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়ার কথা বুখারী-মুসলিমের ছহীহ হাদীছে এসেছে। কিন্তু তিনটি কাপড়ের ব্যাখ্যা এসেছে আহমাদ, আবুদাঊদ, তিরমিযী সহ অন্যান্য হাদীছে ক্বামীছ, ইযার ও লিফাফাহ তথা জামা, লুঙ্গী ও বড় চাদর হিসাবে। যদিও ঐসব হাদীছগুলির সনদ দুর্বলতা মুক্ত নয়। ছাহেবে মির'আত সব হাদীছ জমা করে বিস্তারিত আলোচনা শেষে বলেন, জামা সহ তিন কাপড়ে কাফন দেওয়া জায়েয হওয়ার ব্যাপারে কোন মতভেদ নেই। মতভেদ হ'ল উত্তম হওয়ার ব্যাপারে। 'ছালাতুর রাসূলে' তিনটি কাপড়ে কাফন দেওয়ার কথা বলা হয়েছে এবং ব্যাখ্যায় গিয়ে বলা হয়েছে 'অর্থাৎ একটি লেফাফা বা বড় চাদর, একটি তহবন্দ বা লুঙ্গী ও একটি ক্বামীছ বা জামা' *(ঐ, ৪র্থ সংস্করণ পৃঃ ২২৭)*। যা জায়েয হওয়ার ব্যাপারে বিদ্বানগণের মধ্যে কোন মতভেদ নেই *(দ্রঃ মির'আত ৫/৩৪৫)*। শায়খ বিন বায (রহঃ) বলেন, জামা, লুঙ্গী ও চাদরে কাফন দেওয়া জায়েয *(মাজমূ' ফাতাওয়া বিন বায ১৩/১২৭)*।

প্রশ্ন (২৯/২৯) : টয়লেটে থাকা অবস্থায় আযানের জওয়াব বা দো'আ পাঠ করা যাবে কি?

-ইশরাত জাহান, মান্দা, নওগাঁ।

উত্তর : পেশাব-পায়খানারত অবস্থায় জবাব দিবে না। বরং তা শেষ করার পর জবাব দিবে *(বুখারী, মুসলিম, মিশকাত হা/৫৩৫)*। সাধারণভাবে বাথরুমে দো'আ পড়া যাবে। আয়েশা (রাঃ) বলেন, রাসূল (ছাঃ) সর্বাবস্থায় আল্লাহ্‌র যিকর করতেন' *(মুসলিম, মিশকাত হা/৪৫৬)*।

প্রশ্ন (৩০/৩০) : দুগ্ধপানকারী ছেলে শিশুর প্রস্রাবে কেবল পানির ছিটা দিয়ে ছালাত আদায় করা যায়। কিন্তু কন্যা শিশুর

Contents

বেলায় প্রস্রাবের স্থান পানি দিয়ে ধৌত না করলে পবিত্র হয় না, এর কারণ কি?

-আবুল কাসেম
মির্জাপুর বাজার, গাযীপুর সদর, গাযীপুর।

উত্তর : রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কন্যা শিশুর বেলায় এরূপ করতে বলেছেন *(ইবনু মাজাহ, আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৫০১-২)*। এজন্য ধৌত না করলে পবিত্র হয় না। শরী'আতের কোন বিধানই আল্লাহ তা'আলা বান্দার কল্যাণ ব্যতীত জারি করেননি, এ বিশ্বাস রেখেই আমল করতে হবে।

প্রশ্ন (৩১/৩১) : লাশ দাফনের সময় কবরের ভিতরে যে বাঁশ দেওয়া হয়, সে বাঁশ গজিয়ে বাঁশঝাড়ে পরিণত হ'লে সেই বাঁশ কাটা যাবে কি? এছাড়া কবরস্থানের গাছ কেটে বিক্রি করা যাবে কি?

-মনোয়ার আনছারী
মুকুন্দবাড়ী, আদারভিটা, জামালপুর।

উত্তর : লাশ নিশ্চিহ্ন হয়ে গেলে ও তা মাটি হয়ে গেলে সেখানে সাধারণ মাটির ন্যায় সব কিছু করা যায় *(ফিক্বহুস সুন্নাহ ১/৩০১; ছালাতুর রাসূল (ছাঃ) পৃঃ ১২৬)*। অতএব কবরের বাঁশ বা যে কোন বৃক্ষ কেটে বিক্রি করা যাবে এবং তা বিক্রয় করে কবরস্থানের উন্নয়নে লাগানো যাবে *(ইবনু তায়মিয়াহ, মাজমু' ফাতাওয়া ৩১/২০৮)*।

প্রশ্ন (৩২/৩২) : জনৈক ব্যক্তি বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) জান্নাতে প্রবেশের জন্য সর্বপ্রথম দরজা খুলবেন। এ বক্তব্য কি সঠিক?

-আব্দুস সালাম, সুলতানপুর, সাতক্ষীরা।

উত্তর : উক্ত বক্তব্য সঠিক। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) বলেছেন, 'ক্বিয়ামতের দিন নবীদের মধ্যে আমার উম্মতের সংখ্যা হবে সর্বাধিক এবং আমিই প্রথম জান্নাতের দরজা খুলব' *(মুসলিম হা/১৯৬, মিশকাত হা/৫৭৪২)*। অন্য হাদীছে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) এরশাদ করেন, 'ক্বিয়ামতের দিন আমি জান্নাতের দরজায় পৌঁছে দরজা খোলার জন্য বলব। তখন দাররক্ষী বলবে, আপনি কে? আমি বলব, মুহাম্মাদ। তখন সে বলবে, আপনার সম্পর্কে আমাকে বলা হয়েছে যে, আপনার পূর্বে আমি যেন অন্য কারো জন্য এ দরজা না খুলি' *(মুসলিম হা/১৯৭, মিশকাত হা/৫৭৪৩)*।

প্রশ্ন (৩৩/৩৩) : খোঁড়া ইমামের পেছনে ছালাত শুদ্ধ হবে কি?

-মুহসিন আকন্দ
জোরবাড়িয়া, ফুলবাড়িয়া, ময়মনসিংহ।

উত্তর : ইমামতির জন্য খোঁড়া হওয়া অন্তরায় নয়। যথাযথভাবে রুকু-সিজদা করতে পারেন না, এমন ইমামের পিছনেও ছালাত আদায় করা যায়। ওযরের কারণে ইমাম বা কোন মুক্তাদী বসে পড়তে পারেন। কিন্তু অন্যেরা দাঁড়িয়ে পড়বেন। রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) কখনো অসুস্থতার কারণে বসে বসে ইমামতি করেছেন এবং ছাহাবীগণ তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে জামা'আতবদ্ধভাবে ছালাত আদায় করেছেন *(বুখারী, মিশকাত হা/১১৩৯; মির'আত ৪/৮৯)*। অপরদিকে অন্ধ ছাহাবী আব্দুল্লাহ ইবনু উম্মে মাকতূম (রাঃ) মসজিদে নববীতে নিয়মিত ইমামতি করতেন *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/১১২১)*।

প্রশ্ন (৩৪/৩৪) : 'আল্লাহ ততক্ষণ বিরক্ত হননা, যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত হও' হাদীছটির ব্যাখ্যা কি? বিরক্ত হওয়ার গুণ কি আল্লাহ্র গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত?

-রেযওয়ানুল ইসলাম
তাহেরপুর, রাজশাহী।

উত্তর : এটি আল্লাহ্র গুণাবলীর অন্তর্ভুক্ত। আয়েশা (রাঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেন, একদা রাসূলুল্লাহ (ছাঃ) আমার ঘরে প্রবেশ করলেন যখন আমার পাশে জনৈকা মহিলা বসা ছিল। তিনি বললেন ইনি কে? আমি বললাম, ইনি হাওলা বিনতে তুওয়াইত যিনি রাতে ঘুমান না (অর্থাৎ ইবাদতে মগ্ন থাকেন)। একথা শুনে রাসূল (ছাঃ) বিরক্তি প্রকাশ করে বললেন, তোমাদের সাধ্য অনুযায়ী আমল কর। আল্লাহ্র কসম, আল্লাহ অতক্ষণ বিরক্ত হননা যতক্ষণ না তোমরা বিরক্ত হয়ে পড়ো *(মুওয়াত্ত্বা মালেক হা/৩৮৮, বুখারী হা/৪৩; মুসলিম হা/৭৮৫)*। অত্র হাদীছে 'আল্লাহ বিরক্ত হন না' এর অর্থ হ'ল আল্লাহ তা'আলা নেকী ও ছওয়াব প্রদান থেকে বঞ্চিত করেন না। আর প্রকাশ্য অর্থে বিরক্ত হওয়া আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর অন্যতম। যেমন রেগে যাওয়া, হাসা ইত্যাদি। তবে এটা সৃষ্টির কোন গুণাবলীর সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ নয় *(শূরা ১১; শায়খ উছায়মীন, শারহু রিয়াযুছ ছালেহীন ১/১৬১ হা/১৪২)*। কোন ক্লান্তি আল্লাহকে স্পর্শ করে না *(ক্বাফ ৩৮)*। কোন কোন আলেম মনে করেন, অত্র হাদীছ দ্বারা আল্লাহ্র বিরক্তি প্রকাশ পায় না। যেমন কেউ বলল 'আমি দাঁড়াব না যতক্ষণ না তুমি দাঁড়াবে' এ বাক্যটি ২য় ব্যক্তির দণ্ডায়মান হওয়াকে আবশ্যক করে না। অনুরূপ রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর বাণী, 'যতক্ষণ না তুমি বিরক্ত হবে, আল্লাহ বিরক্ত হবেন না'। এটা আল্লাহ্র জন্য বিরক্ত হওয়া আবশ্যক করে না। তবে আল্লাহ তা'আলা এ সকল ত্রুটি থেকে মুক্ত। এ হাদীছ দ্বারা বিরক্তি সাব্যস্ত হলেও এটা অন্যদের মত নয় *(ফাতাওয়া উছায়মীন ১/১৭৪)*। অনুরূপভাবে বলা যায় এটা কুরআনে বর্ণিত মাকর (কৌশল), কায়দ (ফন্দি), খিদা' (ধোঁকা)-এর মত আল্লাহ্র একটি গুণ যার প্রতি ঈমান আনা আবশ্যক *(ফাতাওয়া লাজনা দায়েমা ২/৪০২)*।

প্রশ্ন (৩৫/৩৫) : বৃদ্ধা মহিলাদের জন্য গায়ের মাহরাম পুরুষের সামনে নেকাব বিহীন চলা জায়েয হবে কি?

-আরীফা, বুড়িচং, কুমিল্লা।

উত্তর : উক্ত বিষয়ে আল্লাহ বলেন, আর বৃদ্ধা নারী, যারা বিবাহের আশা রাখেনা যদি তারা সৌন্দর্য প্রদর্শন না করে তাদের বহির্বাস খুলে রাখে, তবে তাতে তাদের কোন দোষ নেই। অবশ্য এথেকে বিরত থাকাই তাদের জন্য উত্তম। আর আল্লাহ সবকিছু শোনেন ও জানেন' *(নূর ৬০)*। শায়খ বিন বায বলেন, বিবাহে আসক্তিহীন বৃদ্ধা মহিলাগণ আভ্যন্তরীণ সৌন্দর্য প্রকাশ ব্যতীত তাদের মুখমণ্ডল ও কব্জি সমেত হস্ত দ্বয় খোলা রাখলে কোন গুনাহ হবে না *(ফাতাওয়া আল-মারা'আতুল মুসলিমাহ ১/৪২৪)*।

প্রশ্ন (৩৬/৩৬) : জনৈক আলেম বলেন, এ শতাব্দীর শেষের দিকে ক্বিয়ামত সংঘটিত হবে, যা বেশ কিছু বর্ণনা দ্বারা প্রমাণিত। এর সত্যতা জানতে চাই।

-আব্দুল্লাহ আল-মা'রূফ, নশীপুর, বগুড়া।

Contents

উত্তর : আল্লামা জালালুদ্দীন সৈয়ূতী তার আল-হাবী নামক কিতাবে (২/২৪৯-২৫৬) কিছু জাল ও যঈফ হাদীছ এবং ইস্রাঈলী কিছু ভিত্তিহীন বর্ণনা উপস্থাপন করে প্রমাণ করার চেষ্টা করেছেন যে, পৃথিবীর বয়স সাত হাযার বছর। আর মুহাম্মাদ (ছাঃ)-এর আগমন ঘটেছে ৬ হাযার বছরের শেষের দিকে। ফলে বাকী থাকে দেড় হাযার বছর। অতএব ১৫ শত হিজরীর সমাপ্তি ঘটার পূর্বে ক্বিয়ামত হয়ে যাবে। উক্ত বক্তব্যটি একেবারেই কাল্পনিক ও ভিত্তিহীন। কারণ আল্লাহ তা'আলা বলেন, তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করে ক্বিয়ামত কখন হবে?' 'এ বিষয়ে বলার জন্য তুমি কে?' 'এর চূড়ান্ত জ্ঞান তো তোমার প্রভুর নিকটে' *(নাযে'আত ৪২-৪৪)*।

প্রশ্ন (৩৭/৩৭) : মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুল আক্বছা সর্বপ্রথম কে নির্মাণ করেন?

-তাউয়াবুল হক, ছোট বনগ্রাম, রাজশাহী।

উত্তর : মাসজিদুল হারাম ও মাসজিদুল আক্বছার প্রথম নির্মাতা সম্বন্ধে কুরআন ও ছহীহ হাদীছে কোন বর্ণনা পাওয়া যায় না। তবে পৃথিবীর বুকে নির্মিত প্রথম মসজিদ হ'ল বায়তুল্লাহ *(আলে-ইমরান ৩/৯৬)*। আবু যার গেফারী (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-কে জিজ্ঞেস করলাম প্রথম মসজিদ কোনটি? তিনি বললেন, মাসজিদুল হারাম, আমি বললাম, তারপর কোনটি? তিনি বললেন, মাসজিদুল আক্বছা। আমি বললাম, এ দু'য়ের মধ্যে সময়ের ব্যবধান কত? তিনি বললেন, চল্লিশ বছর' *(বুখারী হা/৩৩৬৫; মুসলিম হা/৫২০)*। ইবনু কাছীর বলেন, কা'বাগৃহ প্রথম কে নির্মাণ করেন, সে বিষয়ে বিদ্বানগণ মতভেদ করেছেন। যেমন কেউ বলেন, আদমের পূর্বে ফেরেশতাগণ। কেউ বলেন, আদম (আঃ)। কেউ বলেন, আদমপুত্র শীছ (আঃ)। তিনি বলেন, এসবই আহলে কিতাবদের বই থেকে নেওয়া। যার উপর নির্ভর করা যায় না। তবে কোন হাদীছ পেলে সেটাই মাথা পেতে নেওয়া যেত' *(ইবনু কাছীর, তাফসীর সূরা বাক্বারাহ ১২৫ আয়াত)*। পরে ইবরাহীম (আঃ) মাসজিদুল হারাম ও সোলায়মান (আঃ) মাসজিদুল আক্বছা পুনর্নির্মাণ করেন *(নাসাঈ হা/৬৯৩; বিস্তারিত দ্রঃ ফাৎহুল বারী ৬/৪০৮, মিরকাতুল মাফাতীহ ২/৪৬৮)*।

প্রশ্ন (৩৮/৩৮) : উট যবেহ করার নিয়ম কি? সাধারণ পশুর মত উট যবেহ করা যায় কি?

-শামীম আখতার
হরিহর পাড়া, মুর্শিদাবাদ, ভারত।

উত্তর : উট যবেহ করার সাধারণ নিয়ম হ'ল, উট দাঁড়ানো অবস্থায় তার কণ্ঠনালীতে ধারালো ছুরি চালিয়ে রক্ত প্রবাহিত করা। আর গরু-ছাগল যবেহ করার নিয়ম হ'ল, মাথা দক্ষিণ দিকে রেখে বাম কাতে ফেলে গলায় ছুরি চালানো। তবে বাধ্যগত অবস্থায় উটকে গরু-ছাগলের মত মাটিতে ফেলে যবেহ করলে নাজায়েয হবে না। যেমন বনু হারেছার জনৈক ব্যক্তি ওহোদের পাহাড়ী এলাকায় উট চরাচ্ছিল। একটি মাদী উট হঠাৎ মুমূর্ষু হয়ে পড়লে তার বুকে একটি কাঠের সুঁচালো মাথা দিয়ে আঘাত করে রক্ত প্রবাহিত করা হয়। অতঃপর রাসূল (ছাঃ)-কে এ সংবাদ প্রদান করলে তিনি তা খাওয়ার আদেশ দেন' *(আবুদাঊদ, মিশকাত হা/৪০৯৬ 'শিকার ও যবেহ' অনুচ্ছেদ)*।

প্রশ্ন (৩৯/৩৯) : হাসান (রাঃ) কি মু'আবিয়া (রাঃ) কর্তৃক বিষ প্রয়োগ করায় মৃত্যুবরণ করেছিলেন? এ ব্যাপারে সঠিক ইতিহাস জানতে চাই।

-এম. এ, ত্বালহা
ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় কুষ্টিয়া।

উত্তর : হাসান (রাঃ) কিভাবে মারা গেছেন এর সঠিক তথ্য কোন ছহীহ সূত্রে পাওয়া যায় না। তবে হাফেয ইবনু হাজার বলেন, বলা হয়ে থাকে যে, তিনি বিষপানে মারা গেছেন। উমায়ের ইবনু ইসহাক বলেন, আমি এক সাথীকে নিয়ে হাসান (রাঃ)-এর নিকটে গেলাম। তখন তিনি বললেন, আমি একাধিকবার বিষপান করেছি। কিন্তু এত বিষাক্ত বস্তু ইতিপূর্বে কখনও পান করিনি। এরই মধ্যে তার ভাই হুসাইন সেখানে এসে জিজ্ঞেস করলেন। কে আপনাকে বিষ পান করিয়েছে? তিনি সেটা বলতে অস্বীকার করলেন *(আল ইছাবাহ ২/৭৩ বর্ণনাটি ছহীহ, তাহযীবুত তাহযীব ৪/১২৭)*। ক্বাতাদা থেকেও অনুরূপ বর্ণিত হয়েছে *(সিয়ারু আ'লামিন নুবালা ৩/২৭৪)*।

বিভিন্ন গ্রন্থে বর্ণিত হয়েছে যে, মু'আবিয়া (রাঃ) বা তার ছেলে ইয়াযীদের নির্দেশনায় হাসান (রাঃ)-এর স্ত্রী তাঁকে বিষ পান করিয়েছিলেন। ইবনু কাছীর বলেন, এগুলি অশুদ্ধ ও ভিত্তিহীন *(আল-বিদায়াহ ১১/২০৮)*। শায়খুল ইসলাম ইবনু তায়মিয়াহ বলেন, মু'আবিয়া (রাঃ) হাসানকে বিষ পান করিয়ে হত্যা করেছেন মর্মে কিছু লোক যা বলে থাকে, তা কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। অতএব এ ব্যাপারে কিছু না জেনে বলার ন্যায় হবে *(মিনহাজুস সুন্নাহ ৪/৪৬৯)*। যাহাবী বলেন, আমি বলব, আমার গবেষণায় এটা বিশুদ্ধ নয় *(তারীখুল ইসলাম পৃঃ ৪০)*। ইবনু খালদূন বলেন, এটা শী'আদের প্রচারণা। *(তারীখে ইবনু খালদুন ২/৬৪৯)*। সুতরাং বিষপানে তাঁর মৃত্যু হলেও কে পান করিয়েছে, তা অজ্ঞাত।

প্রশ্ন (৪০/৪০) : কোন নারী ধর্ষণের শিকার হ'লে সে কি অপরাধী হিসাবে গণ্য হবে?

-আব্দুল্লাহ ফারূক
বড়পেটা, আসাম, ভারত।

উত্তর : এক্ষেত্রে উক্ত নারী অত্যাচারিতা ও নিরপরাধ হিসাবে গণ্য হবে। ওয়ায়েল ইবনু হুজর (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর যুগে জনৈকা মহিলা মসজিদে ছালাত আদায়ের উদ্দেশ্যে বের হন। একজন লোক তাকে একা পেয়ে কাপড়ে ঢেকে নেয় এবং তাকে ধর্ষণ করে। মহিলা চিৎকার শুরু করলে লোকটি চলে যায়। সেখান দিয়ে মুহাজিরদের একদল লোক যাচ্ছিলেন। মহিলাটি তাদেরকে বললেন যে, ঐ লোক আমার সাথে এরূপ আচরণ করেছে। তখন লোকেরা তাকে ধরে রাসূলুল্লাহ (ছাঃ)-এর নিকটে নিয়ে আসলে তিনি মহিলাকে বললেন, তুমি চলে যাও। আল্লাহ তোমাকে ক্ষমা করুন। অতঃপর তিনি ঐ ধর্ষণকারী পুরুষকে রজম করার আদেশ দিলেন *(আবুদাঊদ হা/৪৩৭৯; তিরমিযী হা/১৪৫৪, মিশকাত হা/৩৫৭২, হাদীছটি হাসান, 'হুদূদ' অধ্যায়)*।